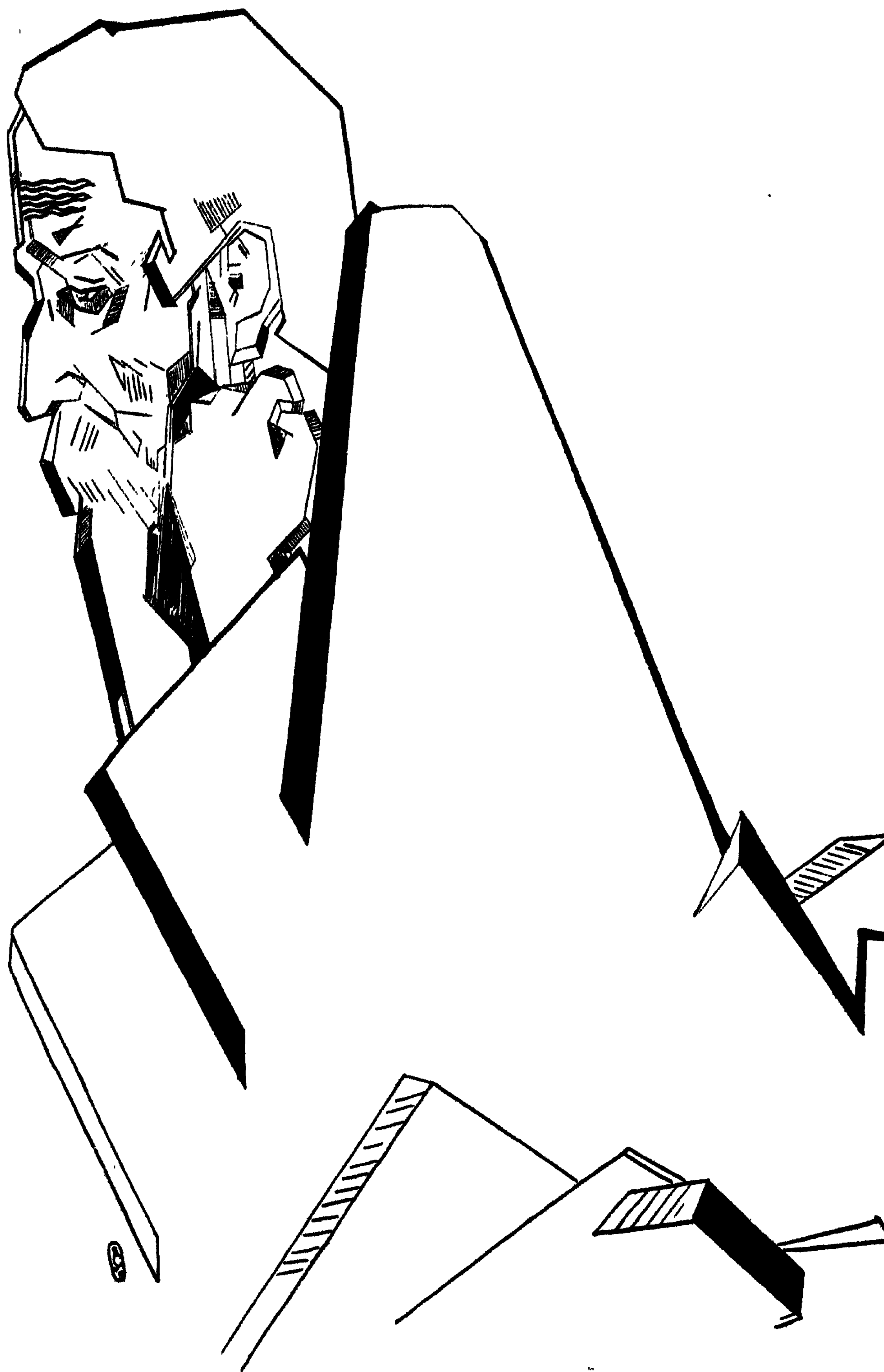


শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবিতীর্থে

অসিত কুমার হালদার

পরিবেশক
পাইওনিয়র বুক কোং
১৮, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রকাশক
শ্রীমাধব চক্রবর্ত্তী
"অঞ্জনা প্রকাশনী"
১৮, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট.
কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ
১লা মাঘ-১৩৬৫

মুদ্রণে
শ্রীমাধব চক্রবর্ত্তী
'সারদা প্রেস'
২এ/১, নবীন কুণ্ডু লেন,
কলিকাতা-৯

গ্রন্থনে
শ্রীঅনিল সাহা
প্রভা বুক বাইংডিং ওয়ার্কস.
৯, পাটোয়ার বাগান লেন
কলিকাতা-৯

পাঁচ টাকা

সূচি

রবিতীর্থে

শৈশব কথা।

পশ্যদ্ অক্ষণ্বান্ ন বিচেতদ্ অন্ধঃ'—কথাটি যে সত্য তা উপলব্ধি করেছি এখন,—"যার চক্ষু আছে সেই সত্য দেখতে পায় আর যে অন্ধ সে তা চিনতে পারেনা"। বাল্মীকি, কালিদাসের পর আমাদের দেশে জগৎপূজ্য মহাকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যেহেতু আমার অতি নিকট আত্মীয় (অর্থাৎ তিনি মাতামহীর সহোদর) সেইজন্যেই হয়ত দেখিনি ভালো করে চেয়ে তাঁর প্রতি, তাঁর ভিতরকার বিরাট পুরুষটিকে। আজ প্রকাশক কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে তাঁর বিষয় লিখতে গিয়ে বুঝতে পারছি আমার অক্ষমতা কতটা তাঁকে বা তাঁর কথাগুলিকে —যা তাঁর শ্রীমুখে শুনেছি, তা' বুঝে সুষ্ঠু করে ফুটিয়ে তোলার। যদি তাঁকে জীবিতকালে প্রকৃতভাবে চিনতুম তো রোজনাম্‌চায় প্রতিদিনের বিবরণ ভালো করে ফুটিয়ে রাখতুম ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্যে। রবিদাদা 'জীবন স্মৃতি' আর 'ছেলেবেলা' নামে দুটি গ্রন্থে সুন্দর ভাবে তাঁর জীবনের অনেক কথাই লিখে রেখে গেছেন। আমি কেবল তাঁর সেজদিদির (আমার দিদিমার) কাছে শোনা তাঁর ছেলেবেলার দু-একটি কাহিনী গোড়ায় বলব।

রবিদাদা ছিলেন শৈশবে বাড়ীর সকলেরি প্রিয়, বিশেষ তাঁর বড় ভাইবোনদের কাছে। শুনেছি (পরে রবিদাদাও রসদৃপ্ত স্মিতমুখে বলেছিলেন) তাঁর অন্নপ্রাসনের সময় তাঁকে চন্দন-চর্চিত ক'রে, তাঁর আসনের চারধারে আল্‌পনা কেটে এবং দীপ্ত দীপের সার দিয়ে সাজিয়ে ধূপবাসিত করা হয়েছিল। জাতিস্মর তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁর সর্ব কনিষ্ঠ (এঁর পরে বুধেন্দ্র শৈশবেই স্বর্গত হন) পুত্রের ভগবৎ উপাসনা অন্তে নামকরণ করলেন—'রবীন্দ্রনাথ'। পবিত্র মনে তাঁর পিতা বলেছিলেন, "এই শিশুর নাম 'রবীন্দ্রনাথ' রাখা হোল, এঁর চারধারে স্থাপিত দীপ শ্রেণীর মতই ইনি উজ্জ্বল প্রতিভায় জগৎ উদ্ভাসিত করবেন এবং ধূপবাসিত এই কক্ষের মত এঁর যশ-গৌরব জগতে বিস্তারিত হবে।" পিতার এই আশ্চর্য ভবিষ্যৎ বাণী রবিদাদা তাঁর জীবনে সফলতা মণ্ডিত করে রেখে গেছেন। এই ঘটনার সঙ্গে তুলনা করা যায়, যখন

অমরকোটে আকবর জন্মালেন, তখন নিস্বঃ পলাতক তাঁর পিতা সম্রাট হুমায়ুন পুত্রের জন্মোৎসবে একমাত্র সম্বল কস্তূরী নিকটবর্তী কয়েকটি বিশ্বস্ত সহচরদের বিতরণ করে বলেছিলেন, "এই কস্তূরীর গন্ধের মতই জাতকের নাম পৃথিবীতে বিকীর্ণ হবে।" কথা প্রসঙ্গে নিজের ছেলেবেলার কথা বোলে আমাকে উৎসাহিত করবার জন্য একবার কবি বলেছিলেন: "অপরে তোর কাজের প্রশংসা করবে এই ভেবে কাজ-করিসনে। ধর, যদি কেউ বাল্যে আমার পিঠ চাপড়ে উপদেশ দিতেন, 'রবি কবি হবি, কবিতা লেখ্'—তাহলে কি আমি এই কাজে প্রবৃত্ত হতুম? জানিস—তখন, যখন কিছু বড় কাজে হাত দিতুম, দিদিদের বলে রাখতুম। যেমন বাঘের খাঁচায় খাবার দেয় তেমনি আমাকে না ঘাঁটিয়ে আমার ঘরে একবাটি শুধু ডাল রেখে যেতে।"

দিদিমার কাছে শুনেছি রবিদাদা ছেলেবেলা থেকেই ভাবপ্রবণ এবং কল্পনার মধ্যে সর্বদা ডুবে থাকতেন। খুবই তরুণ বয়সে কবিতা লেখা তিনি আরম্ভ করেন। সোমদাদা (কবির ঠিক উপরের ভাই—সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুর) বলতেন: "জানিস্ রবির ছেলেবেলার লেখা প্রথম কবিতার বই আমি ছাপিয়েছিলুম।" আর আদর করে বলতেন "রবি কেরাণী উদয় অস্ত কলম পেষে।" সোমদাদা যে কাব্যের কথা বলেছিলেন সে বই বোধহয় ১৮৭৮এ শ্রীপ্রবোধচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত 'কবি কাহিনী'র ও আগে ছাপা হয়েছিল। তার কোন চিহ্নই নেই। দিদিমা বলতেন: "রবি খুব ছোটবেলায় আমাদের সবাইকে ডেকে দেখাতেন তাঁর নাটক—গোল-কামরার ধারে লতাপাতা বেঁধে রঙ্গমঞ্চ তৈরী ক'রে। ভাইপো ভাইঝি এবং ভাগ্নে ভাগ্নীদের নিয়ে নিজে করতেন অভিনয়। মেজ বৌঠান (অর্থাৎ দিদিমার মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের পত্নী শ্রীমতী জ্ঞানদা নন্দিনী দেবী) রবিকে বিশেষ উৎসাহ দিতেন।" দিদিমা এবং জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর নিকট শুনেছি—কবি বাল্যে এইপ্রকার ভাব কল্পনার আতিশয্য বশতঃ কখন কখন রাত্রে স্বপ্নঘোরে (Somnolency তে) বিছানা থেকে উঠে তেতলার ছাদের উপরে বেড়াতেন। পাছে কার্নিসে উঠে পড়ে না যান, সেইজন্য রাত্রে তাঁর দিদিদের সতর্ক পাহারায় থাকতে হোতো। রবিদাদাকে এই গল্পটি পরবর্তীকালে বলায় তিনি সকৌতুকে হেসেছিলেন এবং বলেছিলেন, ছেলেবেলার সে কথা তাঁর আদৌ মনে নেই। কিন্তু জানিনা মনস্তত্ত্ববিদেরা এ থেকে রূপগুণ সম্পন্ন কবির শৈশব-মানস-তত্ত্বের বিকাশ ব্যাপারের খোঁজ পাবেন কিনা, তাই কেবল কৌতুহল উদ্রেক হতে পারে বলেই লিখলুম।

শৈশব কথা

বাল্যজীবনী যা' রবিদাদা লিখেছেন তা থেকে সকলেই জানেন মহর্ষি তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রকে অল্প বয়েসেই দুরূহ উপনিষদ এবং গায়ত্রী মন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছিলেন। কবির মন তাই কোমল বয়সেই পরিণত হয়ে উঠেছিল। তাঁর তরুণ বয়সে লেখা 'বাল্মীকি প্রতিভা' অভিনয়ের বিষয় সকলেই অবগত আছেন। হাইকোর্টের জজ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সেই অভিনয়ে উপস্থিত ছিলেন এবং তরুণ কবিকে অভিনন্দিত করেছিলেন একটি কবিতা লিখে। কবির ভ্রাতুষ্পুত্রী লক্ষ্মীস্বরূপা প্রতিভা দেবী সরস্বতীর ভূমিকায় এবং আমার মা সুপ্রভা দেবী, সরলা দেবী, ইন্দিরা দেবী প্রভৃতি কবির অন্যান্য শিশু ভাইঝি ভাগ্নিদের বনবালা রূপে সাজিয়ে ষ্টেজে উপস্থিত করেছিলেন। এই সব কথা মা, মাসী ও মামীদের মুখে বহু বিবরণ শুনেছি ছেলেবেলায়। একটা কথা, বাল্মীকি প্রতিভা নিয়ে ১৪ বৎসরের বালক কবি যে গীতিনাট্য রচনা করেন তার ভিতর তাঁর অপূর্ব বিষয় বস্তু নির্বাচন শক্তি প্রকাশ পায়। পৃথিবীতে শোক থেকে শ্লোক এল প্রথম বাল্মীকির মনে। এই অনির্বচনীয় সত্যকে এতটুকু বালক কবি যে কি করে নির্বাচন করলেন এও এক বিস্ময়। স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই কারণেই আরো তাঁকে অভিনন্দিত করেছিলেন। [কিন্তু দুঃখের বিষয় বহুকাল পরে কবির লেখা 'শ্রেষ্ঠদান' তাঁর নিকট অশ্লীল বোধ হয় এবং স্যার গুরুদাস 'মানসী' পত্রিকায় সে বিষয় লেখেন। আশ্রমে রবিদার নিকট আমি তখন ছিলাম এবং শ্রেষ্ঠ ভিক্ষার একটি চিত্র এঁকেছিলুম। সেটি Mrs. Tracy নামক এক মার্কিন মহিলা কিনেছিলেন শান্তিনিকেতনে বেড়াতে এসে।] সে সময় রবিদার তরুণ ভ্রাতুষ্পুত্র হিতেন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ এবং ভাগিনেয় সত্যপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় তরুণ শিল্পীরা ছিলেন তাঁর কাছে অনুপ্রেরণার এবং আর্ট শিক্ষার অধিকারী। দ্বিজেন্দ্রনাথ, ঠাকুর সম্পাদিত তখনকার "ভারতী ও বালক" পত্রিকায় উল্লেখিত শিল্পীদের কাজের কিছু কিছু চিহ্ন র'য়ে গেছে।

'জোড়াসাঁকোর ধারে' বইখানিতে রবিদাদার ভ্রাতুষ্পুত্র পূজনীয় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সংক্ষেপে প্রায় সকল কথাই তাঁর ভাষার যাদুতে যেরকম ফুটিয়ে তুলেছেন, তার উপর অধিক বলার আমার কিছু নেই। রবিদাদার স্বনামধন্য পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের বৈঠকখানা বাড়ী এবং বসৎ বাড়ী নিয়েই তাঁদের এ বাড়ী ও বাড়ী, আলাদা হলেও একই বাড়ী ছিল। যতদিন মহর্ষি জীবিত ছিলেন

একান্নবর্ত্তী পরিবার থাকায় বোনেদী নিয়ম কানুন সমান ভাবে বজায় ছিল। কোন বিষয়ে যেমন তাঁদের অভাব ছিল না তেমনি কোন বিষয়ে ত্রুটীও ঘটতোনা। কোন রুচি বিরুদ্ধ ভাষা প্রয়োগ বা গালি দেওয়া তাঁরা জানতেন না। এর একটা মজার উদাহরণ মনে পোড়ে গেল। দিদিমাকে একবার দেখেছি, একটা উড়ে চাকরকে ছেলেদের খাবার জন্য 'গজা' কিনতে পয়সা দিয়ে বাজারে পাঠিয়েছিলেন, বুদ্ধিমান উৎকলবাসী 'গাঁজা' এনে হাজির করলে। তাতে দিদি রেগে গিয়ে মুখ লাল করে ভৎর্সনা দিয়ে কেবল বললেন "বেটা উড়ে, একে বাঁদর তার উপর পায়ে গোদ, তাতে বিষ ফোড়া—দেখনা হতভাগার বুদ্ধি!"—বলেই চুপ করে গেলেন। এই হল খুব জোর তাঁদের ক্রোধের অভিব্যক্তি। তপঃনিষ্ঠারত জনক-ঋষি তুল্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সকলের প্রতি সম-দৃষ্টি রাখতেন। তাঁর পুণ্যশীল ওজগুণের ফলে ঘরে একটি বিরাট শান্তি বিরাজ করতো। অশান্তভাব কারু থাকলেও দমিত হোতো আপনা থেকেই।

নিয়ম ছিল নবপ্রসূত শিশুদের তাঁর কাছে নিয়ে আসা এবং তাঁর অশীর্ব্বাদ গ্রহণ করানো। তাছাড়া প্রতিদিন নিয়মিত নির্দিষ্ট সময়ে চাকর দাসীরা সঙ্গে করে বালকবালিকাদের তাঁর নিকট আনলে মহর্ষি তাঁদের যথাযোগ্য উপহার দিতেন এবং নানা প্রকার প্রশ্নের দ্বারা উপদেশ দিতেন। দিদিমা বলতেন, একবার নাকি তাঁর নাসিকা ভেদ করা হয়েছে দেখে মহর্ষি বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন দেশের প্রথার রুচি বিরুদ্ধ বোলে। মোগল আমলের পূর্বে ভারতবর্ষে নাসিকা ভেদ করা ছিলনা মেয়েদের। তাঁদের বাড়ীর তখন একটা নিয়ম ছিল প্রাতে শয্যা ত্যাগ এবং রাত্রে শয়ন করার পূর্বে পিতা মাতা বা পিতৃ মাতৃস্থানীয়দের প্রণাম করতে হোতো। শান্তিনিকেতনে সেই প্রকার গুরুস্থানীয়দের পদধূলি নেবার প্রথা আজও চলে আসছে। হিন্দুগৃহে যেমন শয়ন-কক্ষে জুতো নিয়ে যাওয়ার রেওয়াজ ছিলনা, সেই প্রথাও পূর্বে ঠাকুর বাড়ীতে দেখেছি।

মহর্ষি সর্বদাই বারবাড়ীর তেতলায় থাকতেন এবং এক মুহূর্তকালও মৌন অবস্থায় ঈশ্বর চিন্তা ছাড়েননি। কেবল কখন প্রয়োজন হলে শুনেছি তিনি রত্নগর্ভা সৌভাগ্যবতী পত্নীর নিকট অন্দর মহলে যেতেন। তাঁর সেখানে আগমনের সূচনা হোতো ঘরদুয়ারের সারা পথ ধূপ-বারি-সেচন-সুবাসিত

করার দ্বারা। মহর্ষির ছেলেমেয়েরা তাঁকে 'কর্তা মশাই' এবং নাতিনাত্নীরা 'কর্তা দাদা' বলতেন। দিদিমাকে বলতে শুনেছি, তাঁদের ছেলেবেলার কথা, যখন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পিতা স্বনামধন্য প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের বিলাতে থাকার কালে বহু ব্যয় এবং তাঁর সেখানেই সহসা মৃত্যু হওয়ায় তখন বিষয়-আসয় ব্যাপারে মহর্ষি বিব্রত হয়ে পড়েন ঋণের দায়ে। তাঁদের ব্যয় সঙ্কোচন দ্বারা কিভাবে দৈনিক প্রত্যেককে চার আনা মূল্যের মাত্র খাদ্য গ্রহণ করতে হয়েছিল এবং স্নানের ব্যবহারের জন্য সাবান পর্য্যন্ত পাননি। আর চাকর দাসী ছাড়িয়ে কিভাবে নিজেদের সব কাজ নিজের হাতে করতে হয়েছিল তার সব কথা দিদিমা আমাদের বলতেন। মহর্ষি শুধু তাঁর তরফের কৌসুলীর পরামর্শ মত "ঋণ বিষয় কিছু জানিনা" বল্লেই হাইকোর্ট থেকে নিস্কৃতি পেতেন এবং বিষয়-আসয় বজায় থাকতো সরকারের নিয়োজিত Trustees দের হাতে। কিন্তু তিনি সত্য ভ্রষ্ট হননি। এই ব্যাপার শুনে (তখনকার লোকদের মুখে শুনেছি) তাঁর প্রতি সহানুভূতি-নিষ্যন্দিত অশ্রুবর্ষণ হয়েছিল বিচারালয়ে এবং তার বাহিরের জনতার মধ্যে। দেবেন্দ্রনাথের 'মহর্ষি' নাম সেই থেকে মুখে মুখে প্রচারিত হল এবং জগৎ সমাজে বিদিত রইল। রবিদাদাদের পরম সৌভাগ্য যে তাঁর মত উদার পিতা পেয়েছিলেন এবং সেই কারণেই ধর্মজ্ঞান ও চরিত্র গুণে জগৎ মাঝে অলঙ্কৃত হয়েছিলেন। এ বিষয়ে 'জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ী' পুস্তকে বন্ধুবর সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বিস্তারিত ভাবে লিখেছেন।

এই দুই মহাত্মা পিতাপুত্রের যে সূতিকাগৃহে জন্ম, তা প্রথম দেখার সুযোগ হয় যখন আমি ৯।১০ বৎসরের বালক। বড়দিদিমা (সৌদামিনী দেবী) আমাকে কেন জানিনা, একদিন নিয়ে গেলেন জোড়াসাঁকোর অন্দর মহলে আলো-আঁধারে সিঁড়ি বেয়ে উপর তলায়। সূতিকা ঘরটির দ্বার সিঁড়িতে ওঠার পথও আছে আর একটি আছে দোতলা দিয়ে নেবে প্রবেশ করার অর্থাৎ ঘরটির হরিশচন্দ্র অবস্থা—যেন ঝুলছে, দোতলায়ও নয় নিচের তলায়ও নয়। ঘরটির মাত্র দুটি এইভাবে দ্বার থাকায় বেশ একটু অন্ধকার। বড়দিদিমা বল্লেন, "অসিত, দেখ্, এখানে কর্তামশাই এবং আমরা সবাই জন্মেছি, তোর মা আর তুইও এই ঘরে জন্মেছিস্।" শৈশবে তখন শুনে আমার মনে যে কি ভাবের উদয় হয়েছিল তা' মনে নেই, কিন্তু এখন ভাবি, যদি সেই পুণ্য স্থানের মর্ম তখন হৃদয় স্পর্শ

করতো হয়ত আমার বাকী জীবন পুণ্যাত্মাদের আদর্শে নিয়ন্ত্রিত বা গড়ে তুলতে পারতুম। বুদ্ধশিষ্য সারীপুত্রের মত (যদি সেই সূতিকাগৃহ আজও সেইরূপ থাকতো) দেহান্তকাল উপস্থিত হলে সেখানেই দেহরক্ষার বাসনা রাখতুম। এখন রূপান্তরিত হওয়ায় সে ঘর আর চেনবার উপায় নেই।

অল্প বয়সেই রবিদাদা গান রচনা করতেন। জ্যোতিদাদা (জোতিরিন্দ্রনাথ) তার স্বরলিপি করতেন। ইন্দিরা দেবী, আমার ছোট মামা (যশোপ্রকাশ মুখোপাধ্যায়) আর বড়মাসী (সুশীলা দেবী) সরলা দেবী এবং ইন্দিরা দেবী প্রভৃতিকে তাঁর গান শেখাতেন। ছোটমামার কণ্ঠ খুব মিষ্টি ছিল এবং রবিদাদার কাছে শুনেছি তিনি খুব শীঘ্রই গানের সুর আয়ত্ত করতে পারতেন। পরবর্তী কালে দিনুদাদা (দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর) বড় হ'লে তাঁকেই তিনি তাঁর গানের ভাণ্ডারী করেছিলেন। দীনুদাদারও ছিল অসাধারণ ক্ষমতা সুর শিখে নেবার।

রবিদাদার শিশুদের প্রতি ভালবাসার কথা এবার বলি। আমি এবং আমার ভাইয়েরা বাল্যকালে যখন মা বাবার সঙ্গে কখনো কখনো জোড়াসাঁকোয় এসে দিদিমার (শরৎ কুমারী দেবীর) কাছে থাকতুম তখন আমাদের আকর্ষণ ছিল রবিদাদার প্রতি। তাঁর আমাদের নিয়ে একটা খেলা ছিল, এক নিঃশ্বাসে 'ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলনকোমলমলয়সমীরে' ধরণের অনেক লম্বা লম্বা সমাসযুক্ত কথা বলার অভ্যাসের দ্বারা আমাদের জিভের জড়তা কাটানোর খেলা। আবার আমাদের সহজবুদ্ধির পরীক্ষার ছলে নানা প্রকার প্রশ্ন করতেন, যেমনঃ "পরস্মৈপদী ভাল না আত্মনেপদ?" "কান বড় কি চোখ বড়?" ইত্যাদি। গল্পবলায় এক খেলার কৌশল ছিল তাঁর, প্রথমে তিনি নিজে হয় তো আরম্ভ করলেন 'একছিল রাজা, একছিল রাণী' তারপর আমাদের একে একে এক জনের পর একজনকে বাকি গল্পটা বানিয়ে জুড়ে দিয়ে বলে যেতে হতো; তারপর শেষ করতে না পারলে তিনি নিজে গল্পটাকে সীমানায় এনে দিতেন। বহুকাল পরে আশ্রমে তাঁর নিকট থাকার কালে সন্ধ্যাবেলায় মাঝে মাঝে শিশুবিভাগে শালবীথীকাগৃহে গিয়ে রবিদাদা আর আমি প্রমথ বিশী, শশধর সিংহ প্রভৃতি শিশুদের কাছে এই প্রকার গল্পরচনার খেলা করতুম। শশধর (এখন ডক্টর শশধর সিংহ) সেই কথা আমাকে এখন মনে পড়িয়ে দিলেন। তিনি এখন কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টের প্রকাশনা বিভাগের ডাইরেক্টর। আশ্রমের তখনকার ছাত্রদের মধ্যে শ্রীমান প্রমথনাথ বিশীর অল্পবয়সে কাব্য ও সাহিত্য

প্রতিভা দেখা দিয়েছিল। 'বুধবার' পত্রের সম্পাদকতা তিনি করেন এবং বিধুশেখর শাস্ত্রীর 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখেন। আমার আঁকা তখনকার আশ্রম-শিশুদের প্রতিকৃতি আজও রক্ষিত আছে।

রবিদাদার সমসাময়ীক বয়সের লোকদের তাঁর যৌবন কালে যে ভুলধারণা তার কথা বলি। বুদ্ধদেবকেও জীবিতকালে এরূপ লাঞ্ছনা সইতে হয়েছিল। গুণসম্পন্ন কবির যৌবনে ভুবনমোহন রূপ-জ্যোতিতে পতঙ্গের মত তরুণীরা তখন আত্মসমর্পণ করতে চাইতেন কিনা এ-প্রশ্ন সহজেই আসতে পারে। 'বায়রণ, শেলীর কথাই স্বভাবতঃ মনে আসে। কিন্তু দিদিমার কাছে যা শুনেছি তাতে মনে হয় তাঁর প্রকৃতি ছিল অন্যরূপ—কাজের অন্ত ছিল না—কাজেই ফাল্‌তু সময় নষ্ট করারও উপায় ছিল না তাঁর। তা ছাড়া মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথের আভিজাত্যও ধার্মিক জীবনে সুনিয়ন্ত্রিত গৃহে পুত্রদের চরিত্র যে ভাবে সুশৃংখলায় গঠিত হয়ে উঠেছিল—সমকালীন ব্যক্তিরা যাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে জানেন তাঁরাই বলবেন কখনো কল্পনায়ও উশৃংখল আচরণ তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। আমরা জানি রবিদাদা জীবনে কখনো অসংযমী আত্মীয়দের প্রশ্রয় দেননি।

একটি ৯।১০ বৎসরের শিশু কন্যার কাছে বুড়ো বয়সে রবিদাদা ধরা পড়েছিলেন। সে তাঁকে সুদূর পশ্চিম থেকে 'ভানুদাদা' নাম দিয়ে কাঁচা হাতে আধ-আধ ভাষায় বড় বড় অক্ষরে পত্র লিখতো। রবিদাদা স্মিতহাস্যে তার পত্র এলেই আমাকে দেখাতেন। পরে মেয়েটি বড় হয়ে আশ্রমে পিতামাতার সঙ্গে আসে এবং বিরাট নামী পরিবারের পুরলক্ষ্মী এখন।

মা'র কাছে শুনেছি রবিদাদার বিবাহিত জীবন খুবই আনন্দের ছিল। তাঁর পত্নী (ছোটদিদিমা) আমার মার প্রায় সন বয়সী ছিলেন এবং আমার মাকে (ভাগিনেয়ীকে) বিশেষ প্রশ্রয় দিতেন। মা বলতেন, বাড়ীর মেয়েদের মধ্যে তিনি খুব শান্ত স্বভাবের ছিলেন। আমার তাঁর কথা খুবই আব্‌ছা মনে আছে।

রবিদাদার খাবার টেবিলে ছোটদের আকর্ষণ ছিল রবিদাদার মাথা কলার। মা'রাও উপভোগ করেছেন, আমরা তাঁর নাতিরাও উপভোগ করেছি। ক্ষীর, কমলালেবু, কলা, পেস্তাবাদামের সঙ্গে জ্যাম, জেলি বা আমসত্ত মেখে উপাদেয় খাদ্য তৈরী করতেন। এইরূপ কলার মাথার উপর একটি ছড়া তাঁর আত্ম-জীবনীতে আছে সকলেই তা জানেন। ভালো রান্না, ভালো পোষাক সর্বপ্রকার

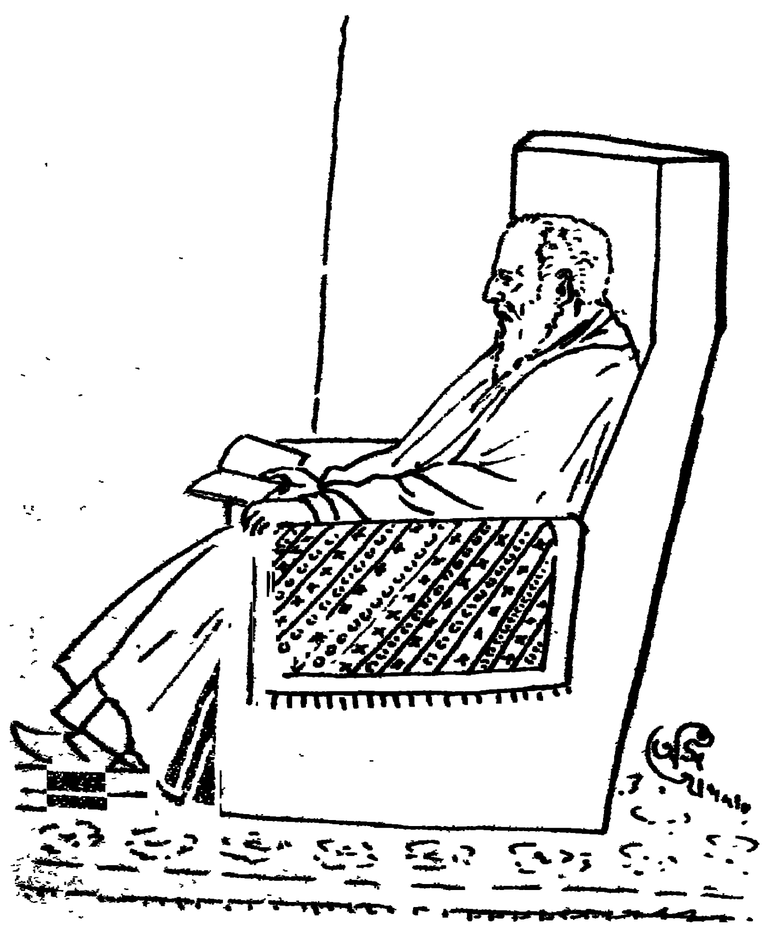
সৌকুমার্য্যই তাঁদের বাড়ীর ছিল বৈশিষ্ট। রান্নার জন্য ব্রাহ্মণ পাচক ছাড়াও মগ-খানসামা এমনি কি—ফরাসীদেশের পাচকও নিযুক্ত ছিল। জ্যোতিদাদার নিকট শুনেছি মহর্ষির সঙ্গে শান্তিনিকেতনে থাকারকালে নিকটবর্তী খোয়াইয়ে মাটী ধোয়া নালায় (Semi precious stone) ছোট ছোট নুড়ি বহু সন্ধানের দ্বারা সংগ্রহ করে এই ফরাসী রাঁধুনীটি নিজের দেশে পাঠিয়ে রোজগার করতেন।

মহর্ষি জীবিতকালে, পূর্বে তাঁর পত্নী এবং পরে দিদিমা এবং বড়দিদিমা বড় হলে তাঁরাই রান্নাঘর বিভাগের তদারক করতেন এবং মহর্ষির আহারের সময় উপস্থিত থেকে তাঁকে পাখা করতেন, আর প্রত্যেক দিনের নতুন নতুন রান্নার 'মেনু' বলে দিতেন। আমার দিদিমা এইভাবে নিজে রান্নাতে এত সিদ্ধহস্ত হয়ে গিয়েছিলেন যে তাঁর রান্নার সুনাম তখন খুব ছিল। পরে রবিদাদার সঙ্গে খেতে বসলে তিনি বলতেন "সেজদিদির হাতের রান্না খাস অসিত, বনমালীর রান্না তোর ভাল লাগবে কি করে ?"

তাঁদের তখন গানের মজলিসে ভারতবর্ষের এমন গুণিগায়ক বা বাদক কেহ ছিলেন না যাঁরা তাঁদের বাড়ীতে না এসেছেন। রবিদা গান শিখেছিলেন সুবিখ্যাত গায়ক যদুভট্টের নিকট আর সুবিখ্যাত রাধিকা গোঁসাই নিযুক্ত ছিলেন বাড়ীর ছেলে-মেয়েদের গান শেখাতে।

মা'রা বলতেন "গাইতে গিয়ে যাতে আমরা মুখ বিকৃত না করি তার জন্য রাধিকাবাবু আমাদের সামনে আয়না রাখতেন।"

শুনেছি তখন জ্যোতিদাদা পোষাক সংস্কারের চেষ্টা করছিলেন অনেক প্রকারে। কোঁচানো ধুতি যাতে প্যাণ্টের মত চট্‌করে পরা যায় বার বার না কুঁচিয়ে তার জন্য ক্লীপ, বোতাম লাগানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। তখন নতুন নতুন সাইকেল উঠেছে, বড়দাদা মহাশয় ব্রাউন পেপারে জামা তৈরী করে সাইকেল চড়ে সারা চৌরঙ্গী পরিভ্রমণ করেছিলেন। এইসব থেকে তাঁদের সংস্কারমুখী প্রতিভার কথা জানা যায়। গতানুগতিকতার তাঁরা পক্ষপাতি ছিলেন না—ধর্ম ও সমাজ সংস্কার প্রভৃতির মূলে সেইজন্য সর্বদা তাঁরাই ছিলেন অগ্রণী।



মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর



দার্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে আমাদের পারিবারিক যোগ

রবিদাদার বিষয় বলার পূর্বে আমাদের (জগদ্দলের হালদার) পরিবারের সঙ্গে ঠাকুরবাড়ীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক কিরূপে স্থাপিত হলো তার কথা বলে রাখি। আমার পিতামহ রাখালদাস হালদারের সঙ্গে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম যোগাযোগের কথা মহর্ষি আত্মজীবনীর প্রথম সংস্করণের ৫৮ পৃষ্ঠায় এবং ১৯২৭-এ বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত শ্রীসতীশ চক্রবর্তী সম্পাদিত তৃতীয় সংস্করণের পরিশিষ্ট ৫৩ এবং ৫৪ অধ্যায়ে বিশদ ভাবে দেওয়া আছে :

"রাখালদাস হালদারের পিতা বেচারাম হালদার (খৃঃ ১৭৮৫-১৮৬৯) ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে পূর্তবিভাগে কর্ম করিতেন। ইনি সাধুপ্রকৃতি, পরোপকারী, স্বধর্মনিষ্ঠ ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন।......

...দেবেন্দ্রনাথ ইঁহারই বাটীতে ২রা জুলাই ১৮৫২ তারিখে "জগদ্দল ব্রাহ্ম সমাজ" স্থাপন করেন। ইনি ব্রাহ্মধর্মবিশ্বাসী না হইয়াও নিজ উদারতাগুণে বাটীতে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইতে দেন। রাখালদাস হালদার (১৮৩২-১৮৮৭) ইহাদের পূর্বেই দেবেন্দ্রনাথের সংস্পর্শে আসিয়া ব্রাহ্মধর্মে বিশ্বাসী হন। তিনি চিন্তাশীল ও জ্ঞানানুরাগী মানুষ ছিলেন। অক্ষয়কুমার দত্তের ও অনঙ্গমোহন মিত্রের সহিত মিলিত হইয়া তৎকর্তৃক ১৮৫২ সালে 'আত্মীয় সভা' স্থাপন এবং তৎপরে সংস্কৃত উপাসনা প্রণালী সম্বন্ধে ও ব্রাহ্ম সাধারণের আস্থা-সম্বন্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করেন।...

...সে সময় দেবেন্দ্রনাথের অনুবর্তিগণের মধ্যে রাখালদাস অনেক বিষয় অত্যগ্রসর ছিলেন।" বলাবাহুল্য, এ-থেকে বোঝা যায় ক্রমে এই ঘনিষ্টতার ফলে আত্মীয়তায় পরিণত হয় আমার পিতার সহিত মহর্ষির দৌহিত্রী (নাত্‌নীর) সুপ্রভা দেবীর বিবাহ হওয়ায়। আমার পিতামহ তখন বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন, শম্ভুনাথ পণ্ডিত প্রমুখ বহু বিদ্যোৎজনমণ্ডলীর সকলপ্রকার ধর্ম ও নৈতিক সংস্কারের মহান কার্যে সহায় হন। অধুনা বিলুপ্ত পিতামহের রক্ষিত বহু দেশী ও বিদেশী মনীষীদের চিঠিপত্রের মধ্যে তখনকার বিষয় অনেক কথাই ছিল। পিতাঠাকুর কেশব সেনের চিঠিপত্র-দৈনিক পত্রিকায় পূর্বে কিছু প্রকাশ করেছিলেন। একটা কথা আমি জানি, পিতামহ বিলাতে থাকার কালে মহর্ষি তাঁকে পত্রে লিখেছিলেন, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিলাতে আগমনের খবর

দিয়ে এবং অনুরোধ করেছিলেন নবাগতকে দেখবার শোনবার জন্য। পিতামহের পুরোনো ছবির এ্যালবামে মহর্ষির পত্নী ও ছেলেমেয়েদের সবাইকার ফোটোগ্রাফ সযত্নে রক্ষিত ছিল। আমি 'রবীন্দ্র-জয়ন্তী' উপলক্ষ্যে রবিদাদাকে পাঠিয়েছিলুম, রাঁচি থেকে তাঁর ছেলেবেলার একটি ফোটোগ্রাফ, যা' তাঁদের সংগ্রহে ছিল না। রবিদাদা সেটি পেয়ে আমায় লিখেছিলেন :

"কল্যাণীয়েষু, তুই যে ফোটো পাঠিয়েচিস সেটা পেয়ে আমি খুব খুসি হলুম। এ ছবির কথা আমি একেবারেই ভুলে গিয়েছিলুম। আমার ১৪।১৫ বৎসরের ছবি—এ আর কারো কাছে নেই।

বিলাতে যাব তোকে আমার ঠিকানা নিশ্চয় দেবো—তোর কাছ থেকে ছবির কার্ড পেলে খুসি হব—এমন কার্ড পাঠাস যাতে বিলাতে তোর যশ রটে যায়। সেখানে তুই যাবার আগে তোর পরিচয়টা যেন ভালো করে হয়।

এই ছবিটার কাজ হয়ে গেলেই তোদের ফিরিয়ে দেব। ইতি—

২৬শে মাঘ ১৩১৮ তোর রবিদাদা

এইসব থেকে বোঝা যাবে আমাদের পরিবারের সঙ্গে ঠাকুরবাড়ীর (বড়বাড়ীর) ঘনিষ্ঠতার বিবরণ।

এখানে একটা কথা আনুসঙ্গিক না-হলেও বলা দরকার মনে করি। পিতামহ (রাখালদাস হালদার) বিলাতে থাকার কালে রাজা রামমোহন রায়ের জীবনী বিষয় মিস মেরী কার্পেণ্টারের ভাগিনেয়ীর নিকট তখনকার বহু কাগজপত্র সংগ্রহ করে এনেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সরকারী কাজ থেকে অবসর পাবার পর রাজা রামমোহনের বিস্তারিত জীবনবৃত্তান্ত লিখবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় তাঁর অবসরের পূর্বেই দেহান্ত হওয়ায় তা আর কার্য্যে পরিণত হয়নি। তাছাড়া পরে আমার পিতার নিকট রক্ষিত সেই সব কাগজপত্র দৈববশে বর্দ্ধমানে থাকার কালে চুরি যায়। রাজা রামমোহনের স্বহস্তে লেখা একটি ইংরাজী পাণ্ডুলিপি এবং তাঁর স্মারকরূপে মিস মেরী কার্পেণ্টারের গৃহে রক্ষিত মাথার কেশ অংশ 'রামমোহন লাইব্রেরী' কলিকাতায় পিতা উপহার দেন। আমাদের বাড়ীতে ছিল কবিগুণাকর ভারতচন্দ্র রায়ের বিখ্যাত সংস্কৃত শ্লোকে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে নিমন্ত্রণ পত্র এবং রাজার স্বহস্তে পত্রের মার্জ্জিনে লেখা তার উত্তর। পিতা সাহিত্য-পরিষদের সংগ্রহে সেটি গচ্ছিত রাখেন। মহাকবি ভারতচন্দ্রের বাড়ী জগদ্দলের সন্নিকটে আৎপুরে ছিল এবং প্রপিতামহ

বেচারামের সহিত ভারতচন্দ্রের প্রপৌত্রের বিশেষ বন্ধুত্ব থাকায় এই চিঠি আমাদের বাড়ীর সংগ্রহে এসেছিল।

রবিদাদার ভাইবোন

এইবার আবার রবিদাদার কথায় ফেরা যাক। ১৯০৫-এ মহর্ষির তিরোধানের অল্প কাল পূর্বেই ক্রমশ রবিদাদা তাঁর পিতার প্রতিষ্ঠিত বোলপুর অন্তর্গত শান্তিনিকেতনে (ডিসেম্বর ১৯০১) 'ব্রহ্মচর্যাশ্রম' স্থাপনা করলেন। উদ্দেশ্য ছিল, ইঙ্গ-বঙ্গ বিদ্যালয়গুলির অপশিক্ষার যুগে দেশের কৃষ্টিগত প্রাচীন গুরুগৃহে শিক্ষার মত শিক্ষার প্রবর্তন করা। তাঁর পুত্র শ্রীমান রবীন্দ্রনাথ, সমীন্দ্রনাথ এবং তাঁর বন্ধু শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের পুত্র সন্তোষকুমারকে নিয়েই এই বিদ্যালয় আরম্ভ করেন এবং নিজে তার শিক্ষকতার ভার গ্রহণ করেন। পরে এই আশ্রম ক্রমে ছাত্রসংখ্যার শাখাপ্রশাখার যেমন প্রসারিত হয় তেমনি অন্যান্য বহুগুণী পণ্ডিত অধ্যাপকেরাও ক্রমশ এসে যোগ দেন। মহর্ষির দেহান্তের পর জমিদারীর ভার ও বাড়ীর সকল গুরুকর্তব্যের বোঝা তাঁর উপর এসে পড়ল। কলিকাতা, শিলাহিদহ এবং শান্তিনিকেতন হ'ল তাঁর কর্মস্থান। গ্রীষ্মকাল শিলাহিদহের জমিদারী কুঠিতে বা হাউসবোটে পদ্মায় কাটাতেন। সেই সময়-কার বহু রচনাবলী এইভাবে একটানা চলেছিল তাঁর পদ্মানদীর স্রোতের মতই অটুট। বোলপুর (ভুবনডাঙ্গার) আশ্রম স্থাপনাকালে তাঁর বয়স আনুমানিক ৪০ বৎসর ছিল। রবিদাদার নিকটই শুনেছি তৎকালে তাঁর অর্থকৃচ্ছ্রতাবশতঃ আশ্রম চালনার জন্য কারুর কাছে হাত-না-পেতে একসময় পিতৃদত্ত 'রদারহামের' সোনার ঘড়ি বিক্রয় করতে হয়েছিল। তাঁর পত্নী তাঁকে নিজের অলঙ্কার দিয়েছিলেন তাঁর এই সৎকার্যে ব্যয়ের জন্য। অসীম ধৈর্য্য ও চরিত্রবলে আজ তাঁর সাধনা সফলতামণ্ডিত হয়েছে এবং তাঁর আশ্রম জগৎ বিদিত হতে পেরেছে।

আমার বাবা (সুকুমার হালদার) ছিলেন ডেপুটি, কলকাতার বাইরে বঙ্গদেশের নানাস্থানে বদলী হয়ে ঘুরতে হতো তাঁকে। মাঝে মাঝে কলকাতায় আসলে আমাকে রবিদাদাদের কাছে জোড়াসাঁকোয় নিয়ে যেতেন, তাঁরা আমাকে ভাল বাসতেন বলে। দার্শনিক বড়দাদাকে (দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে) দেখতুম অক্লান্ত পরিশ্রমে লিখে চলেছেন কূট দার্শনিক তত্ত্ববিচার। জ্যোতিদাদা,

(জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর) মেজদাদা (*সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর*) সংস্কৃত, মহারাষ্ট্র এবং ফরাসী ভাষায় সকল প্রকার রচনার সারগর্ভ বাঙ্গলা ভাষায় প্রচার করেছেন অনুবাদ কোরে। মেজদাদা ও বড়দাদার মেঘদূতের (কালিদাসের সর্বোৎকৃষ্ট সুললিত রচনা) পদ্যানুবাদ তখন সংস্কৃতের দুর্বোধ্য কায়া ত্যাগ করে বাঙলাভাষায় সর্বসাধারণের নিকট প্রথম সহজবোধ্য হোতে পেরেছিল।

আমাকে রবিদাদার এই মনীষী জ্যেষ্ঠভ্রাতারা সবাই চিত্রবিদ্যা শিক্ষায় বিশেষ উৎসাহ দিতেন। বাবার সঙ্গে যখন তাঁদের কাছে যেতুম তখন সঙ্গে আমার আঁকা ছবির তাড়াও নিয়ে যেতুম তাঁদের দেখাবার জন্যে। একবার, তখন আমার ১২।১৩ বৎসর বয়স, আনাগরিক ধর্মপালের মুখে বুদ্ধজীবনীর বহু গল্প শুনে কয়েকটি চিত্র এঁকেছিলুম। রবিদাদা দেখে উৎসাহিত করলেন এবং বললেন "তোর ছবিতে ফুটেছে ইটালীর আর্টিষ্টদের আঁকা ছবিতে যেমন একটা, থিয়েটারী ভঙ্গী থাকে। ছবি অভিনয় নয়, ছবি হল শিল্পীর মনে অলক্ষ্যভাবে যে ছবি আসে সেইটিকে ফোটানো; সেখানে সে নিজেতো গোপন থাকবেই তাছাড়া ছবির মধ্যেকার মানুষগুলিও নিজেকে দেখাবে না প্রকাশ-উৎসুকভাবে। তাকে, শিল্পী এঁকে ধরবেন আগে এবং ফোটাবেন এমনভাবে পুনরায় যাতে সেটার সহজ ও সরল ভাবটুকুই শুধু ব্যক্ত হয়।" এই একটি তাঁর উপদেশ চিত্রকলা বিষয়ে আমার বিশেষ কাজে লেগেছে আজীবন এবং আজও আমার মনে গেঁথে আছে। তখনো অবনমামার (অবনীন্দ্র নাথের) কাছে পৌঁছাইনি ছবি আঁকা শিখতে।

পরে যখন ১৯০৫ সাল থেকে কলকাতা আর্টস্কুলে অবনমামার কাছে ছবি আঁকা শেখা আরম্ভ করি, তখন আমার গতিবিধি সুরু হল ন'দিদিমার (স্বর্ণকুমারী দেবীর) বাড়ী সানিপার্কে। সরলা মাসী (শ্রীমতী সরলা দেবী চৌধুরী) তখন কংগ্রেস ও জাতীয় আন্দোলনে মেতে আছেন। ইনি পরে 'ভারতী' সম্পাদনকালে তাঁর 'বাল্যকথা' প্রবন্ধে তাঁর ভগ্নী ডেপুটিগৃহিনী বলে উল্লেখ করেছিলেন আমার মা'র কথা। আমি তখন থাকতুম দিদিমার কাছে ৪৪নং বেনেপুকুর রোডে। প্রতি শনিবার, রবিবারে ন'দিদি আমার জন্য গাড়ী পাঠিয়ে দিতেন তাঁর কাছে যাবার জন্যে। ন'দিদি তখন 'ভারতী'র সম্পাদিকা। তাঁর সেই ভারতীকুঞ্জেও কখনো কখনো রবিদাদার সঙ্গে সাক্ষাৎ হতো। তিনি আমাকে সেখানে দেখে সকৌতুকে ন'দিদিকে বলতেন: "ন'দিদি, অসিতকে

খাইয়ে-দাইয়ে মোহিত করে রেখেছে, তাই সে আর আমার দিকে আর আসে না।" ন'দিদির 'ভারতী'র সহকারী সম্পাদক অবনমামার জামাতা মণিলাল গাঙ্গুলী, এবং সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রায়ই দেখা হতো, তাছাড়া সতেন্দ্রনাথ দত্ত (অক্ষয় কুমার দত্তের পৌত্র) চারু বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রবাসীর সহকারী সম্পাদক) প্রভৃতি অনেকেই তাঁর কাছে আসতেন। সেইখানেই প্রথম তাদের সঙ্গে দেখা হয় এবং সখ্যবদ্ধ হই।

ন'দিদির বাড়ীতে ত্রিপুরার-বড়ঠাকুর, পি-কে রায়, স্যার আশুতোষ চৌধুরী তারক পালিত প্রভৃতি কলকাতার যাবতীয় গুণী-মানী ব্যক্তির সমাগম হোত। তাঁদেরও স্নেহলাভ থেকে তখন বঞ্চিত হইনি। শ্রদ্ধেয় তারক পালিত মহাশয় আমায় বিশেষ স্নেহ করতেন এবং কখনো কখনো সঙ্গে করে আমাকে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে যেতেন। তাঁর মৃতুর পূর্বে মাননীয় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে বলেছিলেন "গুরুপ্রসন্ন ঘোষ স্কলারশিপ" দিয়ে আমাকে বিলাতে আর্ট শেখার জন্য পাঠাতে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বক্ষ্যমান কারণে তা হয়ে ওঠেনি। এইসময় ন'দিদির বাড়ীতে হোতো ছেলেমেয়েদের Fancy dress, Tableau প্রভৃতি বহুপ্রকারের অনুষ্ঠাঙ্গের আয়োজন। আমাকে সাজাতে হোতো এবং অভিনয়-ভঙ্গী শেখাতে হোতো সবাইকে। একবার Fancy dress এ মেটারলিঙ্কের Blue Bird-এর শিশু তিতিল (Titil) সাজিয়েছিলুম হিরণ মাসীর (ন'দিদিমার বড় মেয়ের) ৪।৫ বৎসরের শিশুকন্যা কল্যাণীকে (এখন ইনি ডক্টর কল্যাণী মল্লিক, ডি-লিট)। সকলেই মুগ্ধ হয়েছিলেন দেখে এবং কল্যাণী উপহার পেয়েছিলন রঙিন খেলনা তার ফলে। ন'দিদির বাড়ী এইসব অনুষ্ঠান দেখার পরে প্রিয়দিদি (সাহিত্যিক কবি প্রিয়ম্বদা দেবী) ব্রাহ্ম গার্লস্ স্কুল-এ করলেন, সাবিত্রী সত্যবান 'tableau' বড়লাট পত্নী লেডি চেমসফোর্ডের শুভাগমন উপলক্ষ্যে। আমার উপর তার অভিনয়ভঙ্গী শেখানো, মেকাপ এবং ষ্টেজসজ্জার ভার পড়লো। ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের একটি মেয়ে সাজলেন সাবিত্রী। দেখলুম তাঁর করমর্দনই বিলাতে গিয়ে আয়ত্ত করা আছে তাই ব্রীড়ানম্রভাবে যমকে প্রণাম করার ভঙ্গীটা তাঁর পক্ষে আয়ত্ত করা অসম্ভব হয়ে উঠলো। ভারতীয়দের বিলাতী শিক্ষার পরিণামের বিষয় তখন হাড়ে হাড়ে অনুভব করেছিলুম।

ন'দিদিমার স্নেহের নিরিখ তাঁর বহু চিঠিপত্র এখনো আমার কাছে আছে। 'ভারতী'তে আমার কবিতা সংশোধন করে তিনি প্রথম প্রকাশ করেছিলেন। ন'দিদির নিকট কোনো কারণে যেতে দেরী হলেই তিনি পত্রাঘাত করতেন। ১২-১০-১৮ পত্রে তিনি আদর করে লিখেছিলেন :

"স্নেহাস্পদেষু,

তবু মনে পড়েছে সেও ভাল, আমার মনে জাগরূক রয়েচ—

সে কি ভোলা যায় কেমনে ভুলি!
আধেক নয়নে মুখ তুলে চাওয়া
ধীরে ধীরে হেসে মনোকথা কওয়া
ছবিটি আঁকিতে প্রেমগান গাওয়া
মোহন আঙ্গুলে ধরিয়া তুলি,
হায়! সে ভুলেছে আমি কেমনে ভুলি!

সকলে ভাল আছে জেনে সুখি হলুম, একবার এস—দেখা দাও। বিরহে যে প্রাণ অধীর হয়ে উঠেছে! কাজকর্ম কেমন চলছে?······আমার আশীর্বাদ গ্রহণ কর। তোমার ন'দিদি।"

ন'দিদি ১৯১২ সালে আমার বিবাহ উপলক্ষে তাঁর রচিত একটি নাটিকা 'পাকচক্র' ছড়া সম্বলিত করে উৎসর্গ করেছিলেন। তাতে 'বিবাহ যৌতুক' কবিটাটিতে ছিল—

হাসিতে রচি দিলাম গাছি এই, কৌতুক নব ধাঁধা
তোরে যৌতুক উপহার।
তুমি, যতনে যত খুলিবে তত পড়িবে পাকে বাঁধা
প্রাণে ছুটিবে হর্ষাধার। (বসুমতীর স্বর্ণকুমারী গ্রন্থাবলী দ্রষ্টব্য)

তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'ফুলের মালা'-র জন্য আমি ছবি এঁকেছিলুম। সেই সময়কার (১৯১৪) তাঁর একটি চিঠিতে আছে :

"স্নেহাস্পদেষু—অসিত, তোমার চিঠিখানি ভারী কৌতুহলাক্রান্ত করে তুলেছে। কি পাঠাচ্ছ তা বুঝেছি—একখানি ছবি। একখানি ছবি আমার খুব দরকার আছে—একটি পরমাসুন্দরী মেয়ে চাই। শক্তিকে যেরকম বর্ণনা করেছি সেই রকম। Fatal Garland ("ফুলের মালার" ইংরাজী অনুবাদ) বিলাতে ছাপতে পাঠাচ্ছি। একখানি ছবি পেলে ঠিক হোতো। তিনরঙা

ছবি আছে—তাতে শক্তির মুখটি ভারি ভোঁতা হয়েছে—একেবারে অচল। একরঙা বেশ পরমাসুন্দরী একটি চেহারা কি আঁকতে পার? এ ছবিখানা পাঠাই। এইরকম দুজনার ছবি কিন্তু একরঙা হবে আর শক্তিকে অপূর্ব রূপসী বলে মনে হবে। যদি এঁকে পাঠাতে পার তো চেষ্টা করো। আসছে মেলে পাঠাবো।······রদেনষ্টাইন তোমাকে তাঁর best regards দিয়েছেন ইত্যাদি। কি লিখব তাঁকে? আমার আশীর্বাদ গ্রহণ কর!—নদিদি।"

১৯০৯ এবং ১৯১০ সালের শীতকালে দুবার যখন বিলাত থেকে আগত লেডি হেরিংহাম (Lady Herringham) এবং তাঁর সাথীদের সঙ্গে একযোগে আমরা অজন্তার ছবির নকল করি, তখন ন'দিদি আমাকে নিজের কাছে অজন্তার কাহিনী লিখিয়ে নিয়েছিলেন তাঁর 'ভারতী' পত্রিকার জন্য (কার্তিক ও অগ্রহায়ণ ১৩১৭র 'ভারতী' দ্রষ্টব্য) পরে (১৩২০-তে) সেটি 'অজন্তা' নামে বইয়ে অবনমামার (আমার গুরুদেবের) আশীর্বাদ যুক্ত ভূমিকা সম্বলিত করে প্রকাশ করি এবং ন'দিকে উৎসর্গ করেছিলাম। ভারতীতে প্রবন্ধগুলি ক্রিয়াপদ এবং বহু শব্দ চলতি ভাষায় প্রথম লিখেছিলাম। সেইজন্য শান্তিনিকেতনে বিধুশেখর শাস্ত্রী এবং অন্যান্য পণ্ডিতেরা "গুরুচণ্ডালী" দোষযুক্ত ভাষায় লেখা হয়েছে বোলে বিরুদ্ধ সমালোচনা করেছিলেন। কিন্তু বড়দাদা, মেজদাদা, জোতিদাদা এবং রবিদাদা স্বয়ং এই ভাষার বিশেষ প্রশংসা করেছিলেন। রবিদাদা বলেছিলেন "তুই কারু কথা শুনিস্ নে, তোর কলমে যে ভাষা আসে সেইটেই তোর ভাষা।" এমন কি মেজদাদা তাঁর 'বম্বে প্রবাস' বিষয় ভারতীতে যে আমার মতই চলিত বাংলায় লিখেছিলেন সেকথা আমাকে পরে তিনি নিজেই বলেছিলেন। এই সময়কার একটা ঘটনা উল্লেখযোগ্য। কেননা তাতেই বাঙলা ভাষার সংস্কৃত বহুল পোষাকি ভাব কেটে গিয়ে চলিত ভাষার দিকে মোড় ফিরলো। ঢাকা রিভিউ' পত্রিকায় মেজদাদার উক্ত লেখার বিরুদ্ধ সমালোচনা বেরিয়ে ছিল। সম্পাদক মহাশয় এই মর্মে লিখেছিলেন: "শ্রদ্ধেয় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের মত প্রবীণ সাহিত্যিক প্রাদেশিকতা রক্ষা করিয়া 'বম্বে প্রবাস' বিষয় 'ভারতী'তে লেখায় বঙ্গসাহিত্যের সমূহ ক্ষতি হইল।" আমার পিতা সেই 'ঢাকা রিভিউয়ের' সমালোচনা রাঁচিতে মেজদাদা মহাশয় এবং তাঁর জামাতা প্রমথ চৌধুরী মহাশয়কে একযোগে দেখান; ফলে প্রমথ চৌধুরী মহাশয় "সাধুভাষা

বনাম চলিত ভাষা" প্রবন্ধ চলিত বাঙলায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেন 'ভারতী'তে এবং অব্যবহিত পরে তাঁর 'সবুজপত্র' পত্রিকায় সেই ধারা বজায় রাখেন। (ভারতীতে প্রথম এ বিষয় তিনি লেখেন চৈত্র ১৩১৯এ অর্থাৎ আমার অজন্তা বিষয় চলিত ভাষায় লেখা প্রবন্ধ ছাপার দু'বৎসর পর) এইভাবে বাঙলাদেশে চলিত বাঙলায় লেখার প্রচার হয়। রামচন্দ্রের সেতুবন্ধন উদ্যোগে কাঠবিড়ালীর সেতু রচনায় সহায়তার মতই আমার এ বিষয় শুধু প্রচেষ্টামাত্র হয়েই রয়ে গেল।

আমি আমার পিতামহ (রাখালদাস হালদারের) অভিমত তাঁর রোজ-নামচায় পড়েছিলাম (১৮৫২-তে লেখা) "বাঙলাভাষার ক্ষমতা বৃদ্ধির উপায় কি? কতকগুলি লোক কেবল সংস্কৃত রচনা রীতি ভাল বাসেন, কতকগুলি কেবল গ্রাম্য বাঙলা রীতি ভাল বাসেন, কতকগুলি কেবল ইংরেজী রচনারীতি ভালবাসেন। ফলতঃ যাঁহারা বাঙলা ভাষায় নূতন নূতন রচনা-রীতি প্রবিষ্ট করিতে ভীত হয়েন, তাঁহারা অতি অবিবেচক। আমার মত এই যে এই ভাষায় যত নব নব রীতি সমাবেশিত করা যাইবে এভাষার ক্ষমতা তত বৃদ্ধি হইবে। ইংরাজী ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় নানা গ্রন্থ অনুবাদিত হইয়াছে, এবং ইংরাজেরা নানা ভাষা শিক্ষা করিয়া স্বীয় ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। সেই কারণেই এক্ষণে ইংরেজী ভাষার ক্ষমতা চমৎকারিণী হইয়াছে।" আমি পিতামহকে দেখিনি। রবিদাদা এবং বড়দাদা মহাশয়দের কাছে শুনেছি তিনি নাকি কথাবার্তায়ও বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করতেন। আমি সবুজপত্রে প্রকাশের জন্য তখন ঠাকুর্দার উক্ত প্রস্তাবটি পাঠিয়েছিলাম কিন্তু বক্ষ্যমান কারণে তা প্রকাশিত হয়নি। পরে শান্তিনিকেতনে থাকারকালে পিতার সংগৃহীত Behay Research Society Journal-এ প্রকাশিত হো-মুণ্ডদেব প্রচলিত কাহিনীগুলির ইংরাজি অবলম্বনে কুড়িটা গল্প 'হোদের গপ্‌প" নাম দিয়ে প্রকাশ করি। যুক্তাক্ষর বর্জিত করে, প্রথমভাগ পোড়োদের উপযোগী করে লেখা—যেমন ইংরাজীতে mono-syllable দিয়ে ছোটদের বই লেখা হয় কতকটা সেইরূপ। রবিদাদা' লেখার কালে আমায় বলেছিলেন 'শ্বশুর' অব্দ, এমনি কতকগুলো কথায় তোর বাধ্‌বে দেখিস!" পরে কুড়িটা গল্প যুক্তাক্ষর বর্জিত করে লেখার পর তাঁর প'ড়ে ভালই লেগেছিল এবং আমাকে আদর করে কানমলে দিয়ে বল্লেন "তোর বুদ্ধি আছেরে, বুদ্ধি



শিল্পী গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর



শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবী

আছে।" নাতিদের আদর করে কানমলা রবিদার একটি বিশেষত্ব ছিল। পরে দেখছি এইরূপ যুক্তাক্ষর বর্জিত ভাষায় শিশুসাহিত্যে বহু বই আজকাল বেরোচ্ছে কিন্তু কর্ণধারটির কথা সবাই ভুলে গেছেন—ভুলেও স্বীকার করেন না। বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস প্রণেতাদেরও এবিষয় অজ্ঞতাই তাঁদের রচিত বইগুলিতে প্রকাশ পায়।

বড়দাদা, মেজদাদা, জ্যোতিদাদা

এখন রবিদার গুণী তিনজন ভায়ের কথা যথাসম্ভব ভাল করে বলি। বড়দাদা মহাশয় (দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর) ছিলেন দার্শনিক পণ্ডিত এবং আত্মভোলা সদা-শিব ব্যক্তি। তাঁর এই আত্মভোলার বিষয় বহু কাহিনী শুনেছি, স্থানাভাবে সবকথা বলা চলবে না। তিনি যখন নিচুবাঙলার খোলা বারান্দায় বেতের চেয়ারে বোসে গুঢ় দার্শনিক বিষয় লেখাপড়ায় মস্‌গুল থাকতেন, তখন কাঠবিড়ালীরা তাঁর পিঠের উপর চোড়ে, দোয়াত উল্টে দিয়ে উৎপাত করতো, তিনি তাদের হাত দিয়ে ঠেলে দিতেন এবং নিজের কাজ করে যেতেন; ওরা আবার ঘুরেফিরে তাঁর কাছে আস্‌তো। এইভাবে শালিক এবং ছাতারে পাখীরাও বে-পরওয়া হয়ে তাঁর মাথার উপর এসে বস্‌তো এবং তাঁর ঘরে সভা জমাতো। তাঁর বোলপুরের নিচুবাঙলাটি—নিচু চালের দিকে বাঁধের সন্নিকটে ছিল। ছুটিমাত্র ঘর এবং একটি চানের ঘর—তিনধারে বারান্দা! প্রয়োজনীয় ফারনিচার ছাড়া আস্‌বাব পত্রের আতিশয্য কিছুই নেই। তিন চারটে মোমবাতি একসঙ্গে জেলে সন্ধ্যার পর লেখাপড়া করতেন—রাত্র ১২টা পর্যন্ত! আশ্রমে তখন তাঁর বাগানে খুব ফুলের বাহার ছিল। তাঁর বাড়ীর সংলগ্ন প্রাচীর ঘেরা বাড়ীতে বড়মামী (বড়দাদার পুত্রবধূ হেমলতা দেবী) থাকতেন। তাঁকে আশ্রমের সবাই 'বড়মা' বলেন। নিচুবাঙলার বাঁধের একটি বক একদা এসে বড়দাদার সঙ্গে একেবারে ভীষণ রকমে ভাব জুড়ে দিল। প্রতিদিন সকালে তাঁর চায়ের টেবিলে একাসনে বসে বিস্কুটের ভাগ সে নিতো। ভোলামহেশ্বর বড়দাদাকে একদিন অতিরিক্ত আদর দেখিয়ে তার তীক্ষ্ণ চঞ্চু দিয়ে চোখে আঘাত করায় তাকে বন্দুক দিয়ে মেরে ফেলা হয়। এই সংবাদ শুনে বড়দা অশ্রুপাত করেন এবং তিন দিন ভালো করে কিছু খেতে পারেননি বকের শোকে। বড়দার

ভুলে যাবার কাহিনীর একটি ছোট্ট দৃষ্টান্ত দিই। একবার আমায় বল্লেন, "অসিত তোমরা মিষ্টি দিয়ে চা খাও, কাল তোমায় আমি মিষ্টি না-দিয়েই চা খাওয়াব—সকালে এসো!" তার পরের দিন সকালে দিনুদা (দ্বিজেন্দ্রনাথের পৌত্র দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর) আমায় বল্লেন, "অসিত, তুই চা খেয়ে তারপরে যাস দাদামহাশয়ের কাছে, নইলে জানিস তো তাঁকে? চা খেতে পাবি না।" বড়দার কাছে সকালে গিয়ে প্রণাম করে বসতেই দেখি তিনি ছোট্ট পেয়ালায় দুটো জিন্জার বিসকুট একসঙ্গে চায়ে ভিজিয়ে খাচ্চেন, চিনি তাতে না দিয়ে। আমার কথা একেবারেই ভুলে গেছেন। এইরকম নিমন্ত্রণ করে ভোলা বা নিমন্ত্রণ পেয়ে ভোলা তাঁর পক্ষে নতুন কথা ছিল না।

বড়দার আমার প্রতি ভালবাসা ও অনুগ্রহ ছিল অসীম। যখনই তাঁর নিকট গেছি, আনন্দে (আমি প্রণাম করার কালে) পিঠে তাঁর হাতের চপেটাঘাত খেয়েচি—তাঁর হাসির বেগও প্রচণ্ড ছিল আনন্দ যখন ফুটে উঠতো মাঝে মাঝে। তেমন দরাজভাবে হাসতেও কম লোককে দেখেচি। গভীর দার্শনিক গবেষণার ফাঁকে শ্রম-ভার লাঘব করতেন জটিল ও কূট অঙ্ক কষার দ্বারা আর ছিল আটা দিয়ে না জুড়ে, শুধু মুড়ে মুড়ে কাগজের হ্যাণ্ড ব্যাগ, বাক্স, নোটবই প্রভৃতি গড়া। আমার জন্যে একটি রঙ তুলি রাখার বাক্স তিনি কাগজের তৈরী করে দিয়েছিলেন তাঁর নিজের আবিষ্কৃত এই বিশেষ পন্থায়। তার ঢাকনার উপর আবার একটি ভ্রমরগুঞ্জিত পদ্মের ছবি তিনি নিজের হাতে এঁকে দিয়েছিলেন এবং চারধারে কবিতায় আমার নাম লিখেছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ সেটি আজ কালগর্ভে নিহিত। আমাকেও তিনি তাঁর কাগজ বিদ্যায় দীক্ষা দিয়েছিলেন। এই বিষয় (খুব সম্ভব তাঁর ১৯১২ সালের লেখা) একটি পত্রে আছে।

'অসিতকুমার—তোমার শেষ পত্রখানি পাইয়া খুসী হইলাম। ইহার পূর্বে তোমার আর পত্রের উত্তর দিতে কার্যগতিকে আমার সময় হইয়া উঠে নাই। সময়ে সময়ে Press-এর pressure-এ (অর্থাৎ মুদ্রাযন্ত্রের যন্ত্রণায়) প্রপীড়িত হইয়া আমি একপ্রকার কাজের বাহির হইয়া যাই—এবার তাহাই ঘটিয়াছিল। যা হোক—এখন একটু হাঁপ ছাড়িবার অবকাশ পাইয়া তোমার আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছি। তুমি এখানে আসিলে নূতন রচিত ব্যাগ প্রভৃতির সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে বোঝাপড়া হইবে। তোমার চিঠির মোড়কের কারীগরি

কিছু যেন Complicated বোধ হয়। আমি যে রকম প্রণালীতে চিঠি মোড়ক করি তাহা খুব সহজেই হইতে পারে এইটাই তাহার বিশেষত্ব। ঈশ্বর তোমাদের সকলকে কুশলে রক্ষা করুন। ইতি—

কাগজবিদ্যাদিগ্‌গজ পণ্ডিত—তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী বড়দাদা।

বড়দাদা তাঁর কাগজ মুড়ে বাক্স করার একটি জ্যামিতিক পদ্ধতি লিখেছিলেন, তার নাম দিয়েছিলেন Boxometry। তাঁর সেই জ্যামিতি বোঝার সাধ্য কারু ছিল না। কবিতায় বর্ণনার দ্বারা বাঙলা short-hand লেখার প্রণালীও তাঁর নতুন আবিষ্কার। দুঃখের বিষয় তাঁর বই ছাপা হয়েছিল কিন্তু আজও প্রচার হয় নাই।

পূজনীয় বড়দাদা একবার আমাকে দিয়েই একটি খবরের কাগজের জন্য "কার্টুন" আঁকিয়েছিলেন। সে বিষয় তাগিদ দিয়ে লিখেছিলেন।

"অসিত,—এখনো শনিবারের দুইদিন দেরি আছে। আজকের দিনটা আমার কাজেতে তুমি যদি ষোলআনী মন কর, তবে তাহার গুণে তোমার ছবি আঁকা বৃত্তিটা রীতিমতো জেগে উঠ্‌বে, আর সেই দরুণ—কাল পরশু কাজে তোমার হাত খুব সর্‌বে ভাল, আর যা'তে তুমি হাত দেবে তা' থেকে সোনা ফল্‌বে।

—আশীর্বাদক বড়দাদা।"

বড়দাদা একবার হঠাৎ আমার আশ্রমে থাকার কালে নিচুবাঙলায় তাঁর কাছে ডেকে পাঠালেন তাঁর চাকর মুনিশ্বরকে দিয়ে। তাঁকে প্রণাম করে গিয়ে তাঁর নিকট বসতেই তিনি বল্লেন, "দেখ, এই রচনার মধ্যে একটা বরাহ এঁকে দেখাতে চাই—আঁকলুম, হয়ে গেল একটা ছুঁচো—আমি আজ পর্যন্ত কোনো বিষয় পরিপক্ক হলুম না।" আমি দেখলুম তিনি বরাহটা ঠিকই এঁকেচেন কেবল কলমের খোঁচায় লেজটা একটু বড় হয়ে গেছে। সেটা আমি ঠিক করে দিতেই অশীতিপর প্রবীণ বড়দাদা যথারীতি শিশুর মত অট্টহাস্যে অভিনন্দিত করে আমার পিঠে আনন্দে চপেটাঘাত করলেন। তাঁর এই প্রকার কথা শুনে মনে মনে তাঁকে প্রণাম করলুম,—ভাবলুম ইনি বিরাট জ্ঞানী হয়েও পরিপক্ক হননি বলছেন, আর আমরা কিছু না জেনেও পণ্ডিত বোলে নিজেরা ঢাকঢোল বাজিয়ে বেড়াচ্ছি। এইখানে আসল ও মেকিতে তফাৎ। আমার সৌভাগ্য এইপ্রকার বহু গুণান্বিত দাদামহাশয়দের নিকট সকল বিষয়

শিক্ষালাভ করেছি—আমার সমসাময়িকদের বাজারে চল্‌তি শিক্ষার আওতায় পড়িনি। তাই কাব্যকলার সৃষ্টির দ্বারা আনন্দলাভ আমার ভাগ্যে ঘটেছে।

রবিদার সঙ্গে বড়দাদার প্রায় ২১ বৎসর বয়সের ব্যবধান ছিল সুতরাং পিতার ন্যায় তাঁকে সমীহ করে চলতেন। মাঝে মাঝে যখন আশ্রম থেকে তাঁর নিকট নিচুবাঙ্‌লায় রবিদাদা তাঁর কাছে আসতেন, আমিও প্রায় রবিদার সঙ্গে যেতুম। একদিনের কথা মনে আছে, বড়দাদা তাঁকে বললেন: "তুমি রবি এতো সময় নষ্ট কর কেন ইংরাজিতে তোমার লেখা তর্জমা করে? তোমার বই যাদের পড়বার ইচ্ছে হবে তারা বাঙলা শিখে তোমার বই পড়বে।" রবিদাদা সুবোধ বালকের মত নিরুত্তর হয়ে শুনলেন। একবার এণ্ড্রুজ সাহেবকে কাছে পেয়ে কথায় কথায় বড়দাদা বলেছিলেন: Unless you people are driven out of India, we cannot do any solid good work!" "তারপর এণ্ড্রুজকে বুঝিয়েছিলেন: "যে দেশের লোকেরা হিমালয় থেকে কুমারীকা পর্য্যন্ত রামায়ণ আর মহাভারতের কাহিনী বিদিত, সেখানকার লোকেদের নিরক্ষর বা অশিক্ষিত মনে করা ভুল।" পিয়ার্সন ও এণ্ড্রুজকে খুবই স্নেহ করতেন। পিয়ার্সন বড়দার নিকট নিয়মিত উপনিষদ ও বেদের বিষয় আলোচনা এবং শিক্ষা গ্রহণ করতেন। পিয়ার্সনের উদ্দেশ্য ছিল পরে উপনিষদ বিষয়ে বড়দাদার ব্যাখ্যান সম্বলিত বই রচনা করার। কিন্তু তাঁর অকাল মৃত্যুতে সে সাধ পূরণ হয়নি।

বড়দাদার বিষয় পুরোণোকালের একটা কথা শুনেছিলাম তাঁর অল্প বয়সে তাঁর পিতা জমিদারীর আদায়-অসুলের ভার দিয়ে সিলাহিদহ কুটিতে পাঠিয়েদিয়েছিলেন তাঁকে একবার। তাঁর দয়াগুণের দুর্বলতার বিষয় প্রজারা অবগত ছিল এবং সেই সুযোগে তাঁর কাছে কুটিতে উপস্থিত হয়ে তারা নানা প্রকার দুঃখের ও অভাবের কাঁদুনি গেয়েছিল। কপট কাঁদুনিতে ভুলে গিয়ে দয়ালু দার্শনিক বড়দাদা সে বছরের খাজনা মাপ করে কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন। মহর্ষি পিতা তাঁকে বলেছিলেন: "তা তুমি ভালই করেছ, দয়াই মানুষের পরম ধর্ম কিন্তু জমিদারের ছেলে তুমি আদায়-অসুল না হ'লে খাবে কি?"

রবিদারও এই প্রকার কারুণ্যের দুর্বলতার বিষয় তাঁর পুত্র রথীমামার নিকট শুনেছিলুম। কোনো স্কুলের হেডমাষ্টার সেজে ঘড়ি, ঘড়ির চেন ঝুলিয়ে এক ব্যক্তি প্রথম শ্রেণীর ভাড়াটে ফিটনে চড়ে জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে তাঁর কাছে

এলেন। রথীমামা তখন বাড়ীতে উপস্থিত ছিলেন না। রবিদার নিকট ভদ্রবেশী কপট লোকটি প্রণাম ক'রে করযোড়ে আবেদন জানালেন যে তাঁর স্কুলে লাট সাহেব আসেবেন পারিতোষিক বিতরণের অনুষ্ঠানে—উপযুক্ত অভ্যর্থনা যোগ্য ব্যবস্থা নেই—গরীব স্কুল, তাই যোগ্য বসার কৌচ প্রভৃতি আসবাবের প্রয়োজন। কয়েক ঘণ্টার পর অনুষ্ঠানের শেষে যথাকালে সেগুলি তিনি ফেরৎ দেবেন। রবিদাদা সেই ব্যক্তির ঠিকানাও জেনে নিলেন না। তার বিষয়ে কোন খোঁজ নেওয়ার প্রয়োজনও বোধ করলেন না। ঠেলা গাড়ী আনিয়ে আধ ঘণ্টার মধ্যে প্রিন্স দ্বারকানাথের আমলে মেহগনি কাঠের নক্সা খোদাই করা কৌচ চৌকীর পুরা একটা সেট এবং টিপাই ইত্যাদি আরো কিছু গৃহসজ্জার সামগ্রী লোকটি সরিয়ে ফেল্লে! রথীমামা সেই থেকে সাবধান হলেন এবং আর কখন এরূপ ভাবে রবিদাদাকে সম্মুখীন অজানা লোকের সঙ্গে কথা বলতে দেন নি। প্রয়োজন হলে রবিদার হ'য়ে তিনি নিজে বাইরের অচেনা লোকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। আরো একটা আত্মভোলা ব্যাপার রবিদার বিষয় রথীমামার নিকট শুনেছি। নোবেল পুরস্কার পাবার পর যখন কবি বিলাত যান, তখন প্যারিসে থাকার কালে বরোদার মহারাজা অন্যান্য ভারতীয় রাজন্যদের রাত্রভোজে নিমন্ত্রণ করেছিলেন কবিকে সংবর্ধিত করার জন্যে—উদ্দেশ্য ছিল বরোদা নিজে এবং অন্যান্য মহারাজদের কাছ থেকে নিয়ে একটা Endowment Fund বিশ্বভারতীর জন্য ব্যবস্থা করবেন। কথাটা বরোদার Private Secretary রথীমামাকে পূর্বাহ্নেই বলে দিয়েছিলেন, রথীমামা তাঁর পিতাকে সাবধান করা সত্বেও তিনি রাজাদের অশিক্ষা-কুশিক্ষা দেশ-দ্রোহিতার অপ্রিয় সত্য বিষয় প্রসঙ্গক্রমে ভোজের মজলিসে না বলে আর থাকতে পারলেন না! পুরুষসিংহ রবিদার এই প্রকার সত্যনিষ্ঠা এবং অসাবধানতায় আর্থিক অনেক ক্ষতি হইয়াছিল।

এইবার মেজদার কথা বলি। পূজনীয় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন সর্বপ্রথম ভারতবাসী আই, সি, এস এবং জজের কার্যে নিযুক্ত ছিলেন বোম্বে অঞ্চলে। তিনি বোম্বে বহু সদ্-অনুষ্ঠানে সহায় ছিলেন এবং বিশেষ ভাবে জনপ্রিয় বলে খ্যাত। মিষ্ট ভাষণ, সৌজন্য ও উদারতায় তিনি সকলেরই মন হরণ করিতেন। একবার যাঁর সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটেচে তিনি তাঁকে ভুলতে পারতেন না। কর্তব্য পালন ও সত্যনিষ্ঠায় সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন অদ্বিতীয় পুরুষ-সিংহ। তিনি

রবিদাদাকে তাঁর অল্প বয়সে নিজের সঙ্গে বিলাতে নিয়ে যান এবং পাবলিক স্কুলে ভর্তি করে দেন। সেখানে তখন বিখ্যাত ব্যারিষ্টার তারক পালিত মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র লোকেন পালিতও পড়তে গিয়েছিলেন। লোকেন পালিত মহাশয়ের (পরে ইনি জজ হন) নিকটই শুনেচি বিলাতে থাকার কালেও রবিদাদা বাংলা চর্চ্চা ছাড়েননি। তাঁদের তখন নিয়ম তিনি করেছিলেন যে ইংরাজি একটি কথা প্রয়োগ করবে বাঙলা কথার সঙ্গে তাকে এক পেনি জরিমানা দিতে হবে। পালিত সাহেবের তাঁর সঙ্গে ইংরাজী বলার যো ছিল না।

তাঁরা চায়ের 'ট্রে'কে খুঞ্চি এবং তার কাপড়ের ঢাকনাকে খুঞ্চিপোষ বলতেন। বিলাত প্রবাসেও বাঙলাভাষাকে এইভাবে সুমার্জিত করতেন। মেজদাদা বহুবার বিলাত গেলেও সাহেবি কায়দায় থাকতেন না। তাঁর দেশী কৃষ্টির উপর বিশেষ অনুরাগ ছিল। তাছাড়া বিদুষী সহধর্মিনী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী মেয়েদের সামাজিক সংস্কারের বিশেষ অগ্রণী ছিলেন। তিনিই প্রথম বম্বে প্রবাস থেকে কলকাতায় এসে মেয়েদের অবরোধ প্রথা তুলে দেবার দৃষ্টান্ত দেখান। খোলা পাল্কী ও গাড়ীতে যাতায়াত করা এবং পার্সি শাড়ির ধরণের শাড়ী পরা প্রচলিত করেন বাঙলা দেশে। ক্রমশ তাঁরই প্রদর্শিত রীতি-পদ্ধতি সারা ভাবতবর্ষে সংক্রামিত হতে দেখা যাচ্ছে আজ।

মেজদিদিমাও মেজদাদারই মত শিল্প ও সংগীত প্রভৃতিতে বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তাঁদের পুত্র (সুরেন্দ্রনাথ) এবং কন্যা ইন্দিরা দেবীকে সর্ব্ববিষয় উচ্চ শিক্ষায় গড়ে তুলেছিলেন। তাঁরাও দেশের গৌরবস্থল এবং প্রসিদ্ধ। মেজদাদার রচিত ধর্ম-সংগীত আজও ব্রাহ্মসমাজে গীত হয়। তাঁদের বাড়ীতে আমাদের মত দূর ও নিকট সম্পর্কীয় সন্তানদের খুবই আদর ছিল। মেজদিদি আত্মীয় ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য একাঙ্কিকা রচনা করে তাদের দিয়ে অভিনয় করাতেন নানা উৎসব উপলক্ষ্যে। এঁদের বিদুষী কন্যা ইন্দিরা দেবী তাঁর পতি প্রমথনাথ চৌধুরীসহ একযোগে সাহিত্যচর্চা করে গেছেন। অল্প বয়সে ইন্দিরা দেবী আমার লেখা গানের স্বরলিপি করে দিয়ে উৎসাহিত করেচেন শত গুরুতর কাজ তাঁর হাতে থাকা সত্ত্বেও, ছোট বলে তাচ্ছল্য করেননি। তাঁর স্বরলিপিসহ আমার গান নিরুপমা দেবী সম্পাদিত 'পরিচারিকা' পত্রিকায় (১৩২৬) বেরিয়ে ছিল। সে সময়কার

পরিচারিকায় (১৩২৫ থেকে ১৩২৮ পর্য্যন্ত) এবং নদিদির সম্পাদকতায় 'ভারতী'তে (১৩২৩ পৌষ এবং ফাল্গুন সংখ্যার আর প্রমথনাথ বিশী ও বিভূতি ভূষণ গুপ্ত সম্পাদিত শান্তিনিকেতনের 'বুধবার' পত্রিকার ২৪শে মাঘ ১৩২৯ সংখ্যায় "ছিটে ফোটা"-নাম দিয়ে ধারাবাহিক শিল্পকলা বিষয় নানা কথা লিখতুম। রবিদাদা পড়ে সন্তুষ্ট হয়ে আমায় বলেছিলেন, "লিখচিস তো ভাল, কিন্তু তোর আর্টের তত্ব কথা বুঝবে ক'জন?" "Rupam পত্রিকায় তার ইংরাজী অনুবাদ ডক্টর অমিয় চক্রবর্ত্তী মহাশয় করেছিলেন পরে আমার Art and Tradition পুস্তকে সেই অংশ স্থান পেয়েছে। মেজদাদা মহাশয়ও আমার সব লেখা পড়তেন এবং সাক্ষাতে আমাকে খুব উৎসাহিত করতেন। তিনি তাঁর 'বম্বে প্রবাস' প্রবন্ধে আমার অজন্তা গিয়ে ছবির প্রতিলিপি নেবার কথা উল্লেখ করেছিলেন। সেই প্রবন্ধে শিবাজী ও আফজল খাঁর প্রসঙ্গে আমার কাছ থেকে একটা তার ছবি আঁকিয়েছিলেন। মেজদাদার রাঁচি থেকে শান্তিনিকেতনে আমাকে লেখা পত্রে আছে:

"অসিত, —attitude আর expression ঠিক না-হলে ভাল ছবি কি করে হয় আমার তো বোধগম্য নয়। যদি দর্শকের কল্পনার উপরই সমস্ত রাখা যায় তাহলে হিজিবিজি যা-তা' করলেই চলতে পারে—ভাল আঁকার দরকার কি? তোমাদের ও-স্কুলের গরিমা আমি বুঝতে পারিনা। 'ভারতী'তে আফ্জাল খাঁ বধের যা' ছবি বেরিয়েছে, সেটা ঠিক্ হয়নি। আর একবার চেষ্টা ক'রে দেখ। আক্রমণ সামনে থেকে হবে অথচ কোলাকুলি করতে যাচ্ছে এমন ভাব থাকবে, আর শিবাজীর মুখের ভাব একটু fierce হবে। যখন মারতে উদ্যত, তখন আর কোমল ভাব রাখা যায় না। আফ্জাল খাঁ যেমন sketch এ দেখানো হয়েচে সেই রকম হবে—যেন পড়্তে যাচ্চে। যা' হোক্ আর একবার দেখ কি করতে পার?

বোলপুর কেমন লাগছে? তোমার কি কাজ করতে হয়? এখানকার সব ভাল। আমরা শীঘ্র কলকাতা যাচ্চি।—তোমার মেজদাদা"

মেজদাদামশাই যখন বেনেপুকুরে দাদামশাই ও দিদিমার নিকট বালীগঞ্জ ষ্টোররোডের বাড়ী থেকে প্রায়ই আসতেন তখন আমাদের (ছেলের দলকে) 'কথা ও কাহিনী'র কবিতা আবৃত্তি করাতেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল কিভাবে ভাল করে কবিতা পাঠ করতে হয় তার হদিস্ বাত্‌লে দেওয়া। যতদূর

মনে আছে তিনি এই কথাই আমাদের বলেছিলেন—সাধারণ কথা বলার সময় আমরা যেমন বিশেষ বিশেষ শব্দের উপর ঝোঁক্ দিয়ে বলি, কবিতা পাঠের বেলায় ও পাঠকালে ভাব প্রকাশক মূল-কথাগুলিকে বুঝে জোর দিয়ে পড়লেই কবিতা সুন্দর ভাবে পড়া হয় এবং অপরের শুনে বোঝার পক্ষেও সুবিধা হয়। অনর্থক সুর করে টেনে টেনে কবিতা পাঠ একেবারেই তিনি পছন্দ করতেন না। রবিদাদাকেও এই একই রীতিতে কবিতা আবৃত্তি করতে শুনেচি।

আশ্রমে রবিদার সঙ্গে থাকার কালে দুপুরে তাঁর সঙ্গে টেবিলে খাওয়া দাওয়া সেরে যখন বিশ্রাম করতুম, আমি মীরামাসী এবং নগেন মেশোর (নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়) নিকট তখন রবিদার কাব্য পাঠ করতুম। রবিদা কখন কখন আমার পাঠ শুনতেন। আমার পক্ষে ফলে এই হয়েছিল যে রবিদা আমাকে দিয়ে বিশ্বভারতীর বাঙলা কবিতার ক্লাসে এ বিষয় মাষ্টারী করিয়েছিলেন। তিনি আমায় বলেছিলেন: "বড় লজ্জা হয় আমার আশ্রমের ছেলেরা আজও ভাল করে কবিতা পাঠ করতে শিখল না।"

এইবারে মেজদার শিশুমনের সরলতার দৃষ্টান্ত তাঁর পত্নী মেজদিদিমার কাছে যা' শুনেচি বলব। তখন তিনি (সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর I.C.S.) বম্বে অঞ্চলের জজ। দোতলার পাইপ বেয়ে ঘরে একটা চোর ঢুকেচে। জ্যোৎস্না রাত! বিছানায় মেজদিদি পাশেই ঘুমিয়ে আছেন—অনেক রাত হয়েচে। মেজদাদা বিছানায় শুয়ে জেগে আছেন আর দেখচেন চোরটা চানের ঘর দিয়ে তাঁর শোবার ঘরে ঢুকে টেবিলে রাখা সোনার ঘড়ি হাতড়াচ্চে। তিনি কিছুই বল্লেন না—চোরটাও পালালো ঘড়ি নিয়ে। মেজদিদি একটু পরেই জেগে উঠে বসতেই মেজদা বল্লেন: "লোকটা সোনার ঘড়ি কেন নিলে? তার ওটা কী কাজে লাগবে?" ক্ষতির কথা তাঁর আদৌ মনে এল না। এরূপ ঘটনা রবিদার যা' হয়েছিল 'গল্পভারতী'তে (১০ম বর্ষ, বৈশাখ, ১৩৬২) পড়লুম। বোলপুরে যাবার পথে ট্রেণে তাঁর মণিব্যাগ চুরি হয়। কবি বলেছিলেন তাতে "প্রথমে লোকটার উপর রাগ হল—তার পরেই মনে হল তার অর্থাভাব ছিল তাই নিয়েচে—তা' সে যদি আমার সামনা সামনি চাইত তো সব দিয়ে দিতুম।" [সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—১৯২৩-এ স্বর্গত হন]



শালবীথি পথে রবীন্দ্রনাথ

বড়দাদা, মেজদাদা, জ্যোতিদাদা

জ্যোতিদাদা বা নতুনদাদা (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৪৮-১৯২৫) ছিলেন দেবতুল্য সুশ্রী, সুকোমল স্বভাবের লোক। ছবি আঁকতে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। ফরাসী ভাষা ও সংস্কৃত ভাষা থেকে বহু গ্রন্থের বাঙলা অনুবাদ করেছিলেন। নাটক রচনা এবং সঙ্গীত কলার চর্চা তাঁর এক বিশেষ সাধনা। বাঙলা গানের সহজ স্বরলিপি তিনিই প্রথম প্রচার করেন। ছবি আঁকা ছিল তাঁর ফালতু সময় কাটানোর খেলা। খাতা নিয়ে ষ্টোররোড বালীগঞ্জ থেকে রিক্সা করে আসতেন দিদিমার কাছে বেনেপুকুরে ছবি আঁকতে। বহু আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবের প্রতিকৃতি তিনি এঁকেছিলেন। তাঁরই দেখাদেখি আমি পেনসিলে প্রতিকৃতি (portrait) আঁকা প্রথম ধরি।

Sir William Rothenstien তাঁর আঁকা প্রতিকৃতি ছবির একটি এ্যালবাম বিলাত থেকে প্রকাশ করেছিলেন। তাতে রবিদার ছেলে বেলার চেহারা, আমার দিদিমার চেহারা, ইন্দিরা দেবীর চেহারা প্রভৃতি বহু আত্মীয়র প্রতিকৃতি আছে। (মেজদাদার পৌত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র) সুবীরকে খেলার ছলে যে সব দৃশ্যচিত্র তিনি এঁকে দিয়েছিলেন সেগুলি এখনকার তথাকথিত 'মডার্ণ' চিত্রকলার প্রাকৃতিক দৃশ্যচিত্র অপেক্ষা অনেক ভাল এবং ভাব ব্যঞ্জক।

জ্যোতিদার আর একটি অবসর বিনোদনের খেলা ছিল Phrenology—মাথার গঠনের তারতম্যের মধ্যে মানুষের গুণ নির্ণয় এবং Physiognomy চেহারার আকার দেখে গুণ নিরূপণ। তিনি যখন প্রতিকৃতি আঁকতেন তখন ব্যক্তিবিশেষের এই বিজ্ঞান সাহায্যে গুণধার্য করতেন। আমার প্রতিকৃতি করার কালে একবার বলেছিলেন "তুই নাকের জোরে এগিয়ে যাবি—তোকে কেউই ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।"

জ্যোতিদার আত্ম-জীবনীতে তাঁদের আমলের নাট্যাভিনয়ের বিবরণের মধ্যে আমার মাতামহের (যদুনাথ মুখোপাধ্যায়ের) অভিনয় দক্ষতার কথা আছে। ঘরওয়া ভাবে নাট্যকলার প্রচলন জ্যোতিদাই প্রথম বাংলা দেশে করেন।

রাঁচির মোড়াবাদী পাহাড়ে যাঁরা তাঁর কাছে গেছেন তাঁরাই তাঁর সৌজন্যে মুগ্ধ হয়েছেন। উদ্যান রচনা, পাহাড়ের গায়ে গুহাগৃহ রচনা প্রভৃতিও তাঁর সৌন্দর্য-বোধ ও শিল্পকলার প্রতি অনুরাগের পরিচয় দেয়।

তাঁকে একটি সমাজসেবা (social work) করতে দেখেছি রাঁচিতে। প্রতিদিন মোড়াবাদী পাহাড়তলির ভদ্র লোকদের বাড়ি বাড়ি রিক্সা করে গিয়ে তাঁদের

প্রয়োজনীয় আনাজ-পত্রের তালিকা মত জিনিষ সহর থেকে কিনে এনে দিতেন। প্রায় ৩।৪ মাইলের উপর রোজ নিজের দৈনিক বাজারের সঙ্গে এই শ্রমদান ছিল তাঁর নিত্য কর্ম। রাঁচিতে তাঁর নিকট কেহ অভুক্ত গিয়ে পড়লে না খাইয়ে বিদায় করতেন না। জ্যোতিদাদার পোষাক সংস্কারের কথা পূর্বেই বলেছি। তিনি সেলাই করা বাঁধা পাগড়ি তৈরী করান—সেটা ঠাকুর বাড়ীতে তখন খুব চলেছিল। 'পিরিলি পাগড়ি' নামে যে পিছনে ন্যাজ দেওয়া পাগড়ি সাধারণত ইংরেজদের সময় দরবারী বিশিষ্ট বাঙালীরা পরতেন এ-পাগড়ী সেরূপ নয়। খুবই সুন্দর মানানসৈ ছোট্ট পাগড়ী।

সেজদাদা, সোমদাদা এবং রবিদার কয়েকটি ভ্রাতুষ্পুত্র

রবিদাদা তাঁর সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের [১৮৪৪-১৮৮৪] কথা তাঁর জীবন স্মৃতিতে উল্লেখ করেছেন। বাল্যে রবিদাদাকে তিনিই পড়াতেন। তার ফলে রবিদাদা ১৫ বৎসর বয়সে সেক্সপিয়ার, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, শেলী, বায়রণ, কীট্‌স পরে ফেলেছিলেন। জ্ঞানান্বেষণ-স্পৃহা জাগিয়ে তুলেছিলেন তাঁর সেজদাদা এইভাবে। ইংরাজী, সংস্কৃত বাঙলা ভাষা শিক্ষার উপর চিত্রবিদ্যা, সঙ্গীত-বিদ্যা শিক্ষারও ব্যবস্থা হেমেন্দ্রনাথ করেছিলেন তাঁর নিজের ছেলে মেয়েদের। তাঁর এক কন্যা প্রজ্ঞাদেবী 'আমিষ ও নিরামিষ আহার' পুস্তকের ভূমিকায় (বাং ১৩১৯ সালে) লিখেছেন : "শৈশব হইতেই পিতৃদেব আমাদের যেমন লেখাপড়া, গান-বাজনা শিক্ষা দিতেন সেইরূপ তিনি পাককার্য্যেও আমাদিগকে (মেয়েদের) সুদক্ষ করতে যত্নবান ছিলেন; তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় ছিল এই যে ভবিষ্যতে তাঁহার পুত্রকন্যারা এ দোষ দিতে পারবেন না যে তিনি কোন বিষয়ে তাহাদিগকে শিক্ষা দেন নাই বা শিক্ষা দিতে অবহেলা করিয়াছেন।" প্রজ্ঞাদেবীর (প্রজ্ঞামাসীর) মনীষা তাঁর উক্ত বইখানির ভূমিকা পাঠ করলে বোঝা যায়। বেদ-পুরাণ প্রভৃতিতে দেবপূজা হোম ও যজ্ঞে যে চরু-অন্ন তৈরী হত তার বিষয় থেকে নিয়ে বহু রন্ধন তথ্য তিনি লিখেছেন। পড়লে বিস্মিত হতে হয়। তিনি এবং তাঁর ভাই বোনেরা সবাই পিতার আদর্শ সন্তান। রবিদা শিক্ষাগুরু হিসাবে উপযুক্ত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে পেয়েছিলেন। হেমেন্দ্রের পুত্র হিতেন্দ্র, ক্ষিতীন্দ্র ঋতেন্দ্র আর প্রজ্ঞা, অভিজ্ঞা, মনীষা, শোভনা, সুনৃতা সুষমা এবং সুদক্ষিণা কন্যারা সবাই পণ্ডিত ছিলেন।

সেজদাদা, সোমদাদা এবং রবিদার কয়েকটি ভ্রাতুষ্পুত্র

সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুর [১৮৬০—১৯২৩]। সোমদা হলেন রবিদার ঠিক উপরের ভাই। পড়াশুনার সঙ্গে ছেলেবেলায় ইনি চিত্রকলাও শিক্ষা করেন। তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল শিল্পীদের প্রতি। অল্প বয়সে তাঁর মস্তিষ্কের পীড়া হয় কিন্তু অদম্য উৎসাহ ছিল তাঁর আর্টের উপর। মা'দের কাছে শুনেচি অল্প বয়সে কোনো শিল্পীকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রেস প্রভৃতিতে অত্যাধিক ঘোরাঘুরি করার ফলে তাঁর এইরূপ বিকার ঘটে।

জোড়াসাঁকোর দাদামশাইদের সঙ্গে আরো বলার আছে কয়েকজন মামাদের কথা।

হিতু মামা (হেমেন্দ্রনাথের পুত্র হিতেন্দ্রনাথ) ছিলেন আর্টিষ্ট, তাঁর কথা পূর্বেই বলেচি। তিনি ছেলেবেলায় আমাকে সর্বদা ছবি আঁকাতে উৎসাহ দিতেন। আর উৎসাহ পেতুম সুধীমামার (দ্বিজেন্দ্রনাথের পুত্র সুধীন্দ্রনাথের) কাছে। সুধীমামার কাছে সমাগম হোতো বহু উদীয়মান তরুণ কবি ও সাহিত্যিকরা যাঁরা এখন বেশ নাম করচেন। তাঁর রচনা বহুল ছিল না কিন্তু তাঁর লেখায় মুগ্ধ হয়ে তরুণেরা আসতেন তাঁর কাছে। 'সাধনা' পত্রিকা সুধীমামা মাত্র ২২ বৎসর বয়েসে প্রকাশ করেন এবং তিন বৎসর সম্পাদন করার পর রবিদাদা সেটির সম্পাদনার ভার নিজে নেন। কবি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রকে এই কার্যে উৎসাহিত করেন এবং প্রভূতভাবে সাহায্য করেন। সুধীমামার 'মঞ্জুষা' 'করঙ্ক' 'চিত্রলেখা' 'চিত্রালি' প্রভৃতি গল্পের বই এবং 'দাসী' 'বৈতানিক' 'দোলা' কাব্য বঙ্গ সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

সুধীমামা ওকালতি পাশ করলেও কচিৎ কাছারীতে 'কেস' নিয়ে দাঁড়াতেন। একবার তিনি হুগলী জেলায় জাহানাবাদে (পরে বাবা 'আরামবাগ' নাম দেন গয়ায়ও 'জাহানাবাদ' থাকায়) বাবার কোর্টে একটি 'কেস' নিয়ে দাঁড়ান। বিপক্ষে ছিলেন কৌসলী ব্যারিষ্টার নলিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—আমার ছোট মেশোমহাশয়। সুধীমামাই কেসে জিতে গেলেন। তিনি অল্পকাল (১৮৬৯—১৯২৯) জীবিত থেকেও অযাচিতভাবে বহু লোকের উপকার সাধন করে গেছেন।

সুরেন মামা (সুরেন্দ্রনাথ—সত্যেন্দ্রনাথের পুত্র) আর একজন দেবতুল্য ব্যক্তি—যিনি সর্বস্ব দান করাই জীবনের ব্রত করেছিলেন। শেষ বয়সে নিঃস্ব হয়ে পড়েছিলেন, তবু তাঁর পবিত্র উজ্জল শান্ত স্বভাব কখনো মলিন হয়নি।

তিনি জাপানী গল্পের অনুবাদ ও প্রবন্ধাবলী যা লিখে গেছেন তাতে তাঁর পাণ্ডিত্য ও দেশানুরাগের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি নিজেকে প্রচার করার আদৌ পক্ষপাতি ছিলেন না।

বলু মামা [১৮৭০—১৮৯৯] (বীরেন্দ্রনাথের পুত্র বলেন্দ্রনাথ) আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী 'চরিত্র-কথা' গ্রন্থে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, রজনীকান্ত গুপ্ত প্রভৃতি মনীষীর সঙ্গে বলেন্দ্র নাথের বিষয়ও লিখেচেন। লিখেচেন: "বলেন্দ্রনাথের রচনা ভঙ্গীই আমাকে এ বিষয় আকর্ষণ করিয়াছিল; এমন সযত্নে গাঁথা শব্দের মালা তার পূর্বে আমি দেখি নাই। শুনিয়াছি, বলেন্দ্রের ভাষা তাঁহার সাধনার ফল।" ইনি দেশের প্রাচীন শিল্পের ঔজ্জ্বল্যের বিষয় বঙ্গ সাহিত্যে প্রথম লিখেন। তাঁর 'কোনার্ক' প্রবন্ধের বিষয় সকলেই জানেন। তাঁর এইপ্রকার সুন্দর ভাষার গোড়ায় ছিলেন তাঁর 'রবিকাকা'। রবিদা বলেছিলেন একমাত্র বলুকেই আমি সাহিত্যে গড়ে তোলার প্রয়াস পাই। বলুকে বার বার করে লেখাতুম প্রবন্ধ যতক্ষণ না মনের মত হোতো সেও প্রযত্ন-উৎসাহে লিখে আন্‌তো পুনরায়, কখনো কুণ্ঠিত হতো না তার জন্যে। দুঃখের বিষয় সে চলে গেল।" বলেই রবিদা মৌন হয়ে গেলেন। একবার পুরোনো বাঁধাই "ভারতী ও বালক" পত্রিকায় "বাঙালী কিসে উচ্চস্থান পাবে?" এই মর্মের একটি প্রবন্ধ দেখতে পেলুম। তার শেষে "র-না-ঠা" তিনটি অক্ষর ছাপা আছে। তাতে দূরদর্শিতার পরিচয় ছিল। লেখা ছিল, "বাঙালী অসি ধরে জগৎ জয় করতে পারবে না—করবে মসীর লেখনি দিয়ে; আর তাতে লেখা ছিল: "বন্দেমাতরম্" গান কুমারীকা থেকে হিমালয় পর্যন্ত ধ্বনিত হবে একদিন।" রবিদাকে সেই 'ভারতী ও বালকে'র প্রবন্ধ দেখাতেই তিনি বল্লেন: "এটা আমার লেখা নয়, বলুর—সূচীতে দেখ্।" সূচীতে বলু মামার নাম পেলুম। বলু মামার এই দুটি কথা কতদূর যে সত্য হয়েচে তা সকলেই জানেন। বলু মামা কি তখন জানতেন যে তাঁর রবি কাকাই কলমের জোরে জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করবেন এবং নোবেল প্রাইজ পাবেন?

টালার হাঙ্গামা হয় মুসলমান এবং ইংরাজের মধ্যে একটি মসজিদ ভাঙ্গা নিয়ে। মসজিদটি মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের জমীর উপর ছিল। বলু মামা তাঁর মা'র সঙ্গে একটি আত্মীয়ের বাড়ী ঘরের গাড়ী চড়ে গিয়েছিলেন—বাড়ী ফেরার সময় তাঁরা পথে বিপদে প'ড়লেন। দাঙ্গাহাঙ্গামাকারী লোকেরা

কোচ্ম্যানকে প্রথমে জিজ্ঞাসা করলে "কার গাড়ী ?" সে বলে বসল 'সাহেবের' এই কথা বলা মাত্র অজস্র ধারায় ইট লাঠি গাড়ীর উপরে পড়তে লাগল। কাঁচ ভেঙ্গে গাড়ীর ভিতরও ইট পড়েছিল। বলু মামার কপালে একটি কাঠের টুকরো বিঁধে যায় এবং কিছুদিন পরে তাতেই তিনি অকালে ইহলোক ত্যাগ করেন। [বলু মামার মা 'প্রফুল্লময়ীর স্মৃতি কথা' দ্রষ্টব্য]।

শান্তিনিকেতন আশ্রম এবং আমার বসবাস

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ১৮৬৩-তে ভুবনডাঙার জমি রায়পুরের প্রতাপনারায়ণ সিংহের কাছে কেনেন। তপস্যার যোগ্য নিরালা স্থানটি কিভাবে পান তার কথা এখন কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েচে। ১৮৮৬-এ মহর্ষি একটি ট্রাষ্ট-ডীড করেন। এই ট্রাষ্ট-ডিডেই মহর্ষি শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মবিদ্যালয় ও পুস্তকালয় স্থাপন এবং অথিতি সৎকারের উল্লেখ করেছিলেন। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র মহাকবি রবীন্দ্রনাথ পিতার সে ইচ্ছা পুরণ করেন প্রথমে ব্রহ্মচর্যবিদ্যালয় স্থাপনার দ্বারা এবং পরে ১৯১৯-এ বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করে।

মহর্ষি এই পবিত্র স্থান কিভাবে আবিষ্কার করেন তার বিষয় যা' শুনেচি তাই লিখচি। লর্ড সিংহের বাড়ী রায়পুরে, বোলপুরের নিকটবর্তী স্থানে। প্রতাপনারায়ণ সিংহের সঙ্গে মহর্ষির সৌহার্দ ছিল। নিমন্ত্রিত হয়ে বোলপুর ষ্টেশন থেকে পাল্কি চড়ে যাচ্চিলেন রায়পুরে। পথে ভুবনডাঙার কূর্ম-পৃষ্ঠ ভূমির কাছে যখন গেছেন তখন সন্ধ্যা হয়েচে। ধূ ধূ করচে তরঙ্গায়িত বিস্তারিত মাঠ—একটি শালবনের পশ্চিম প্রান্তে ছাতিম গাছের তলায় পাল্কি নামাতে বল্লেন উপাসনা করবেন মহর্ষি। তিনি যখন ছাতিমগাছের তলায় অস্তগামী সূর্যের দিকে মুখ রেখে আসন বিছিয়ে উপাসনায় বসেচেন, অমনি ডাকাতের দল এসে আক্রমণ করলে। পাল্কিবেহারার এবং অন্যান্য বরকন্দাজ লোকজন ভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে মহর্ষিকে ফেলে পালাল। ধ্যানমগ্ন অবস্থায় ডাকাতেরা মহর্ষিকে দেখে তাঁর প্রতীক্ষায় বসে রইল। অস্তগামী সূর্যের রক্তাভায় রঞ্জিত হয়ে তাঁর তখন যে অনুপম রূপজ্যোতি ফুটে উঠেছিল, দেখে ডাকাতদের মন দ্রবীভূত হল। মহর্ষির ধ্যান ভাঙলে তাদের দেখে বল্লেন "আমি এই স্থানটিতে প্রাণের আরাম—আত্মার শান্তি এবং মনের আনন্দ পেয়েছি। তোমরা বল এখন কি চাও ?" ডাকাতের সর্দার শুনে বল্লে, "হুজুর আপনার সেবা করতে চাই—আপনি এখানেই এসে থাকুন।" এই সর্দার শেষে আশ্রমের পাহারায় নিযুক্ত ছিল।

আমরা তাকে দেখেচি। সে বোলতো রণ্‌পা-তে (tilt-এ) এক রাত্রে সে ৪৬ মাইল গিয়ে ফিরে এসেচে।

পূর্বেই বলেচি ১৯০৫-এ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের তিরোধানের কিছু পূর্বে তাঁর জীবিত কালেই ১৯০১-এ রবিদাদা ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপনা করেছিলেন। শান্তি-নিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে বাবা আমার ছোট ভাইদের (জ্যোতির্ময়, দীপ্তিময়, পরিতোষ এবং শুকদেবকে) পাঠিয়েছিলেন রবিদার নিকট। পরিতোষ খুব ভাল গান গাইত রবিদা তাই ওকে খুব ভালবাসতেন। আমি প্রায় গরমের ছুটি এবং বড়দিনের ছুটিতে যেতুম আশ্রমে রবিদার কাছে। কখনো কখনো নিচু বাঙলায় দিনুদা এবং তাঁর মা'র (বড় মামী) কাছেও থাকতুম। বড় মামী আমাকে খুব স্নেহ করতেন দিনুদার এবং কমল বোঠানের ত কথাই নাই। নীচু বাঙলায় বড়দাদা মহাশয় আমার আর এক আকর্ষণ ছিলেন।

পূজনীয় রবিদাদার ভাইবোনদের নিয়ে পঞ্চাশ উর্দ্ধে তখন নাতি নাতনী ছিল তাঁর। তার মধ্যে আমাকেই বিশেষভাবে নির্বাচন করে কিভাবে টেনেনিলেন তার কথা বলি। অবশ্য তাঁর সেই স্নেহের যোগ্য হতে পেরেছি কিনা আজও সন্দেহ হয়। তবে একটা কথা, ভাগ্য-নিয়ন্তা রবিতীর্থে কবিগুরুর নিকট বারো বৎসর গুরুগৃহে বাস ও শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। কেননা বহু পূর্বেই তার সূচনা হয় যখন আমি আর্ট স্কুলে শিখি। ১৯১১ সালে ১৬ আগষ্টে আমার আর্টস্কুল ছাড়ার পর ভবিষ্যৎ বিষয় বিচার করে আমার ছোট কাকা (নির্মলচন্দ্র হালদার *) লেখেন :

স্নেহের অসিত,—আমি তো দেখচি তোর তিনটি পন্থা রয়েচে। (১) কলি-কাতায় ৪০৲।৫০৲ টাকার মাহিনায় drawing মাষ্টারী, (২) রবিবাবুর কাছে গিয়ে থাকা ; (৩) বিলাত যাওয়া।

প্রথমটা সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে তোর দ্বারা স্কুল মাষ্টারী এখনও হবে না। তোর ছেলে শেখাবার একটা gift নেই ; তবে বয়েসকালে গুরুমশাই হতে পারিস্। তবে যদি জোর করে তুই হোস্, তাহলে তোর কাজটা অপ্রিয় হবে আর তোর ছবি আঁকার বিশেষ ব্যাঘাত হবে। তুই ভেবে দেখ্,—১০ হ'তে

---

* ইনি Coopers Hill Imperial Engineering College লণ্ডন থেকে পাশ করেন। ৩৯ বৎসর বয়সে Railway Board-এর Secretary হন এবং ঐ বয়সেই ১৯১৮ war Influenzaয় মারা যান।

১৪ পর্যন্ত বাপে তাড়ানো একদল ছেলেদের সঙ্গে খ্যাচামিচি করে বাড়ী এসে art-এর inspiration কি কিছু থাকবে? তুই যদি সে অবস্থায় ঈশ্বরীবাবুর মত দু'একটা ভাল copy করতে পারিস্ তাহলে যথেষ্ট হবে। তোর দ্বারা original কাজ কিছু হওয়া একেবারে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। তারই মানে হচ্চে যে তোর artকে বিসর্জ্জন দিয়ে যদি তুই ৪০।৫০ টাকায় সুখে স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করতে চাস্ তো কর।

দ্বিতীয় প্রস্তাবটা একটু ভাল করে গবেষণা করে দেখতে হবে। ওর মন্দের মধ্যে হচ্চে এই যে তোর একটা পাকা সংস্থান হচ্চে না। এছাড়া এর বিরুদ্ধে আর কিছুই বলার নেই। তবে এইটাই একটা মস্ত ব্যাঘাত। রবিবাবুর সংস্রবে তোর একটা এজীবনের মস্ত উপকার হবে সে বিষয় সন্দেহ নেই। তাতে তোর আধ্যাত্মিক জীবনে উপকারটা বাদ দিলেও তোর art-এর বিশেষ উপকার হবেই হবে। তুই এখন নেহাৎ রামা-শামার মত আমাদের হিন্দুত্বের আর জাতীয়ত্বের সম্বন্ধে একটু একটু জানিস, সেটা না-জানারই মধ্যে। রবিবাবুর কাছে তুই এ-সব বিষয় যা' শিখবি তা' এ-ভারতে অতুলনীয়। তিনি হলেন একটা মস্ত artist, আর সেইজন্যে তোর art-এর তারেতে তিনি যা বাজাবেন এতে আমার বিশ্বাস যে অতি সুন্দর ফল হবে। আর এই ফলেতে আমাদের দেশের অভাবনীয় উপকার সাধন হবে। পরে এর আর্থিক ফল যে ভাল হবে সে-বিষয় তো কোনো সন্দেহই নেই। তবে তোকে সেটা না-ভেবে আর না দেখে চলতে হবে; তার মানে হচ্চে যে তোর জীবনটাকে তোর art-এর জন্যে উৎসর্গ করতে হবে। এর উপর ব্যবসাদারী কথা হচ্ছে যে, যেমন করেই হোক না কেন, তোর art-এর উন্নতি আর সেইজন্যে তোর ছবির মূল্য বেড়ে যাবে এবিষয় আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। এ-রকম সুবিধে মানুষের কম ঘটে। আর যদি তুই তোর মনটাকে এখন থেকে চিরকালের জন্যে এই ব্রতে দৃঢ় করতে পারিস্, তাহলে আমার উপদেশ এই যে তাই কর।

তৃতীয় সম্বন্ধে দুটি কথা আছে। এক টাকা, দ্বিতীয় তোর art-এর উপর ফলাফল। art-এর ফলাফলের সম্বন্ধে তোর গুরু অবনমামার কথা, শেষ কথা; তার উপর আর কিছু বলা চলে না।...তাহলে মোট দাঁড়াচ্ছে এই যে তোকে নিজেকে গবেষণা করে ঠিক করতে হবে যে তুই কোন্ পথটা নিবি, সেটা তোর ইচ্ছার উপর নির্ভর করচে। পন্থাটা ঠিক করে দেবার অধিকার

কারুর নেই—সেটা তোকেই করতে হবে। আমি এই চিঠিতে খালি ভালমন্দর গবেষণা করলুম। তুই দাদাকে চিঠি পড়ে শোনাস। আর বৌদি যাতে বুঝতে পারেন তাই বাঙলায় লিখলুম। তোরা আমার আশীর্বাদ নিস।

তোর ছোট কাকা

শ্রীনির্মলচন্দ্র হালদার

আমার অদৃষ্টে রবিদাদা মহাশয়ের কাছে যাওয়াই ঘটল। ১৯১১ সালে কলিকাতা গভর্মেণ্ট আর্টস্কুলে অবনমামার (অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের) অধ্যক্ষতায় শিক্ষা সমাপ্ত করেছি। আর রবিদাদা তখনই আমাকে নিজে থেকে ডেকে নিলেন তাঁর নিকট শান্তিনিকেতনে। জোড়াসাঁকোয় অবনমামার গৃহে আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে তাঁর নিকট প্রস্তাব করলেন: "অসিতকে এবার আমি নিজের কাছে রেখে ওকে দেখতে শেখাবো; দৃষ্টি তৈরী হ'লে ওর 'হাত' যা' তৈরী হয়েছে তোমার কাছে তা' সহজেই কাজ করবে।" আমার সামনে তিনি তখন শান্তিনিকেতনের একটা চমৎকার ছবি ধরলেন—সেখানকার ঋতুপরিবর্ত্তনের মধ্যে বিচিত্র নৈসর্গিক লীলায়,—দিগন্তব্যাপী তরঙ্গায়িত ঊষর মাঠের উপর সকাল-সন্ধ্যা ও মধ্যাহ্নের অপূর্ব ভাব যা নিয়ত আশ্রম পারিপার্শিকে পাওয়া যায় তার বর্ণনার দ্বারা। কবির মুখের কথায় সেগুলি সচেতন হতে পারে অন্যের দ্বারা তা অসম্ভব।

অবশেষে রাঁচিতে পিতামাতা এবং কলকাতায় শিক্ষাগুরু অবনমামার কাছে অনুমতি নিয়ে গেলাম শান্তিনিকেতনে রবিদার সঙ্গে। বোলপুর ষ্টেশন থেকে আশ্রম দেড় মাইল পথ। রবিদার নিজস্ব একটি বিশেষভাবে তৈরী গোজানে চড়লুম তাঁর সঙ্গে। কাঁচা রাস্তা, দুধারে পথে রক্তধূলি আকীর্ণ কাশবন। আশ্রমের কাছাকাছি যখন পৌঁছেছি বাঁধের জলচর পাখিরা এবং তাল ও শাল-তরুশ্রেণী যেন সকলকেই উদারভাবে আহ্বান করচে। রবিদা গোজানে বসে খাতায় গান রচনা করচেন। আশ্রমে প্রবেশ করার মুখেই শিশুদের সমবেত কণ্ঠে বেদগান মুখরিত হল—আর তার পরেই দেখ্‌লাম প্রার্থনারত ছেলেরা মাঠে নানাস্থানে ছড়িয়ে পড়ে আসনে বসে আছে—যেন বালখিল্য মুনির সার দেখচি—দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল।

আশ্রমে এর পূর্বেও বহুবার গেছি বটে কিন্তু এইবার রবিদার সঙ্গে পাকা-পাকিভাবে থাকতে যাবারকালে যেন নতুন বেশে আশ্রম দেখা দিল আমার



প্রাথমিক কালের আশ্রম

চক্ষে। দিমুদার (দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর) কাছে শুনলুম রবিদা নাকি আমার এবার আশ্রমে আসার পূর্বেই আশ্রমের অধ্যাপকমণ্ডলীকে ডেকে বলে দিয়েছিলেন একজন sensetive শিল্পীকে আনচি আশ্রমে, তোমরা ওকে দেখো যাতে ওর মন লাগে।" আমাকে কাছে পেয়ে অবশ্য দিমুদা, রথীমামা, প্রতিমামামী, মীরামাসী, বড়মামী প্রভৃতি সবাই খুব খুসি হলেন। আর কবি নিজে তাঁর আনন্দের ব্যঞ্জনা দিলেন আমাকে বসিয়ে আমার প্রতিকৃতি পেনসিলে এঁকে। দুঃখের বিষয় সেগুলি আমি তাঁর কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে রাখিনি নিজের কাছে। রবিদার আঁকার পরিচয় সেই প্রথম আমি পেলুম।

আশ্রমে পূর্বেই জানাশুনা ছিল ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী, বিধুশেখর শাস্ত্রী, জগদানন্দ রায়, নেপালচন্দ্র রায়, অজিত চক্রবর্ত্তী, জ্ঞান চট্টোপাধ্যায়, কালীমোহন ঘোষ, শরৎচন্দ্র রায় প্রভৃতি গুণী অধ্যাপকদের সঙ্গে। কবি নিজের কাছেই আমাকে স্থান দিলেন এবং আমাকে ভার দিলেন আশ্রম শিশুদের নিয়ে একটি শিল্পকেন্দ্র গড়ে তুল্‌তে। স্কুল কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙ্গিক পাঠ্যের তালিকাভুক্ত ছিল না আর্ট শিক্ষা। রবিদাদা নিজ পুত্র রথীমামাকে নিয়ে যেমন আশ্রম স্থাপনা করেছিলেন আমাকে নিয়েই "কলাভবনের" গোড়াপত্তন করলেন এইভাবে। যে সব শিশুদের ছবি আঁকার সখ ছিল তারাই এল আমার নিকট ছবি আঁকা শিখতে। মুকুল দে তখন পূর্বথেকেই আমার একটি বন্ধু শিল্পী ওঁকারানন্দর কাছে ছবি আঁকা শিখতেন। মুকুল এলেন প্রথমে, তারপর আমার কাছে সঙ্গে সঙ্গে ধীরেন দেববর্মা, মণিভূষণ গুপ্ত, অন্নদা মজুমদার, সন্তোষ মিত্র প্রভৃতি কয়েকটি ছাত্রও এলেন শিখতে। শিল্পগুরু অবনমামা সেই সময় কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতনে আমায় উপদেশ দিয়ে একটি পত্র লেখেন ৮ই জুলাই, ১৯১১ তে :

"প্রিয় অসিত,—বোলপুরে যদি ছোট-খাট একটি gallery ক'রে তুলতে পার তো মন্দ হয় না। আমি এখন ষড়ঙ্গ লিখতে ব্যস্ত আছি সুতরাং আর কোনো বিষয়ে মন দেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়েচে। বোলপুরে শিক্ষা দেওয়ার সম্বন্ধে সব কথা খুলে তোমায় লিখতে সময় নেই, এইটুকু মনে রেখো যে নিজেকে সেখানে গুরুমহাশয়ের জায়গায় বসিয়ে ছেলেদের ভয় খাইয়ে দিওনা—মনে রেখো যে, পাখি পড়াতে হলে পাখির সঙ্গে নিজেও পাখি হতে হয়।"

রবিতীর্থে

গুরুদেবের বাক্য শিরোধার্য ক'রে রবিদাদার কাছে থেকে কলাভবনের গোড়াপত্তন করলুম। আমার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল রবিদার সংসর্গে থেকে মানুষ হবার। তাই 'মাষ্টার মশাই' হইনি আমি সেখানে, 'অসিতদা' বলেই আজো পরিচিত আমার প্রাক্তন ছাত্রদের কাছে। আর্টস্কুলে আমার সহপাঠী যাঁরা ছিলেন অবনমামা সকলের চেয়ে নন্দকেই বেশী স্নেহ করতেন—অন্য সব শিষ্যদের চেয়ে বয়সে তিনি বড় ছিলেন বোলে। আমি রবিদার কাছে আশ্রমে চলে আসায় তাঁর একটি ভার লাঘব হল। অজন্তার চিত্রের সঙ্গে সহপাঠী নন্দই প্রথমে পরিচিত হন। অবনমামা তাঁকে গ্রীফিথ্সের অজন্তার বই দেন। ছবির উপর অভ্র রেখে রঙতুলি দিয়ে তিনি মক্স করেছিলেন; ফলে নন্দলালের তখনকার সকল কাজে অজন্তার ছাপ খুব বেশী ছিল। নন্দকে তখন বহুবার আশ্রমে আহ্বান করেছিলুম। কিন্তু নোবেল প্রাইজ পাবার পূর্বে আর সকলের মত তাঁর দৃষ্টি রবীন্দ্রনাথের প্রতি প'ড়েনি। ৫ই জানুয়ারী, ১৯১৫ তে সচিত্র কার্ডে নন্দলাল প্রথম আমায় আশ্রমে লিখলেন কলকাতা থেকে :

"ভাই অসিত, তোমার শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা ছবিখানি ৫০০৲ বিক্রয় হয়েছে শুনে সুখী হয়েছি। তুমি একটি ছবি লেখবার আস্তানা করচ, বেশ হচ্ছে। তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক। আমি পাড়া গেঁয়ে একটু superstitious তুমি ত জান? যাহাতে কেহ নজর না দেয় সেইজন্য ছেঁড়া জুতো, মুড়ো ঝাঁটা, ভাঙ্গা কুলো (এই তিনটি কর্মধার ও পরম ত্যাগী, ইঁহাদের সত্য ইত্যাদি করে দেবার গুণ বর্তমান আছে) একটি উচ্চ বাঁশে টাঙ্গাইয়া দিবে এবং নমস্কার করে কার্য আরম্ভ করবে, তা' হলে কার্য নির্বিঘ্নে চলবে। ইতি— নন্দ।"

বন্ধুবর সতীর্থ-সুহৃদ নন্দলাল তারপরে কল্পনার চক্ষে আশ্রম কিরূপ দেখচেন তার sketch এঁকে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর কল্পিত আশ্রমে ধানের মরাই এবং আশ্রম-মৃগই ছিল অতিরিক্ত বস্তু; নতুবা শান্তিনিকেতন আশ্রম তখন সত্যই একটি তপোবনের মতই দেখতে ছিল। খোড়োচালা ঘরে বাস এবং তরুতলে অধ্যয়ন এই ছিল তার প্রকৃতি। পাকা দোতালা বাড়ী মহর্ষিদেবের প্রতিষ্ঠিত তাঁর পূর্ব্বের বাসভবন এবং তৎসংলগ্ন উদ্যান-বেষ্টিত কাঁচ ও লোহার তৈরী একটি উপাসনা মন্দির ছিল। তার পশ্চিম উত্তর কোণে মহর্ষিদেবের প্রিয় সাধনার স্থান ছাতিম গাছের তলায় শ্বেতমর্মরের আসন করা আছে। দীপেন্দ্রনাথ এই বেদীর পিঠে "তিনি আমার প্রাণের আরাম,

আত্মার শান্তি এবং মনের আনন্দ" এই কথাটা খোদাই করে লিখে রেখেছিলেন। মহর্ষির প্রথম সেখানে বসে যা' উপলব্ধি হয়েছিল, তার কথা পূর্বে বলেছি। তখন আশ্রমের মন্দিরের উদ্যানে বাপীতটে বহু স্তম্ভে বেদ উপনিষদের উক্তি শ্বেতমর্মরে খোদাই করে লেখা ছিল। একটা ধর্ম শান্তি ও ভক্তির হাওয়া বইত তাতে।

তখন আশ্রমের পরিধি ছিল স্বল্প। শালবীথির তলা দিয়ে একটি পথ এবং তার এক প্রান্তে ভুবনডাঙ্গায় যাবার পথের ধারে ছিল রবিদার ছোট্ট একটি পাকা দোতলা বাড়ী, 'নতুন বাঙলা'। এই নতুন বাঙলার গায়েই মধুমালতীর লতাকুঞ্জের তোরণ। তার একপাশে নতুন বাঙলার ধারে ছোট্ট একটি চালা ঘর—সেখানে থাকতুম আমি। সামনে একটা পুষ্পিত জবাগাছ ছিল, আর তার অন্যদিকে একটি চালা ঘরে থাকতেন উইলি পিয়ার্সন। ভিতরের দিকে কয়েকটি বেশী ঘর ছিল---অতিথি নিবাস সেটি। মাটীর দেয়াল, পাকা মেঝে, খোড়ো চালা—ছাত্রাবাসগুলির নাম ছিল 'শালবীথিগৃহ', 'শরৎ কুঠির', 'মোহিত কুঠির', 'সতীশ কুঠির' এবং দিনুদার (সংগীতাচার্যের) 'বেনুকুঞ্জ' একটি নতুন চালা ঘর তাতে যোগ করা হয়েছিল তখন। লাইব্রেরী গৃহ তখন অর্দ্ধেক পাকা অর্দ্ধেক কাঁচা ইমারৎ। করগেটের ছাদ দেওয়া রান্না ঘরের সামনে Windmill Pump দেওয়া একটি কূপ—স্নানের এবং পানীয় জল তা' থেকেই পেতুম আমরা। একবার বৈশাখী ঝড়ে রান্না ঘরের ছাদ উড়ে যায়। তথাপি আশ্রমের শান্ত ছবি তখনকার যাঁরা দেখেছেন কখনো ভুলবেন না।

রবিদার দৈনিক কার্যসূচী ছিল অদ্ভুত। যখন মসীলিপ্ত আদিত্য রজনী ভেদ করে অরুণাভা দেবার উপক্রম করছেন সেই ব্রাহ্মমুহূর্তে রবিদা উঠ্‌তেন এবং পূর্বদিকের জানালা খুলে পদ্মাসনে বসে উপাসনা করতেন। উপাসনান্তে কখনো কখনো নতুন গীত রচনা করে গাইতেন, কখনো বা পুরোনো ধর্ম সংগীত তাঁর রচিত গাইতেন। তখন তাঁর ধ্যানস্নিগ্ধ সৌম্যোজ্জ্বল কান্তির উপর নবারুণরাগ-রঞ্জিত হয়ে যে অপূর্ব শ্রী ধারণ করতো তা' যিনি না দেখেছেন বর্ণনার দ্বারা বোঝানো দুরূহ। রুদ্রের প্রসন্ন মুখ লাভ করে তাঁর অন্তরের মহাপুরুষ তখন জাগ্রত হয়ে উঠ্‌তেন উজ্জ্বল মাধুর্য মণ্ডিত হয়ে! সেই ভোর চারটে থেকে কী শীত, কী গ্রীষ্ম তাঁর প্রতিদিনের কর্ম-জীবন আরম্ভ হোতো।

তারপর স্নান, প্রাতঃকৃত্য সমাধা করে চায়ের টেবিলে বসতেন। রথীমামা প্রতিমামামী, মীরামাসী, নগেনমেশো এবং আমি যোগ দিতুম তাঁর সঙ্গে। চায়ের টেবিলেই বহু বিষয় আলোচনা করতেন—একই ভাষায় আমরাও কথা বলতুম তাঁর সঙ্গে বটে কিন্তু বাণীর বরপুত্রের শ্রীমুখে যা' শুনতুম তা শুধু ভাষা নয় তা অনুধাবনের বস্তু।

এর পরে পৌঁছতেন আশ্রমের অধ্যাপকেরা এবং ছাত্ররা তাঁর নিকট নানা বিষয় প্রশ্ন নিয়ে। শিশুবিভাগের ছাত্ররা প্রবন্ধ, কবিতা প্রভৃতি রচনা আনতো দেখাতে তাঁকে। দেখে তিনি কখনো বিরক্ত হতেন না—তাঁর নিজের শতকাজের মধ্যে। হয়তো কোনো ছেলে চড়ুইভাতি কোরে তার বর্ণনা লিখে এনেছে—তিনি পড়ে হেসে তাকে বল্লেন, "তুই কতবার কি খেয়েছিস তার কথাই তো লিখে ভরিয়েছিস খাতা—কি দেখ্‌লি সেখানে তা'তো বল্‌লি না? যা' আবার ভেবে-চিন্তে ভাল করে লিখে আমায় দেখাস্‌।" এইভাবে শিশুদের নিরুৎসাহ না করে—ভুল দেখিয়ে দিতেন; তাড়া দিয়ে মাষ্টারী করতেন না। এরপর প্রাতে ৯টা থেকে তাঁর নিজের রচনার বন্যা ছুটতো লেখনীর ডগায়। তাঁর স্বকীয় উজ্জ্বল মুক্তার মত অক্ষরগুলি রচনার হিরকখণ্ড বর্ষণ করতে করতে ভাবও ভাষায় উদ্ভাসিত করে চলতো। এইভাবে তাঁর কাছে থেকে তাঁকে লিখতে দেখেছি অন্যান্য বহু রচনা ছাড়া গীতালি, গীতিমাল্য, বলাকা, অচলআয়তন, রক্তকরবী প্রভৃতি বহু কাব্য নাটক। তিনি বাল্যকাল থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যা' লিখে গেছেন, যদি তাঁর মত দীর্ঘ জীবন লাভ করে কেহ তার নকল করতে যান তো শেষ করতে পারবেন না।

দুপুরে মধ্যাহ্ন-ভোজন কালেও তাঁর নিকট বহু বাণী শুনতুম আমরা আত্মীয়রা। কখনো লিখতে বা কথা বলতে তাঁকে ক্লান্ত হতে দেখিনি। দুপুরে খাবার পর আধঘণ্টা বিশ্রাম করতেন আর তারপরই দেশ বিদেশের চিঠিপত্র, খবরের কাগজ—বইপত্র ডাকের সব দেখতেন।

১৯১২ পর্যন্ত যা সব ডাক আসতো তার মধ্যে বহু চিঠি এবং কখনো কখনো ছাপা চটি বইও আসতো যাতে বহু প্রকারের বাঙলা দেশের লোকে তাঁকে গালিগালাজ দিয়ে লিখতো। তাদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের তকমাধারীও ছিলেন। কবি অপরিচিত হাতের লেখা চিঠিপত্র দেখেই বুঝে যেতেন এবং আমায় বলতেন "যা নিয়ে যা ভাল ভাল literature পড়্‌গে।" সেগুলি

নগেনমেশো, রথীমামা ও আমরা যখন খুলতুম তাতে এমন অপদার্থ জিনিস কবির বিরুদ্ধে লেখা থাকতো যে কারু নিকট পড়ে শোনাবার যোগ্য নয়। সেগুলির আমরা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করতুম অগ্নিগর্ভে।

বাঙালী নামাই পরনিন্দা চর্চ্চা প্রিয়। তাই তখনকার বহু পত্রিকায় রবিদাকে নিন্দা করে লেখার দ্বারাই সম্পাদকদের কাগজ চলতো। রবিদা গ্রাহ্য করতেন না—বলতেন, "ওতেই যদি ওদের পেট ভ'রে, তবে আমি কেন প্রতিবাদ করে ওদের অন্ন সংস্থানের অসুবিধা করি।" (এ বিষয় আরো বিপিনবিহারী গুপ্ত এবং ঔপন্যাসীক প্রভাত মুখোপাধ্যায়কে কবি যা বলেছিলেন 'গল্পভারতী'তে ১০ম বর্ষ বৈশাখ, ১৩৬২ সংখ্যায় বেরিয়েছে ইন্দ্রসেনের "রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ" প্রবন্ধে)।

রবিদার সান্ধ্যভ্রমণ কালে আশ্রমে প্রত্যহ একটী কাজ ছিল শিশু-বিভাগে ছেলেদের গল্প শোনানো। আমিও থাকতুম তাঁর সঙ্গে। এর কথা পূর্বেই বলেচি। সব সময়ই তাঁর প্রতিভার ও ব্যাক্তিত্বের প্রভাবে আশ্রমটি উজ্জ্বল শ্রী-ধারণ করে থাকত। আর রজনাতে বৈতালিক গানের দলের সঙ্গীত থেমে গেলে আশ্রম শান্তির একটি প্রসাদগুণে ভরে যেতো—শালপাতা খসার শব্দটি পর্যন্ত তখন নিস্তব্ধতার মধ্যে রম্য ভাব এনে দিত।

প্রতি বুধবারে প্রাতে রবিদা আশ্রমের মন্দিরে উপাসনা করতেন। এই লোহা এবং কাঁচের মন্দিরের কথা পূর্বেই বলেচি। ব্রাহ্ম মুহূর্তে উঠে শুচি-স্নাত গরদের বসনে ঋষি-কবি যখন স্বহস্তে ঘণ্টাধ্বনি করতেন তখন তাঁর সৌম্যভাব বিশেষ দর্শনায় ছিল। আশ্রমের শিশুরা হলদে রঙের আলখাল্লা পরে মন্দিরের ভিতর এবং স্থান সংকুলান না হলে বাইরের সিঁড়ির চারপাশে শান্ত হয়ে এসে বসতো। গ্রন্থাগারাধ্যক্ষ প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের ছোট ভাই শ্রীমান সুহৃৎ মুখোপাধ্যায় রবিদার দেশনাগুলি লিখে নিতেন; 'শান্তিনিকেতন' নামে সেগুলি ছোট ছোট বই আকারে পরে প্রকাশিত হয়েছিল।

প্রথম যখন কাঁচের উপাসনা-মন্দির আশ্রমে স্থাপিত হয় তখন আশ্রমের লোকসংখ্যা খুবই অল্প। নিকটবর্তী ভুবনডাঙ্গা গ্রাম থেকে একটি স্বভাব-কবি আসতেন, নানাবিধ গান রচনা করে গেয়ে পয়সা রোজগার করতেন। পয়সার বদলে সিদেও নিতেন। একবার আশ্রমের মন্দিরে উপাসনা কালে জুতো

চুরি যায়।' গ্রাম্য কবি সেই ঘটনা অবলম্বন করে একটি গান শুনিয়েছিলেন। দিনুদার সেই গানটি মনে ছিল। আমার যতদূর মনে আছে তাই লিখচি :

"ও ভাই ঋষি তুল্য দেবেন ঠাকুর
রচ্‌লো শান্তিনিকেতন।
ভুবনডাঙ্গার মাঠেরে ভাই
এ যে অমূল্য রতন॥
* * *
কাঁচ বসানো মন্দিরে ভাই
ভজন পূজন করে।
জুতোগুলো রাখে তুলে
বাইরে কাঠের ঘরে॥
দৈবে ও ভাই একি হল
এ কার বাহাদুরী।
দেবদানবের ঠাঁই থেকে যান
বাবুদের জুতো চুরি॥"

এইখানে নোবেল প্রাইজ পাবার পূর্বে দেশের লোকের কবির প্রতি ঔদাসিন্যের একটি চাক্ষুষ উদাহরণ দিই। সেবার আমি আমার ছোট ভাইয়েদের দেখবার জন্যে আশ্রমে গেছি রবিদাদার কাছে। ভাইয়েরা আশ্রমে পড়তো। তখন আশ্রম থেকে ফুটবল খেলার দল ম্যাচ খেল্‌তে যাচ্ছে বীরভূমে। ক্ষিতি-মোহনবাবু, কালীমোহনবাবু আমাকেও নিলেন তাঁদের দলে। ম্যাচ খেলার পর শ্রান্ত খেলোয়াড় ছাত্রদের নিয়ে আমরা গেলাম পাশেই এক মুনসেফবাবুর বাড়ী। মুনসেফবাবু রূপো বাঁধানো একটি খেলো হুঁকো হাতে একগাল দাড়ি নিয়ে বেরিয়ে এলেন আমাদের অভ্যর্থনা করতে। প্রশ্ন করলেন : "আপনারা কি ভুবনডাঙার রবিলোচনবাবুর স্কুল থেকে এখানে খেলতে এসেচেন? আহা কি চমৎকার তাঁর লেখা 'হাস্য কৌতুক' আর 'ব্যঙ্গ কৌতুক' বই দুখানি—" বলে স্মিতবদনে আমাদের শুধু জল নয় জলযোগের পুরো ব্যবস্থা করে দিলেন।

তখনকার শিক্ষিত সমাজে বাঙলা পড়ার রেওয়াজ ছিল না। মেয়েরাই বাঙলা পড়তো। ইংরাজী সাহিত্যকেই একমাত্র সভ্য সাহিত্য বলে জ্ঞান করতেন তাঁরা। এখন আবার দেখচি অক্সফোর্ড থেকে ডক্টরেট করে "ভগবান

'রেলিঙে পা তুলে সিগারেট খাচ্চেন" ইত্যাদি উদ্ভট কবিতা মডার্ণ ইংরাজী কবিদের কায়দায় চালাবার চেষ্টা করচেন অনেকে। তাঁরা এজরা পাউণ্ড বা ইলিয়ট হবেন। স্বরাজ হল কিন্তু য়ুরোপের গোলামী গেল না কৃষ্টির ক্ষেত্রে। রবীন্দ্রনাথের আদর্শ তাঁদের নিকট তুচ্ছ—কেননা আসলে সে standard-এ পৌছনো তাঁদের পক্ষে অসাধ্য ব্যাপার। এক কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তই তা' পেরেছিলেন। রবীন্দ্র যুগের পুরোনো আরো কয়েকজন বাঙালী কবি ছাড়া আধুনিককালে স্থায়ী সাহিত্য (বিশেষ কাব্য জগতে) নেই বল্লেই হয়।

নোবেল প্রাইজ

১৯১১ সালে উলিয়াম রোদেনষ্টাইন এলেন কলকাতায় লণ্ডন থেকে তাঁর বন্ধু জাস্‌টিস্ ষ্টিফেন্সের কাছে। উদ্দেশ্য ছিল তাঁর Indian Art-এর Renaissance যজ্ঞের পুরোহিত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং অবনীন্দ্র নাথের শিষ্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় করার। রোদেনষ্টাইন ইংলণ্ডের খুবই নামজাদা চিত্রকর। তখন ভারতবর্ষে বাঙলাদেশের কবি রবীন্দ্রনাথের পরিচয় যেমন কম লোকেই জানতেন, তেমনি য়ুরোপে তাঁর বিষয় জানতেন এমন কোনো য়ুরোপীয় কমই ছিলেন। অবনীন্দ্রনাথের শিল্পে নবজাগরনীর (Renaissanceএর) বিষয় য়ুরোপে তখন শিল্পী, ক্রিটিক এবং ঐতিহাসিকেরা জেনেছিলেন কুমারস্বামীর "Selected Examples of Indian Art" (১৯১০) এবং হ্যাভেলের Indian Sculpture and Painting (১৯০৮) বই দুখানির প্রচারের দ্বারা (তার কিছুকাল পরে ১৯১৩-তে Vincent A. Smith-এর History of Art in India and Ceylon গ্রন্থেও অবনীন্দ্রনাথ এবং তাঁর শিষ্যদের Renaissanceর বিষয় বেরিয়েছিল)। এর পূর্বে ভারতের Fine Art (চারুকলা) প্রত্নতাত্ত্বিকদের Archaeologistsদের) আলোচনার বিষয় মাত্র ছিল।

উইলিয়াম রোদেনষ্টাইনের ছেলেবেলা থেকে ভারতবর্ষের উপর অনুরাগ ছিল একথা তাঁর বন্ধু জাস্‌টিস্ ষ্টিফেন্সের কাছেই শুনেছিলাম। আমার উপর অবনমামা ভার দিয়েছিলেন নবাগত রোদেনষ্টাইনকে দেখাশুনা করতে। রোদেনষ্টাইন আমাদের দেশের লোকের ধুতি চাদর পরা দেখে খুব মুগ্ধ হয়েছিলেন—রোমান 'টোগার' সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। গড়ের মাঠে গাড়ী থামিয়ে গাছতলায় শায়িত ঝাঁকামুটের ঘুমন্ত ছবি তিনি sketch করেছিলেন।

আমাদের সবাইকার পেন্‌সিলে প্রতিকৃতি এঁকে ছিলেন, আমিও তাঁর প্রতিকৃতি এঁকে ছিলুম এবং তাঁর নামে একটি প্রবন্ধ লিখে ভারতীতে (চৈত্র, ১৩১৭ সংখ্যায়) দিয়েছিলুম।

রবিদাদার সঙ্গে তাঁর অবনমামার বাড়ীতেই প্রথম পরিচয় হল। রোদেন-ষ্টাইন রবিদার পাগড়ি বাঁধা এক প্রতিকৃতি গোড়ায় আঁকলেন। কেননা য়ুরোপীয়দের ধারণা ভারতবাসী মাত্রই পাগড়ি বাঁধে। তারপর অন্য কয়েকটা প্রতিকৃতি বিনা পাগড়িতে তিনি sketch করলেন। রোদেনষ্টাইনের আগ্রহ হল কবির কাব্যর অনুবাদ পড়ার জন্য। তারপর রবিদাদা তাঁকে শোনাবার জন্যে "গীতাঞ্জলি" থেকে কতকগুলি গানের ইংরাজি গদ্য-ছন্দে অনুবাদ করলেন (অনুবাদ হল না, হল নতুন রচনা সেগুলিও)। রোদেনষ্টাইন বিমোহিত হলেন এবং আরো অনুবাদ করতে উৎসাহ দিলেন।

তারই ফলে অবনীন্দ্রনাথের অনুরাগী বন্ধুদের স্থাপিত লণ্ডনের India Society-র তরফ থেকে প্রথম প্রকাশনা বার হল কবির ইংরাজী "গীতাঞ্জলি" W. B. Yeats-এর ভূমিকা সম্বলিত হয়ে। ১৯১০ সালে India Society স্থাপিত হয় Indian Art-এর চর্চা ও প্রচারের জন্য। ১৯১২-তে এই 'গীতাঞ্জলি' প্রকাশিত হয়। তার অব্যবহিত পরে কবি নিজে বিলাতে যান এবং ১৯১৩, ১৩ই নভেম্বরে নোবেল পুরস্কার পান, তার বিষয় সকলেই বিদিত আছেন। কবি Yeats ইংরাজী গীতাঞ্জলির ভূমিকায় লিখেছিলেন :

"We write long books where no page perhaps has any quality to make writing a pleasure......while Mr. Tagore, like the Indian civilization itself, has been content to discover the soul and surrender himself to its spontaneity."

এখানে একটা মজার ঘটনা বলি। রবিদা যদিও ছেলেবেলায় লণ্ডনের পাবলিক স্কুলে পড়েছিলেন এবং সংস্কৃত, বাঙলা ছাড়াও বহু ইংরাজী সাহিত্য চর্চা করতেন অল্প বয়স থেকে, তথাপি শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক অজিত চক্রবর্তীকে তাঁর ইংরাজিতে লেখা চিঠিপত্র দেখতে দিতেন। অজিতবাবুর তাই ধারণা ছিল কবির ইংরাজী "গীতাঞ্জলির" পাণ্ডুলিপি নিশ্চয় Rothenstein বা কবি Yeats-রা দেখে দিয়েছেন। শান্তিনিকেতনে প্রত্যহ প্রাতে দিনুদার চায়ের মজলিস বসতো এবং আশ্রমের অধ্যাপকরা সেখানে সমবেত হতেন। বিলাত থেকে রবিদার চিঠি এল রথীমামার কাছে। রবিদাদার সঙ্গে বিলাতে তখন ডাক্তার

দ্বিজেন মৈত্র মশাই ছিলেন, তাঁর শরীর ভাল ছিল না—চিকিৎসা করানো হচ্ছিল বোলে। রথীমামাকে লেখা চিঠিতে রবিদা লিখেছিলেন কবি Yeats রোদেন-ষ্টাইনকে অনুরোধ করেচেন ছাপার সময় কবির নিজের ইংরাজী ভাষার যেন কোনো অদলবদল না করা হয়—কেন না তিনি মনে করেন যে তাতে king's English-এরই অবমাননা করা হবে ইত্যাদি। চিঠিখানি অধ্যাপকমণ্ডলীর মাঝে বোসে অজিতবাবু শুনে যে কি তখন তাঁর অবস্থা হয়েছিল তা' সহজেই অনুমেয়।

রবিদা ইংরাজী বা বাঙলা লেখাতে কখনো ফাঁকি দিতেন না। স্বর্ণকারের অলংকার রচনার মত নিখুঁত হোত। একদিন দেখি জোড়াসাঁকোর তেতলার ঘরে ডেস্কে বসে একটা চিঠি লিখছেন আর বারবার ছিঁড়ছেন। জিজ্ঞাসা করায় আমায় বল্লেন, 'কেন জানিনা লাগ্‌সই ইংরাজী আসচে নারে—একটি ইংরাজ বন্ধুকে চিঠি লিখতে হবে।" রবিদাদাকে তখন আমি একটি গল্প শোনালুম। এক অবসরপ্রাপ্ত বাঙালী জজ সাহেবের কাছে তাঁর পুরাতন চাপরাশী এসেছে তাঁর কাছ থেকে certificate নেবার জন্যে। জজসাহেব তখন তাঁর ছেলেকে ডেকে বল্লেন, "ওরে—আমার প্যাণ্ট কোট আর টাই দিতে বল্‌তো ?" ছেলে জিজ্ঞাসা করলেন "কেন বাবা, কোথায় বেরুবেন নাকি ?" জজ বল্লেন, "নারে একটা ইংরাজীতে certificate দিতে হবে, ইংরাজী পোষাকে ইংরাজী আসবে ভাল।" রবিদা শুনে হাসলেন এবং বল্লেন, "আমি কান তৈরী করেছি, grammer প'ড়ে ইংরাজী শিখিনি ভুল হলেই আমার কানে ঠেকে।"

'গল্পভারতী'তে (১০ম বর্ষ বৈশাখ, ১৩৬২) সম্প্রতি পড়লুম রবিদার সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথের নাতি ক্ষেমেন্দ্র লিখেছেন :

"তাঁহার (রবীন্দ্রনাথের) সাহিত্য সাধনা যে কিরূপ কঠোর ছিল তাহা একটি সামান্য ঘটনা হইতেই বুঝা যাইবে। তখনো রবীন্দ্রনাথ 'রবীন্দ্রনাথ' হন নাই। কিন্তু বহু সাহিত্যিকের মধ্যে অন্যতম এবং একজন সামান্য সাহিত্য চর্চাকারী ছিলেন।...সেই সময় পিতৃদেব (ক্ষিতিন্দ্রনাথ ঠাকুর) তাঁহার লিখিবার জায়গায় দেখেন যে একই রচনার বহু নকল আছে। কৌতূহলী হইয়া পিতৃদেব গুনিয়া দেখেন ৪০টি নকল। আশ্চর্যান্বিত হইয়া তিনি রবীন্দ্রনাথকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে রবীন্দ্রনাথ বলেন যে তিনি একটি স্থানে মনোমত শব্দ পাইতেছেন না বলিয়া ৪০ বার লিখিয়াছেন এবং সেই স্থানটি দেখাইয়া বলেন যে মনোমত শব্দটি না পাওয়া পর্যন্ত হয়তো আরো বহুবার নকল করিতে হইবে।"

কবির কবিতার খাতায় কাটাকুটির অন্ত ছিল না এবং প্রেসের লোকেরা হাড়ে হাড়ে টের পেত যখন তাঁর বই ছাপা হোতো। কখন কখন শেষ পর্যন্ত নতুন বিষয় জুড়ে দিতেন ছাপার কালে।

ওকাকুরা এবং কবি সংবর্ধনা

১৯১২ শীতকালে এলেন জাপানের বিখ্যাত কাউণ্ট ওকাকুরা। ভগ্নী নিবেদিতা এবং সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে তিনি পূর্বেই পরিচিত ছিলেন; সুরেনমামার অতিথি হয়ে কলকাতায় এলেন। তাঁরও উদ্দেশ্য ছিল অবনীন্দ্রনাথের নবীন শিল্পকলার যজ্ঞে যে সব শিল্পী আছেন তাঁদের সঙ্গে পরিচিত হবার। রোদেনষ্টাইনের মতই তাঁর ভারতশিল্পের প্রতি বিশেষ অনুরাগ ছিল। আমি ছিলুম তখন রাঁচিতে বড়দিনের ছুটিতে—মুকুলকে অবনমামা শান্তিনিকেতন থেকে সেই সময় একটি চিঠি দিয়ে পাঠালেন যদিও তিনি আশ্রমে আমার কাছেই তখন শিখছিলেন। চিঠিতে ছিল—

"প্রিয় অসিত,—মুকুলকে রাঁচি ফিরে পাঠালুম, কেন না সে সেখানে থাকিয়া লেখাপড়াও করিতে পারে এবং তোমার কাছে যতটা পারে চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করিবে। মুকুলের বেশ হাত আছে। তুমি ইহাকে একটু বেশ যত্ন করিয়া শিখাইবে এবং নিজের ছাত্রের মত দেখিবে। তোমরা এক একটা কাজের ভার না লইলে আমি একলা কত পারিয়া উঠিব। ইতি—শুভাকাঙ্খী শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।"

ওকাকুরাকে নিয়ে রাঁচিতে সুরেনমামা (সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর) যখন আমাদের বাড়ীতে সকালে এলেন, তখন মুকুল আমার কাছে। বাবা আমাদের বল্লেন, 'তোমাদের যা ভাল কাজ সেইগুলো দেখাও।' আমি আশ্চর্য হয়ে গেলুম আমার একটি ছবি (বৈষ্ণব বিষয় নিয়ে আঁকা) ওকাকুরা দেখেই বল্লেন, একটি আরো figure দরকার composition হিসাবে। আমি ঠিক যেখান থেকে একটি figure এঁকে আবার পুনরায় মুঁছে ফেলেছিলুম ঠিক সেইস্থান নির্দেশ করে দেখালেন।

তিনি আমাদের সে সময় (১) দেশের ঐতিহ্য, (২) প্রাকৃতিক সৌন্দর্য (৩) এবং মৌলিকতার বিষয় ভালকরে বুঝিয়ে দিলেন। Composition সম্বন্ধে দেশলাইয়ের কাঠি সাজিয়ে যে উপদেশ আমাদের দিলেন তা আমাদের সমস্ত

জীবন কাজ দিয়েচে। নন্দলালকে তিনি রাঁচিতে আসার পূর্বে কলকাতায় সে সব উপদেশ দিয়েছিলেন তিনি আমাকে রাঁচিতে সব লিখে পাঠিয়েছিলেন, আমিও তার পরিবর্তে আমি যা শুনেছি তাঁকে জানিয়ে ছিলাম পত্রে। ওকাকুরা যাবার কালে বলেছিলেন আবার যখন ভারতবর্ষে আস্‌বেন তখন আমাকে জাপানে নিয়ে যাবেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় তিনি জাপান হয়ে Boston Museum এর Oriental Section সাজাবার জন্য আমেরিকা যাত্রার পরেই স্বর্গত হন।

রবিদা এবং অবনীমামার সংসর্গে এসে পৃথিবীখ্যাত এইসব শিল্পী ও শিল্প-রসিকদের দর্শন লাভ করতে পেরেছিলুম। তাতে আমরা কতটা যে লাভবান হয়েছি সেকথা ভাবলেও আনন্দ হয়। মহাকবি রবীন্দ্রনাথ এবং শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথকে নিয়ে তখন কলকাতা নগরীতে দেশের একটি সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল।

১৯১২ জানুয়ারীতে প্রফুল্লচন্দ্র রায়, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, আশুতোষ চৌধুরী, সারদাপ্রসাদ মিত্র, ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, মণীন্দ্রনাথ নন্দী এবং জগদীশচন্দ্র বসুর আহ্বানে একটি কবি সংবর্ধনার বৈঠক বসে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের তরফে; রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় তাঁকে এই প্রথম দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা অভ্যর্থনা করেন সর্বসাধারণের সম্মুখীন হয়ে। বৈঠকটি বসে "টাউন হলে"। বহু রবীন্দ্র-ভক্ত তাতে যোগ দেন। কিন্তু বেশীরভাগ লোক তখনও তাঁর বিরুদ্ধাচারী ছিলেন। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কবিকে হাতির দাঁতের ফলকে (পুঁথি আকারে) একটি কবিতা লিখে দেন। তাতে ছিল—

"জগৎ-কবি-সভায় মোরা তোমার করি গর্ব
বাঙালি আজি গানের রাজা, বাঙালি নহে খর্ব।"

জোঁকের মুখে নুন পড়লে যা হয় প্রমাদগুনানুসন্ধিৎসু পণ্ডিতেরা ক্ষেপে বলে উঠ্‌লেন, "আজ পর্যন্ত যে-কবি একটি মহাকাব্য লিখতে পারলে না সে আবার জগৎ-কবি সভার মধ্যে স্থান পাবে?" রবিদা শুনে সে সময় আমাদের বলেছিলেন, "যদি কখনো আমি মহাকাব্য লিখি তো কৃষ্ণ বিরহে অর্জুন গাণ্ডিব তুলতে পারচেন না—মহাভারতের এই বিষয় নিয়েই মহাকাব্য লিখব।" নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তির পূর্বে বিশিষ্ট কতকগুলি রবীন্দ্রভক্ত মিলে

এই অভ্যর্থনা না করলে চিরদিনের মত কলঙ্ক থেকে যেতো এ বিষয়। কাক-তালিয়বৎ ঠিক নোবেল পুরস্কার পাবার পূর্ব্বাহ্নেই দেশের গুণী সমাজ এই সংবর্ধনা করেছিলেন কবির।

কাব্য, সঙ্গীত বা চারুশিল্প পণ্ডিতদের বোঝাবার জিনিস নয়, রসিক বিশেষজ্ঞরাই তার মর্মদ্বার উদ্ঘাটন করতে পারেন। মহাকবি ভাস এই দরদী রসিকের বিরলতা বিষয় একটি শ্লোকে বলেছেন: "সুলভ জগতে সুকাজ করার লোক, দুর্লভ শুধু তাহা দেখিবার চোখ।" (সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অনুবাদ)। কবি রবীন্দ্রনাথকে পণ্ডিতেরা তাই বুঝতে পারেন নি। ছন্দ-সরস্বতী কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যের নিন্দা কেহ করায় তিনি তাঁর বন্ধুকে লিখে-ছিলেন: (তাঁকে "ছন্দ-সরস্বতী" পদবী রবীন্দ্রনাথের দেওয়া।)

"তুমি ডাক্তারবাবুকে যে চিঠি লিখিয়াছ তাহা পড়িলাম। যাহারা নিজে না লিখিয়া কেবল অন্যের লেখা সমালোচনা করিয়া বেড়ায় তাহাদের সঙ্গে যাহারা নিজে বিবাহ না করিয়া অন্যের বিবাহের কথা আলোচনা করে তাহাদের প্রভেদ কি? লিখিও। আমার মনে হয় যাঁহারা নিজে সুলেখক যেমন Goethe এবং রবীন্দ্রনাথ—তাঁহারাই সুসমালোচক। এবং যিনি নিজে সুবিবাহিত' তিনিই সুঘটক! তুমি কি বল?" (সাহিত্য-সাধক চরিতমালা—৬৩ পৃঃ ১৫)

যিনি নিজে কবি—তাঁর তৃতীয় নয়নের মত মনের গভীরে একটি সদা-জাগ্রত নয়ন থাকে—দেখতে পায় অনেক দূরের বস্তুকে যার কাছে সাধারণ মানুষে সহসা পৌঁছতে পারে না। কবির অভিজ্ঞতার উপরে তাই জাগে অনুভূতি যা সর্বচরাচরের বাইরে বিশ্বসৃষ্টির মূলতত্ত্বের দিকে প্রসারিত। এই চেতনাকেই কবি গীত, কাব্য ও নাট্যকলার রসরচনায় পরিবেশন করে গেছেন। তাই তাঁর অজানার সন্ধানে রচিত গানে শব্দ ও সুরের ওজ-মাধুর্য ও কোমলতায় গুণীজনকে অভিভূত করে। "অচেনাকে ভয় কি আমার ওরে?—অচেনাকে চিনে চিনে উঠল্ জীবন ভ'রে।" গানটিতে কবি গেয়েছেন জীবনের পূর্ণতার উদ্বোধন সঙ্গীত। অতি বাস্তবকে—Reality-কে কবি ধরেছেন অচেনার Unknown-এর সন্ধান করতে করতে। যে স্তরে তাঁর মনকে এইভাবে গানে, কাব্যে এবং নানাবিধ রচনায় নিয়ে গিয়েছিলেন অন্যের সাধ্য নেই সেখানে পৌঁছয়। তাই পণ্ডিতেরা তাঁর রচনার মর্ম বুঝতে পারেননি।

কবির সাধনা

আমরা দেখেছি তাঁর নব নব রচনা যখন প্রকাশিত হতো তখন সহসা সূর্যকরোজ্জ্বল ঝলকে সবাইকে ঝলসে দিতো। তিনি সত্যকে মানস-চক্ষে দেখেছেন এবং দেখিয়েছেন "তার অন্ত নাই যে নাই—যে আনন্দে গড়া আমার অঙ্গ—তার অণু পরমাণু পেল সকল আলোর সঙ্গ।" তাঁর কাব্যের বাণীতে দার্শনিকের সুর দেখা দিল। মনের গভীরে তলিয়ে গিয়ে নিজের সত্ত্বাবোধেরও বাহির-আঙ্গিনায় যেখানে মহানন্দঘন অনন্ত সদা বিস্তারিত সেখানে গিয়ে পৌঁছলেন। এইভাবে কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে সুর দিয়ে সুরের অনন্তগ্রাহ্য শক্তি অবলম্বনে প্রগতির পথে এগিয়ে চলেছিলেন সৃষ্টিকার্যে নিরত থেকে। সুর ছিল তাঁর সম্পৎ এবং বাণী ছিল তার বাহন। এমন কি তাঁর গদ্য রচনায়ও শব্দ-লালিত্য-লসিত হয়ে উঠ্‌ত একটি বিশেষ ছন্দ-মাধুর্যে। মনের তৃতীয় স্তরের ঊর্দ্ধে ছিল তাঁর গতিবিধি।

ক'বির সাধনা

কবির মনের অসাধারণ পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চিন্তার ধারাও পরি-মার্জিত এবং চিত্তের সংস্কার এত দৃঢ় হয়েছিল যে তিনি সর্বসাধারণের উপরে উঠেও স্ব'ন্ত্র বোধে হটিয়ে রাখতেননা কাউকেও। তাঁর দ্বার ছিল অবারিত। 'কাজলকালির' প্রশংসা পত্রও লিখে দিচ্ছেন—বিয়ের কবিতাও লিখে দিচ্ছেন। তিনি নিজেই আবার বলতেন, "আমার কাছে সার্টিফিকেট চাস্‌নে আমি তো নির্বিচারে সার্টিফিকেট বিতরণ করি।"

আশ্রমে থাকার কালে দেখেছি—তাঁর কাছে এসে আশ্রমের কর্মীরা বহু খুটিনাটি বিষয় অবতারণা ক'রে তাঁর অমূল্য সময় নষ্ট করতেন—তিনি তাতে বিরক্তি প্রকাশ কখনো করেননি। সে সময় দেখতুম গভীর কোনো রচনায় লিপ্ত আছেন, আশ্রমের ব্যাপারে যাঁরা এলেন তাঁদের তা' জানতেও দিলেন না। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেছিলেন "আমি তো কোমর বেঁধে লিখিনা আমার ঝরণা কলমের আগায় আপনি সহজে এসে যায় লেখা।"

তাঁর রচনার গভীরতার মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন সরলতা আছে, তাঁর এই জীবনের সরলতাই তার কারণ; তাঁর মন সে-দিক দিয়ে দেখলে পেকে যায়নি বা sophisticated হয়নি। তাঁর লেখা পড়লে তাই মনে হয় যেন

"এসব আমারই তো মনের কথা ?—আমিও তো সোজাসুজি এইভাবে বোলতে পারতুম ?"—তারপরমুহূর্তেই বোঝা যায় যে তা সহজ নয়। বরং দেখেছি অনেক পণ্ডিতকে যাঁদের পণ্ডিতাভিমান ও দৃঢ় সংস্কার এরূপ যে তাঁদের নিকট সহসা সকলে ঘেঁষতে পারে না। এরূপ পণ্ডিতদের লেখায় তাঁদের ব্যক্তিত্ব এত বেশী ফুটে ওঠে যেন মাষ্টার মশাই লাঠি নিয়ে সামনে বসে আছেন, তাঁদের রচনা পড়লে এইরূপই মনে হয়। আবার রবীন্দ্র-বঙ্কিম-রচনা পাঠে তাঁদের অস্তিত্ব থাকেনা—তাঁদের রচনা সন্দর্ভ মূর্ত হয়ে মনপ্রাণ হরণ করে ফেলে।

কবির নিকট ছিল সকলেরই সহজ গতিবিধি। ছাত্র ও আশ্রমবাসীদের দুঃখ সুখে যোগ দেওয়া এমনকি আমাদের সঙ্গে বর্ষায় ভিজতেও পিছপাও হননি। একবার বর্ষায় আমাদের ভিজতে দেখে গেঞ্জি গায়ে লাঠি হাতে বেরিয়ে পড়লেন। খোয়াই (বা মাটি ধোয়াই খালে) বর্ষার জলপ্রবাহে পা ডুবিয়ে হেঁটে গান গেয়ে আনন্দ করলেন শিশু বিভাগের ছাত্রদের নিয়ে আমাদের সঙ্গে। তার পরেই তাঁর গান বের হল "শ্রাবণ হয়ে এলে ফিরে, মেঘ আঁচলে নিলে ঘিরে।" আমিও অন্যদিকে আঁকলুম 'বর্ষালক্ষ্মীর' ছবি (Spirit of Rains); নিয়ে গিয়ে দেখাতেই আমায় উক্ত গানটি শুনিয়ে বল্লেন, "তুই আমার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবিনে—আমার কলম তুলতেই বেরোয় জানিস তো? আর তোকে ছবি আঁকতে বসতে হয় অনেক তোড়যোড় নিয়ে অনেক কাণ্ড করে।" এই 'বর্ষালক্ষ্মী' ছবি তখন প্রবাসীতে বেরিয়েছিল।

তাঁর রচনাই ছিল সকলের অনুপ্রেরণা—মাষ্টারি করেননি তিনি কারুর উপর। আমি তাঁর পাশে বসে ছবি এঁকে গেছি কিন্তু নিজের ইচ্ছাকে তিনি আমার উপর আরোপ করেননি বরং তার মধ্যেকার সৌন্দর্যের বিশ্লেষণ করে আমাকে আমার কাজে আরো উৎসাহ দিয়েছেন।

স্বরাজ হবার পর এখন দেখছি শিল্পীদের পৃষ্ঠপোষক সরকারী আমলারা; রাজামহারাজা এবং যাঁরা শিল্প-সৌখীন গুণগ্রাহী তাঁদের এখন অবস্থা শোচনীয়। শিল্প-রসিক হিসাবে এখন নিয়োজিত হচ্ছেন ঐতিহাসিক এবং প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা—তাঁরাই চিত্রকর, চিত্রকলা ও ভাস্কর্য্য নির্বাচন করছেন প্রত্যেক সরকারী আর্ট-কমিটিতে। ফলে শিল্পীদের আর কোনোই মান-সম্ভ্রম নেই। সকল প্রাদেশিক সরকারী কলা প্রতিষ্ঠানগুলির প্রধান পরিচালক সরকারী আমলারা। আর্ট ও কাল্চারের যে নতুন বিভাগ

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার খুলেছেন তাতেও শিল্পী-সদস্য বিরল, সবই অফিসিয়ালস্। কবি রবীন্দ্রনাথের কাছে দেখেছি তিনি শিল্পীদের উপরই শিল্পকাজ সম্পূর্ণ ছেড়ে দিতেন, নিজের কর্তৃত্ব আরোপ করতেন না।* তাই আশ্রমে অবাধ ভাবে আর্টের চর্চ্চা চালাতে পেরেছিলুম। এখন আমাদের শিল্পীদের পক্ষে অফিসিয়াল কমিটীর ঐতিহাসিক সদস্যদের মতামত নিয়ে কাজ করা এক অসম্ভব ব্যাপার, তাই অভুক্তই থাকতে হবে আমাদের স্বাধীনতা পেয়েও। তাছাড়া যে কয়েকটী বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্ট পড়ানো হয় তাতে আর্ট নাম মাত্র থাকে। অধ্যাপনার জন্য অধ্যাপক ঐতিহাসিকরাই নিযুক্ত হন। ফলে দেশে আর্টের শিক্ষাও এখন বিপরীতগামী।

কবির গান ও অনুপ্রেরণা

কবির গানের অনুপ্রেরণা যে কিভাবে আস্তো তা বলা যায় না। কখনো বা মনের গহনে অবগাহন করে হৃদয়ের অনুভূতির দ্বারা, কখনো বা প্রকৃতির বুকের রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটন ক'রে খুঁজে পেতেন তাঁর কাব্য ও গানের রসাভাস। মনঃসংজ্ঞা (intuition) ছিল তাঁর অদ্ভুত উজ্জ্বল।

দেখেছি, শান্তিনিকেতনে তাঁকে তখনকার ছোট্ট নতুন বাঙলার দোতলার জানালা খুলে ভুবনডাঙ্গা যাবার পথের পরে দৃষ্টি আবদ্ধ করে বসে আছেন —দেখ্ছেন হাটে যাচ্ছে—লোকজন নানা পশরা বহন করে। রচনা করলেন একটি গান :

"ওরা যায় চলে যায়
নানা কাজে
সকাল সাঁঝে
আমি কেবল বসে আছি
আপন মনে কাঁটা বাছি
পথের মাঝে, সকাল সাঁঝে।"

সবাই আমরা তো সব জিনিস দেখি কিন্তু রবিদাদার সমীক্ষণ-শক্তি ছিল অপূর্ব। চলন্ত ট্রেণে যেতে যেতে আমাকে দেখাতেন দূরে গাছের ভিতর কতপ্রকার বিচিত্র আকার-প্রকার জন্তু, পাখির। আশ্রমে তাঁর সঙ্গে মাঠে

এবিষয় শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের "স্মৃতিকথা" দেশ পত্রিকায় ৬ই বৈশাখ ১৩৫৯, ৭২৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

বেড়াতে বেড়াতে সন্ধ্যাকাশে উদয় হ'ল আদিত্য কিরণোজ্জ্বল ধূসর মেঘের তোরণ-দ্বার এবং সেই সঙ্গে একটী মশাল হাতে মানুষের রূপ প্রকাশ পেল প্রবেশ করচে—ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল আকাশে সেই মেঘরূপ। রবিদাদা সেটি দেখলেন এবং তাঁর অনুপ্রেরণার মধ্যে কখন তার প্রকাশ হবে কেউ বলতে পারে না—এইরূপ প্রত্যক্ষবোধও কখন কখন অনুপ্রেরণা লাভই ছিল কবির কাজ এবং খেলা।

একদিন কবি প্রাতে নতুন বাঙলার দোতালা বারান্দায় বসে আছেন, শীতের প্রারম্ভ কাল; সামনে আমলকি গাছের মাথায় ঝির্‌ঝিরে মৃদুবায়ু হিন্দোল লেগেছে—সেই পাতার নাচনে, কবির গান এল। "শীতের হাওয়ায় লাগল নাচন আমলকির ঐ ডালে ডালে।" ...আশ্রমের গানের দল কিছুকাল পরে, দিনুদা শেখানোর ফলে, গানটা গেয়ে আশ্রম মুখরিত করে তুল্‌লে।

প্রতি বৈশাখে কবির জন্মদিনে তাঁকে আমি একটি ছবি এঁকে উপহার দিতুম। সেবার তখন গ্রীষ্মাবকাশে রাঁচিতে ছিলাম। আমার প্রেরীত 'প্রকৃতির হেঁয়ালি' ছবিখানি পেয়ে রবিদাদা আমায় লিখলেন: (২৯শে বৈশাখ, ১৩২৫)।

"কল্যাণীয়েষু—তোর উপহারটি পেয়ে খুব খুসি হলুম। সুন্দর হয়েছে। প্রকৃতির বুকের মধ্যে যে হেঁয়ালি আছে তাই নিয়েই আমার কারবার। আমার জন্মদিনে তারই ছবিটি সঙ্গত হয়েছে। ইতি—রবিদাদা।"

অব্যবহিত পরে আমার ছবির উপর গান রচনা করলেন—ছবিতে ঠিক যেরূপ আছে তারই ভাবাভাস নিয়ে:

"আসা যাওয়ার মাঝখানে
একলা আছে চেয়ে কাহার পথ পানে।
আকাশে ঐ কালোয় সোনায়
শ্রাবণ মেঘের কোণায় কোণায়
আঁধার আলোয় কোন্ খেলা যে কে জানে।"

ইত্যাদি

আমার জীবনে গর্ব্ব করার এই মাত্র আছে যে রবিদাদা আমার আঁকা ছবিতে শুধু আকৃষ্টই হননি তার উপর গানও রচনা করে গেছেন। অর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় প্রকাশিত Modern Indian Artist, Vol II গ্রন্থে ২৪



বৃক্ষতলে অধ্যাপনা

তিনি লিখেছেন 'সুরের আগুন' ছবিটির বিষয়, "The picture is an illustration of one of the most popular songs of Dr. Rabindra Nath Tagore" কথাটা সম্পূর্ণ ভুল—আমি book illustrator কখনই ছিলাম না। গাঙ্গুলী মহাশয় আমার মৌলিক পরিকল্পনা শক্তির প্রতি কেন যে সন্দিহান তা আমি আজও ভেবে পাইনি। এটর্নি গাঙ্গুলী মশাই উক্ত পুস্তকে সহপাঠী নন্দলাল বসুকে শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের পংক্তিতে বসিয়ে, আমাদের 'petit' বলে পিঠ চাপড়ে নন্দর সঙ্গে একটা দ্বন্দ্ব বাধাবার চেষ্টা করেছেন একটি introduction লিখে। কৃটিক হয়েও তাঁর খাটো দৃষ্টিরই পরিচয় দিয়েছেন!

সে যাই হোক, এখন 'সুরের আগুন' ছবিখানি কিভাবে আশ্রমে আঁকলুম তার আসল কথা বলি। সেবার গরমের ছুটিতে রাঁচি গেছি, আমার ছাত্র মুকুল চন্দ্র দে আছেন আশ্রমে। আমার অনুপস্থিত-কালে নতুন ছবির জন্যে বিষয়বস্তু ভাবতে না পেরে তিনি গেলেন গুরুদেবের* (রবিদাদার) কাছে। মুকুলের ছিল অবাধ গতি সর্বত্র এবং সকলের সঙ্গে জমিয়ে নেবারও অদ্বিতীয় ক্ষমতা। কবি তাঁকে বল্লেন, "আমার উপযুক্ত একটি সরস্বতী আঁক্, 'দিব্য প্রজ্ঞা"—ক্যালেণ্ডারের সরস্বতী চাই না।" মুকুল কোমর বেঁধে লেগে গেলেন একটার পর একটা সরস্বতী আঁকতে; রবিদার কিন্তু একটিও মনে ধর্‌লো না। অবশেষে গ্রীষ্মাবকাশের পর আমি ফিরে আসতেই রবিদা তাঁর কথা সব বল্‌লেন এবং পুনরায় আমাকে তাঁর 'দিব্যপ্রজ্ঞা' সরস্বতীর চিত্রাভাস তৈরী করতে বল্‌লেন। তিনি যে ভাবে বর্ণনা-কালে জ্যোতিদৃপ্ত ভাব প্রকাশ করেছিলেন তাতে তাঁর সরস্বতীর আভাস পেয়ে একটি "অগ্নিময়ী সরস্বতী" আঁকলুম। রঙিন ছবিটি সম্পূর্ণ কোরে রবিদার সামনে ধরতেই তাঁরও মনে সুরের রঙ ধরলো, তিনি তুড়ি দিতে দিতে তাল দিয়ে গুঞ্জন করে রচনা করলেন:

"তুমি যে সুরের আগুন
লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে
এ আগুন ছড়িয়ে গেল
সবখানে, সবখানে।..."

যথানিয়মে এই গান দিনুদার মারফৎ আশ্রমের গানের দল শিখে নিলে।

*কবিকে আশ্রমে সকলেই "গুরুদেব" বলতেন এবং মহাত্মা গান্ধীও তাঁকে ঐ নামেই অভিহিত করেছিলেন।

তারপর কবি বাঙলার গ্রাম্য-জীবন নিয়ে আমার হাতের রেখাঙ্কনের তাড়া নিজের কাছে রাখলেন ; বল্লেন সেইসব ছবিগুলির উপর গান রচনা করবেন এবং বিলাতে ছবিসহ ছাপাবেন। বইখানির নামকরণ করলেন 'চিত্রবিচিত্র'। তার মলাটের নক্সাও আমি তৈরী করে ফেল্‌লুম।

তার কিছুদিন পরে ১৯১৬-তে তিনি গেলেন আমেরিকায়। সেখানে ব্লক তৈরী করানো হ'ল বটে কিন্তু বক্ষ্যমান কারণে সেগুলি তাঁর গানের সঙ্গে ছাপা হল না। রবিদা বলেছিলেন যে আমার তুলির সূক্ষ্ম রেখার শ্রী দেখে আমেরিকার শিল্পীরা বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়েছিলেন। সে সময় ছবি ছাপার উন্নতি বিশেষ না হওয়ায় ব্লকগুলি খুব ভালো হয়নি।

উল্লিখিত গ্রাম্য দৃশ্যের ছবিগুলির মধ্যে একটিতে ছিল,—গ্রাম্য বধূ ঘড়া-গামছা নিয়ে ঘাটে জল তুলতে গেছে কিন্তু সবকথা ভুলে গিয়ে একটি পদ্মের পাপড়ি ছিঁড়ে ছিঁড়ে জলে ভাসাচ্ছে। রবিদা ছবিটি দেখেই বল্লেন, "জানিস্‌, তুই এ কী করেছিস্‌? এই ছবিতে তুই 'লিরিককে' (গীতিকাব্যকে) মূর্তি দিয়ে ধরেছিস—এই ছবি 'গীতি-কাব্য-সুন্দরী'।" ছবিটির উপর গান রচনা করলেন:

"একলা বসে একে একে অন্যমনে
পদ্মের দল ভাসাও জলে অকারণে।..."

'চিত্রবিচিত্র' বইখানির জন্যে আমার ছবিগুলির উপর "পাতার বাঁশী" "মায়ের সাগর পাড়ি দেব"—প্রভৃতি আরো যে সব গান রচনা করেছিলেন সেগুলি তাঁর নানা পুস্তকে এখন ছড়িয়ে গেছে উদ্ধার করাও শক্ত। আমার রেখাঙ্কনগুলিও মাদ্রাজের মাননীয় জজ তিলং, কলকাতার পুলিস কমিশনার 'টেগার্ড' সাহেব প্রভৃতির সংগ্রহে ছড়িয়ে গেছে এখন।

কবি, প্রকৃতির ঋতু-রস-সম্ভার থেকে ধ্বংস ও সৃষ্টির মূলতত্ত্ব উদ্ঘাটিত করে রসালো ভাবে কাব্যে, সঙ্গীতে, নাট্যে ও নৃত্যে যা পরিবেষণ করে গেছেন তা আপাতঃ-দৃষ্টিতে যতই সহজ মনে হোক্‌না কেন, তার রস-ব্যঞ্জনার মধ্যে কতটা শক্তি নিহিত আছে, তা কম লোকেই উপলব্ধি করতে পারেন। কবির রস-রচনার মধ্যে বিশেষ ক'রে গানে তিনি যে সুর-যোজনা করতেন তার মাধুর্যের বিষয়ও পণ্ডিতাভিমানী সঙ্গীতজ্ঞরা বুঝতে পারেননি গোড়ায়। আমার মনে আছে যখন প্রথম লখনউ-এ আসি তখন ক্লাসিকাল ওস্তাদি গানের পণ্ডিত-

রসিক অধ্যাপক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় আমার সঙ্গে এ বিষয় নিয়ে বহু আলোচনা করেন। তাঁর এবং অন্যান্য সেখানকার সঙ্গিতাচার্যদের তখন ধারণা ছিল গ্রাম্য সঙ্গীতের (Folk-song-এর) সুর-দুষ্ট কবির গান যদি ক্লাসিকাল সুরে ঢেলে তোলা যায় তো তাতে তার রস-মাধুর্য আরো বেশ উজ্জল হয়ে ফুটবে। এমন কি বন্ধুবর দিলীপকুমার রায়ও এই বিষয় নিয়ে স্বয়ং কবির সঙ্গে তর্ক করেছিলেন। দিলীপকুমার রবিদার একটি গান ওস্তাদী সুরে গেয়েও তাঁকে শুনিয়েছিলেন—ফল যে ব্যর্থ হয়েছিল তা বলাই বাহুল্য।

এটা মনে রাখা দরকার কবি জানতেন রামপ্রসাদী, বাউল, কীর্তন বা টপ্পার মূলেও আদি ক্লাসিক্যাল সুরের ভিত্তি আছে। তিনি গোড়ায় গোড়ায় ক্লাসিক্যাল সুরে 'মায়ার খেলা' 'বাল্মীকিপ্রতিভা'তে গান দিয়েচেন এবং বহু ক্লাসিক্যাল সুরে ধর্ম সঙ্গীতও রচনা করেচেন পূর্বে। তারপর রামপ্রসাদী, বাউল, কীর্তনও তাঁর গানের সুরের অঙ্গীভূত হয়। কিন্তু কবি তাতেই ক্ষান্ত বা নিশ্চিন্ত হন নি—পুরোনোকে ভেঙে নতুন রূপ দিলেন সকল সুরের মিশ্রণ সুরের রঙে গান রচনা কোরে। কবির গান—সুর করে গাইবার গীতিকাব্য (Lyric) তাই তার কথা ও সুর দুয়েরই প্রাধান্য। কাব্যে যেমন ছন্দে ও শব্দে, চিত্রে যেমন রেখায় ও বর্ণে কবির সঙ্গীতেও তেমনি সুরে ও কথায় সম্বন্ধ অত্যন্ত নিবিড়, তাদের স্বতন্ত্র করা যায় না। তাঁর দেওয়া গানের সুর গানের কথাকে প্রাণবন্ত কোরে এক হয়ে মিলিয়ে যায়—যেন একটি ফুল রঙে ও গন্ধে অন্তর্লগ্ন হয়ে আছে। স্বাভাবিক রঙ ছাড়া ফুল যেমন আর ফুল থাকেনা যতই তাতে উপর থেকে রঙ ঢাল না কেন, তেম্‌নি কবির গান কবির দেওয়া স্বতঃস্ফূর্ত সুর ছাড়া দাঁড়াতে পারেনা। মোটকথা, কবির গান কবির দেওয়া বাণী ও সুরে এমন গাঁটছড়া বাঁধা আছে তাকে পুনরায় অন্যসুরে গাওয়া যায় না। সব বড় শিল্পের লক্ষণই হল এইপ্রকার সম্মিলন স্থাপন। তাছাড়া, সুর যখন অনন্তকে স্পর্শ করে চলে তার রণণ থামে না। জলে ইট ফেললে তার তরঙ্গ যেমন ক্রমবিস্তারমান হয়, গানের সুরও তেমনি ব্যপ্ত হয়। কবি তাঁর গীতিকলায় সেই অশেষের সুরই ধ্বনিত করে রেখে গেছেন তা কেবল সাময়িককালের জন্য নয়—চিরকালের বস্তু।

রবিদাদা বেসুরো বা বেতালা গান সহ্য করতে পারতেন না। এতটুকু সুরে লয়ে ত্রুটি ঘটলে তিনি ক্ষুব্ধ হতেন। একদিনের ঘটনা মনে আছে—আমি

আর সৌম্য-ভায়া রবিদার একটি নতুন গান "একদা তুমি প্রিয়ে"—শিখে জোড়াসাঁকোর দোতলার বারান্দায় বসে গাইছি। রবিদা শুনেচেন, আর অমনি অতর্কিতে এসে দুহাতে দুটি নাতির কাণের উপর অত্যাচার করে তাদের আধমাত্রা যেখানে কম হচ্ছিল বাৎলে দিলেন। সকলেই জানেন তিনি বলতেন, "আমার গানের উপর যেন ষ্টিম রোলার না চালায় কেউ।" একটি ঘটনার বিষয় অনেকে জানেন যে কোনো এক নামজাদা ওস্তাদ কবিকে গান শোনাবার সময় তাঁর গলার যাবতীয় গমক-তাল-মীড়-গিটকিরির কাজ ফলিয়ে দুঘণ্টা ধরে গেয়েছিলেন। শোনার পর কবি বলেছিলেন "বধূকে তার সর্বাভরণে ভূষিত করে সাজিয়ে ধরলে কি তাঁর রূপের মর্যাদা করা হয়? —অতিরিক্ত কিছুই ভাল নয়।"

রবিদার গান স্বরলিপি থেকে শিখলেও অনেক সময় তার খোঁচ-খাঁচ ঠিক দিতে পারা যায় না। স্বরলিপিতে সুরের কাঠামো মাত্র থাকে। ভোল গাইয়ে হলে অনেক সময় সেটা তিনি পূরণ করে নিতে পারেন স্বরলিপি অবলম্বনে। রবিদাদা আলমোড়া থেকে (২০শে জ্যৈষ্ঠ ১৩২১) তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে একটি পত্রে লিখেছিলেন:

"ভাই জ্যোতিদাদা,... ... ...গান অনেক তৈরী হয়েচে। এখনো থামচেনা—প্রায় রোজই একটা না একটা চলছে। আমার মুস্কিল এই যে সুর দিয়ে আমি সুর ভুলে যাই। দিনু কাছে থাকলে তাকে শিখিয়ে দিয়ে বেশ নিশ্চিন্ত মনে ভুলতে পারি। নিজে যদি স্বরলিপি করতে পারতুম কথাই ছিলনা। দিনু মাঝে মাঝে করে কিন্তু আমার বিশ্বাস সেগুলো বিশুদ্ধ হয় না। সুরেন বাঁড়ুজ্যের সঙ্গে আমার দেখাই হয়না—কাজেই আমার খাতা এবং দিনুর পেটেই সমস্ত জমা হচ্চে। এবার বিবি* সেটা কতক লিখে নিয়েছে। কলকাতায় গিয়ে এসব গান গাইতে গিয়ে দেখি কেমন ম্লান হয়ে যায়। —তাই ভাবি, এগুলো হয়তো বিশেষ কারো কাজে লাগবেনা।—"স্নেহের রবি"।

রবিদাদার কণ্ঠ খুব দরাজ ও মিষ্ট ছিল। ১৯১৭ সালে 'ফাল্গুনী' নাটকে অন্ধবাউল সেজে যে গান গেয়েছিলেন তা' যাঁরা শুনেচেন তাঁদের প্রাণে আজও গাঁথা আছে। পরবর্তীকালে বয়সের জন্য ক্রমে শক্তি ক্ষীণ হয়ে

---

*শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী (কবির ভ্রাতুষ্পুত্রী)।

এসেছিল তাঁর। বঙ্কিম বাবুর 'বন্দে মাতরম্' গানের সুর প্রথমে কবি দেন একলা গাইবার যোগ্য করে। তাঁর অল্প বয়সের গান গাওয়া শোনার সৌভাগ্য আমার হয়েছে এবং সেইজন্তে জীবনকে ধন্ত জ্ঞান করি। তথনকার কালে চিত্তরঞ্জন দাসের ভগ্নী অমলা দাস, শ্রীমতী সাহানা দেবী, শ্রীমতী চিত্রলেখা সিদ্ধান্ত, শ্রীমতী কনক দাস প্রভৃতি কয়েকটি মহিলা, কবির গান গেয়ে মুগ্ধ করেছেন। আর আশ্রমে দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তাঁর শিষ্যদের মধ্যে শ্যামকান্ত সারদেসাই, অনাদি দস্তিদারের নাম উল্লেখ করা যায়।

এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা মনে পড়ল। ১৯১৪-তে রবিদা এক দার্শনিক মতের অবতারণা করলেন আমাদের কাছে। তাঁর বাক্তব্যের বিষয় ছিল ললিতকলা (চিত্র ও ভাস্কর্য) সঙ্গীত বা কাব্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়, কেননা সেগুলি দেখার পরে অন্তরে তার স্পন্দন থাকেনা; কাব্য ও সঙ্গীত শ্রবণে ও মননে থেকে যায় তার রণণ। এই হিসাবে কাব্য ও সঙ্গীত গতিশীল (dynamic) আর ললিত কলা স্থবির (Static)। এই তর্কের আসরে ছিলেন সঙ্গীতাচার্য দিনুদা এবং বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক জগদানন্দ রায়। আমার ব্যক্তব্য হ'ল সঙ্গীতের মতই চিত্র ও ভাস্কর্য রসাভাস (emotion) জাগায়। কেবল Commercial pattern design-ই স্থবির—দেখলে মনে তার ছাপ থেকে যায় না। সঙ্গীত ও কাব্যের মতই চিত্রকলা ভাব-জগতের বস্তু অতএব ভাল একটি ছবি দেখলে চিরকাল তার ভাব-রণণ মনে জাগরুক থাকবে—দেখার সঙ্গে সঙ্গেই তার পরিসমাপ্তি নয়। দিনুদা আমার কথার মর্ম ধরতে না পেরে রবিদাদার সঙ্গে বৃথা তর্ক করছি বলে হাসলেন। পরে যখন সেই বছর রবিদার সঙ্গে গয়া হয়ে এলাহাবাদ গেলুম, এলাহাবাদে বসে (৩রা কার্তিক, ১৩২১) তিনি লিখলেন বলাকাতে একটি কবিতা:

"তুমি কি কেবল ছবি
শুধু পটে লিখা... ... ... ।"

এর পূর্বে ললিতকলার বিষয় তাঁর কোনো রচনা কোথাও প্রকাশ হয়েছে বলে জানিনা। ছেলেবেলাকার তাঁর চিত্রকলার অনুরাগ এরপর থেকেই ক্রমে পুনরায় দেখা দিল এবং শেষ বয়সে (৭০ বৎসর বয়সে) নিজে বহু ছবি এঁকে গেলেন অন্তিমকাল পর্যন্ত। তার কথা পরে বিস্তারিত আলোচনা করব।

উইলি পিয়ার্সন ও এণ্ড্রুজ সাহেব

রবিতীর্থে উইলি পিয়ার্সন (W. W. Pearson) এবং এণ্ড্রুজ সাহেবদের দেশ ও সর্বস্ব ত্যাগ করে কবির নিকট আত্মসমর্পণ করার মহত্বের কথা এবার বলি। আমি তখন সতীর্থসুহৃদ সমরেন্দ্রনাথ গুপ্তের সঙ্গে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগ থেকে আহূত হয়েছি 'যোগীমারা' প্রাচীন গুহা-চিত্রের অনুলিপি নিতে। শীতের তিনমাস মধ্যপ্রদেশে সুরগুজা ষ্টেটের জঙ্গলে (রামগড়ে) কাজ করে ফিরে এসে দেখা পেলুম এই দুই ইংরেজ মহাত্মাদের। পিয়ার্সন ছিলেন ইংলণ্ডের 'কোয়েকার' বংশের এবং তাঁর পিতা ম্যানচেষ্টারের ধর্মযাজক ছিলেন। বিলাতেই ইতিপূর্বে রবিদাদার তিনি সাক্ষাৎ পান। পূর্বে একবার পিয়ার্সন তাঁর ভগ্নীকে নিয়ে বাঙলাদেশে হুগলী জেলায় বিলাতফেরৎ এক বাঙালী জমিদার বন্ধুর বাড়ীতে কাটিয়ে গিয়েছিলেন। সেই থেকে তাঁর মন ভারতবর্ষের দিকে উন্মুখ হয়েছিল আসবার জন্যে। এণ্ড্রুজ (Rev. C. F. Andrews) পাদ্রি এবং দিল্লীতে তিনি বিশপ কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। ইনিও পিয়ার্সনের সঙ্গে কবির নিকট এলেন ১৯১৪-তে শান্তিনিকেতনে বসবাস করতে। এরূপ স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত খুবই বিরল।

পিয়ার্সন পোষাক-পরিচ্ছদেও বাঙালী হয়ে গেলেন এবং ভারতবর্ষকে দ্বিতীয় জন্মভূমি বলে মেনে নিলেন। বাঙলা ভাষা দেশে থাকতেই পূর্বে কিছু কিছু আয়ত্ত করেছিলেন, পরে বাঙলাতে কথা বলতে তাঁর আনন্দ ছিল অত্যন্ত বেশী। সাউথ আফ্রিকা এবং ফিজি দ্বীপে এণ্ড্রুজ সাহেবের সঙ্গে যখন যান বিশেষ সংস্কার কার্যে ব্রতী হয়ে তখন সেখানেও খুঁজে বার করেছেন বাঙালী পরিবার, এত টান ছিল তাঁর বাঙালীর প্রতি। শিশুদের জন্যে তাঁর নিজের হাতে লেখা 'তারার স্বপ্ন' গল্প আজও আমার কাছে আছে। তিনি আমায় গল্প করেছিলেন বিলাত থেকে যখন প্রথম ভারতবর্ষে আসেন, জাহাজে সহযাত্রী ইংরাজ যাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে তাঁর সঙ্গে মিশেছিলেন তাঁরাই যখন দেখলেন ইণ্টার ক্লাসে দেশী 'নেটিভের' সঙ্গে তিনি যাচ্ছেন বম্বে থেকে কলকাতায়, তখন তাঁরা আর তাঁর সঙ্গে কথা বলেননি--অপরিচিতের মতই অবজ্ঞা করেছিলেন। এণ্ড্রুজ আর পিয়ার্সন ভারতবর্ষে সর্বদা তৃতীয় শ্রেণীতে যাতায়াত করতেন রেলে।

উইলি পিয়ার্সন ও এণ্ড্রুজ সাহেব

পিয়ার্সন ও এণ্ড্রুজই প্রথমে মহাত্মা গান্ধীর আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ আন্দোলনের বিষয় প্রত্যক্ষ গোচর কোরে Modern Review এবং অন্যান্য পত্রিকায় প্রচার করেন। তার পূর্বে খুব অল্প লোকই তাঁর কথা জানতেন ভারতবর্ষে। কংগ্রেসের তরফ থেকে আজ স্বরাজ হবার পর এই দুই ইংরেজ মহাত্মার নাম পর্যন্ত লোপ পেতে বসেছে।

এণ্ড্রুজ একবার আশ্রমে ফিরে এলেন সাউথ আফ্রিকা থেকে, আমরা দেখি তাঁর মুখ চোখ মার খেয়ে ফুলে উঠেছে; জানা গেল তাঁর স্বজাতীয় শ্বেতাঙ্গরাই ট্রেনে একলা পেয়ে তাঁকে জুতো-পেটা করেছেন, তিনি কালো-আদমিদের (heathen-দের) হয়ে বৃটীশ গভর্ণমেণ্টের নিকট আফ্রিকার সাদা গভর্মেণ্টের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাচ্ছেন বোলে। তাঁকে যে তখন এদেশে 'দীনবন্ধু' বলা হতো—সে নাম কবিই তাঁকে দিয়েছিলেন। এণ্ড্রুজের মারফৎই বড়লাট লর্ড আরউইন রবিদাদাকে অনুরোধ জানিয়ে 'নাইটহুড্' দেন। অনেক অনুরোধ-উপরোধের ফলে তবে তিনি ইংরাজদের নিকট সে সম্মান গ্রহণ করেন, কতকটা এণ্ড্রুজকেই খুসি করার জন্যে। ১৯১৯-এ প্রথম যুদ্ধের শেষে জলন্ওয়ালাবাগে বৃটিশ অত্যাচারের প্রতিবাদ স্বরূপ তাঁর 'নাইটহুড্' তিনি ত্যাগ করেন। তিনি সেই উপলক্ষে নির্ভীকভাবে ইংরাজদের স্বার্থপরতা এবং অত্যাচারের কথা তীব্র ভাষায় ঘোষণা করেছিলেন একথা সকলেই অবগত আছেন।

এণ্ড্রুজ ছিলেন বয়ঃজ্যেষ্ঠ, তাঁকে সমীহ করতুম আমরা আশ্রমে সবাই। উইলি পিয়ার্সনের সঙ্গে আমার সখ্যতা অত্যন্ত প্রবল হয়। আমি তাঁকে রবিদার কাব্য পড়ে শোনাতুম আর তিনি আমাকে ইংরাজ কবিদের কাব্য পড়ে শোনাতেন। তিনি অক্সফোর্ডের এম, এ, ছিলেন। উইলি ও আমার পরস্পরের গাঢ় বন্ধুত্বের বিষয় তখন এত প্রচার হয়েছিল আশ্রমে যে রবিদাও আমাদের কাউকে দেখলেই অন্যজনের খোঁজ নিতেন। সত্যই উইলির মতন অন্তরঙ্গ বন্ধু জীবনে আজও আর আমি পাইনি। একদিন রবিদার কাছে আমি বসে আছি, উইলিও সেখানে উপস্থিত হলেন। কথায় কথায় রবিদাকে তিনি বল্লেন: "গুরুদেব, আপনি আর অসিত উভয়ে যে সৃষ্টিকাজ করেছেন তা' স্থায়ী জিনিস এবং তার ফল সবাই ভোগ করবে—এখন, এবং ভবিষ্যতেও। কিন্তু আমাদের মত নীরস মাষ্টারদের জীবনে চিরস্থায়ী কাজ করার কি আছে?

তখন রবিদাদা স্মিতমুখে বুঝিয়ে বলেছিলেন তাঁকে, "লোকশিক্ষা বা সেবা মানুষের বিশেষ ধর্ম এবং সর্বোচ্চ জিনিস—তা' ক্ষয়েষ্ণু নয়—প্রগতিশীল; অতএব তোমাদের কাজের মূল্য অনেক এবং পরম্পরার মধ্যে চিরস্থায়ী।"

উইলি পিয়ার্সন শিশুবিভাগে শিক্ষা দিতেন এবং নিকটবর্তী সাঁওতাল পল্লীতে একটি ক্লাস খুলে প্রত্যহ বিকেলে পড়াতেন সাঁওতালদের। এইভাবে সেখানে একটি ছোট খাট স্কুল গড়ে তুলেছিলেন, আজও তা' চলে আসছে। উইলি শুধু তাদের পড়াতেন না, পুরাণ ইতিহাসের বিষয় গল্প ও বলতেন এবং বই কাগজ কলম তাদের নিজে উপহার দিতেন।

তাঁর আর এক কাজ ছিল, আশ্রম-শিশুরা অসুস্থ হয়ে আশ্রমের হাসপাতালে গেলে তিনি রাত জেগে তাদের পরিচর্য্যা করতেন। তাঁর জীবনের ব্রতই ছিল লোক-সেবা। তিনি একসময় নিজে এবং বিলাতের বন্ধুদের দ্বারা আমার এক ছাত্রের সেখানে আর্থিক বিষয় সহায়তা করেন। দুঃখের বিষয় আমার সেই ছাত্রটি বিলাতে থাকার কালে সে ঋণ শোধ করেননি বা কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করেননি। কিন্তু তবুও পিয়ার্সন আমায় এই কথাই সে বিষয় বলেছিলেন, " ও এখন ছেলেমানুষ, পরে বড় হলে শুধ্‌রে যাবে এবং ঋণ পরিশোধ করবে।" এই কথাতেই তাঁর মহত্ত্ব প্রকাশ পায়। রবিদার একটি গান "জীবনে যত পূজা হল না সারা, জানি গো জানি তাও হয়নি হারা" উইলির বিশেষ ভাল লাগতো এবং এসরাজ বাজিয়ে গাইতেন এই গান তিনি প্রত্যহ।

১৯১৬-তে উইলি যখন রবিদাদার সঙ্গে জাপান হয়ে আমেরিকা যান, তিনি জাপানে থাকার কালে ভারতের প্রকৃত অবস্থার বিষয় একটি বই লেখেন। গোয়েন্দার দ্বারা জানতে পেরে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট তাঁর ভারতে ফিরে আসা কিছুদিনের জন্য বন্ধ করেন। তখন তিনি রবিদার সঙ্গে আমেরিকায় গিয়ে প্রথমে নানা শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষাপ্রণালী বিষয় পর্যালোচনা করেন। তারপর সেখানকার একটি অসংযত শিশু সংশোধনী স্কুলের শিক্ষক হন।

তিনি ফিরে আসার পর তাঁর নিকট শুনেছি আমেরিকায় শাসন না-করেও কিভাবে দুর্দান্ত বালকদের বশে আনা এবং উপযুক্ত শিক্ষার দ্বারা মানুষ করা হয় তার বিষয় তিনি দৃষ্টান্তস্বরূপে যা বলেছিলেন তা' বললে অপ্রাসঙ্গিক হবেনা।

উইলি পিয়ার্সন ও এণ্ড্রুজ সাহেব

একদিন আমেরিকার (কালিফোর্নিয়ার) এক স্কুলে একটি বালককে কোমরে শিকলি বেঁধে তার পিতা আনলেন অধ্যক্ষের নিকটে। তাঁর আফিসে তখন উইলিও বসে ছিলেন। অধ্যক্ষ তারপর ছেলেটির পিতার কাছে ছেলের দুষ্টুমির যাবতীয় কীর্তিকলাপ জেনে নিয়ে রিপোর্ট লিখে নিলেন। অবশেষে অধ্যক্ষ বল্লেন অভিভাবককে, শিকলি খুলে দিয়ে ছেলেকে রেখে একঘণ্টার জন্যে অন্যত্র যেতে। ছেলের পিতা তাই করলেন। অভিভাবক চলে যাবার পর দুষ্টু ছেলেটিকে অধ্যক্ষ কিছু না বলে নিজের অফিসেই বসিয়ে রেখে উইলির সঙ্গে চলে গেলেন অন্যত্র। ছেলেটি অধ্যক্ষের বসবার টেবিলের ধারে অফিসে একটি চেয়ারে বসে রইল। অধ্যক্ষের বিরাট কক্ষ —বইয়ের আলমারি, গ্লোব এবং বহু শিক্ষাপ্রদ মূল্যবান মিউজিয়ামের সামগ্রী কাঁচের বিবিধ কেসে সাজানো।

দুষ্টু ছেলে সুযোগ পেয়ে অধ্যক্ষের টেবিল থেকে 'পেপার ওয়েট', রুলার প্রভৃতি যা হাতের কাছে পেলে তাই দিয়ে ছাদের 'স্কাইলাইটের' উপর রঙিন কাঁচ ভাঙবার জন্যে ছুড়তে লাগলো। এইভাবে ঘরের জিনিসপত্র ভেঙে একবারে ছারখার করল। আধঘণ্টা বাদে উইলিসহ অধ্যক্ষ নিজের কামরায় ফিরে এসে দেখলেন ছেলেটির সব কাণ্ডকারখানা। অধ্যক্ষ শান্ত ভাবে তার পিঠে হাত বুলিয়ে বল্লেন, "কি? তোমাকে তোমার বাবা দুষ্টু বলেন? এত চেষ্টা করেও তুমি কৈ 'স্কাইলাইটের' কাঁচ ভাঙতে পার নি তো? দাও আমাকে!" —বলেই রুলার বালকের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে তৎক্ষণাৎ ছুঁড়ে ছাদের মাঝখানে স্কাইলাইটের রঙিন কাঁচ ভেঙে ফেল্লেন। উইলি দেখলেন ছেলেটি বিস্ফারিত নেত্রে অধ্যক্ষের দিকে চেয়ে আছে আর তার দুষ্টুমি চিরবিদায় নিয়েছে তার কাছ থেকে। অভিভাবক ফিরে এসে ছেলের শান্ত-শিষ্ট ভাব দেখে অবাক হয়ে গেলেন। উইলির উপরই তার শিক্ষার ভার পড়ল। সে ক্রমে শান্ত চিত্তে পড়াশুনায় মন দিল।

এবিষয় আর একটি ঘটনা উইলি আমাকে বলেছিলেন সেই স্কুলের। একটি ছেলে একদিন প্রাতে অধ্যাপক এবং অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে ভ্রমণ কালে সমুদ্র তীরে দেখলে জেলেরা ডেঙ্গার উপর নৌকো উঠিয়ে রেখে মেরামত করছে। দুষ্টু ছেলেটি দৌড়ে একটা নৌকার কাছে গিয়ে জেলের হাত থেকে তার হাতুড়িটা কেড়ে নিয়ে তার উপর যেখানে সেখানে পেরেক ঠুকতে

লাগল। জেলের উপর উপদ্রব করছে দেখে অধ্যাপক ছেলেটির নিকটে গেলেন এবং শান্ত ভাষণে বল্লেন, "কৈ বৎস, এত চেষ্টাতে একটি পেরেকও তো বসাতে পারলেনা? যদি একটি পেরেক ঐ জেলে ভদ্রলোকের মত কোরে ঠিক ভাবে বসাতে পার তো তোমাকে পুরো নৌকোটা কিনে উপহার দেব।" ছেলেটি শুনে উৎসাহিত হয়ে উঠেপড়ে লাগল হাতুড়ি পেরেক নিয়ে কিন্তু সফল হল না সে। তখন অধ্যাপক জেলেকে বল্লেন: "মহাশয়, পেরেক একটা মেরে দেখিয়ে দিন্‌তো এই বালককে?" জেলে তার এক এক হাতুড়ির আঘাতে একটি ক'রে পেরেক নৌকায় বসিয়ে মেরামৎ করতে লাগল। বালক নিজের শক্তির অক্ষমতা বুঝে স্তম্ভিত হয়ে গেল। অনেক বছর পরে উইলি খবর পেয়েছিলেন যে সেই বালক একজন বড় জাহাজ নির্মাতা হয়েছেন মার্কিন দেশে। সেখানে ছেলেরা উইলিকে Uncle Willy বোলতো।

উইলি ছোটছেলেদের খুব ভালবাসতেন। আশ্রমের অধ্যাপক কালীমোহন ঘোষের দুটি শিশুপুত্র (শোভাময় আর শান্তিময়) ধূলো কাদা মাখা অবস্থায় তাঁর কাছে গেলেই তাদের কোলে নিতেন, আদর করতেন এবং খাদ্য সামগ্রী উপহার দিতেন। আমার কন্যা অতসী এবং পুত্র অতীশ আশ্রমেই জন্মগ্রহণ করে; তাদের দুটিকে তিনি খুবই স্নেহ করতেন। সেই সময় মার্কিন দেশ থেকে Miss Green নামে এক সুশিক্ষিতা ধাত্রী আশ্রমে এসেছিলেন। পুত্র অতীশ যখন জন্মগ্রহণ করে তখন তিনি তার মার সূতিকায় পরিচর্যা করেছিলেন। উইলির সঙ্গে আমার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব দেখে আমায় বলেছিলেন, "তোমার বন্ধু উইলি পিয়ার্সনের নামের গোড়াটা তোমার সদ্যজাত পুত্রের নামের গোড়ায় যোগ করে দিও।" আমি তাই পুত্রের নাম "উইলি অতীশ" রেখেছিলুম। গত মহাযুদ্ধে যোগ দেওয়ার পর সে আজও নিখোঁজ।

রবিদা, পিয়ার্সন, প্রতিমা মামী যখন জাপান থেকে আমেরিকা হয়ে ফেরেন তখন তাঁরা আমার জন্য বহু জাপানী রঙ, তুলি, pencil case আনেন। রবিদা আমাকে কতকগুলি সিল্কের উপর miniature ছবি দেন। সেগুলি দুটি দেবতার ছবি—জাপানী শিল্পীর আঁকা। প্রত্যহ একটি করে এই প্রকার ছবি সেই আর্টিষ্ট আঁকতেন, তাঁর ছিল সেটা পূজা। ছবিগুলি নিখুঁৎ ভাবে আঁকা। রবিদা জার্মানী থেকে আমার জন্যে একটি হোমিওপ্যাথি ওষুধের কেস এনে দিয়েছিলেন। তিনি নিজে হোমিওপ্যাথি ওষুধ আমাদের দিতেন।

উইলি পিয়ার্সন ও এণ্ড্রুজ সাহেব

আমেরিকায় রবিদার বক্তৃতা শুনতে কিরূপ ভিড় হতো এবং লোকে তাঁকে দেখে মুগ্ধ হতো তা' পিয়ার্সনের কাছে শুনেছি। একবার তিনি কালিফোর্নিয়ায় বক্তৃতা দিয়ে মোটরে ফিরছেন—সঙ্গে উইলি আছেন, হঠাৎ একদল মেয়ে মোটর থামিয়ে তাঁকে ফুলের তোড়া দিয়ে তাঁদের দেশের প্রথা মত মুখচুম্বন করেছিল। শুধু গুণে নয় রূপেও তিনি মুগ্ধ করেছিলেন তাদের।

এণ্ড্রুজের কথা। তিনি ছিলেন একটু অন্য ধরণের মানুষ। তাঁর কাজ ছিল আশ্রমে অধ্যাপনা ছাড়াও রাষ্ট্র ক্ষেত্রে গান্ধিজীর সঙ্গে। রবিদার প্রতি তাঁর অশেষ অনুরাগ ছিল। পূর্বেই বলেছি এণ্ড্রুজকে আমরা সবাই শ্রদ্ধা করতুম এবং তাঁর সঙ্গে তাই একটু দূরত্ব রাখা হোতো। রবিদার উপর তাঁর অগাধ ভক্তির পরিচয় আমরা বহুবার পেয়েছি। রবিদা নিজে বলতেন, "আমার রচনা শুনে (অবশ্য ইংরাজী অনুবাদ) এণ্ড্রুজ যেমন আনন্দে অধীর হন, এমন কাউকেই দেখিনি।" আমরা দেখেছি রবিদা তাঁর রচনা পাঠ করে শোনালে, তিনি "Oh, Gurudev! how wonderful বলে তাঁকে তৎক্ষণাৎ আলিঙ্গন করতেন।

এণ্ড্রুজ এত সরল প্রকৃতির ছিলেন যে সব সময় রসিকতা তিনি বুঝতে পারতেন না। আর রবিদার স্বভাবই ছিল বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে রসিকতা করা এবং অন্যের রসিকতা উপভোগ করার। একবার একদিন এণ্ড্রুজ কথায় কথায় কবিকে বল্লেন "গুরুদেব, চল আমরা কাশ্মিরে বেড়িয়ে আসি।" কবি তখুনি তাঁর কথাটাকেই ঘুরিয়ে pun করে বল্লেন "Yes, mere cash that is wanted, Andrews!" তিন দিন গত হলে পর কথাটির মর্ম গ্রহণ করে এণ্ড্রুজ ছুটে এলেন রবিদার কাছে এবং বল্লেন, "Gurudev, how clever you are!" রবিদা কৌতুক করে হেসে বল্লেন, "তুমি যে একটি স্কচ্‌ম্যান তা বোঝা গেছে।" এই প্রসঙ্গে রবিদার একটি সরস রসিকতার কথা মনে পড়্‌ল। একজন সমবয়সী রায়বাহাদুর এলেন একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। বহুদিন পরে রবিদাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, "রবিবাবু, আপনার মাথার চুল পাক্‌লো কি করে?" রবিদা শুনে উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, তা ঠিক, আমার মাথাটা পেকে উঠেছে আর আপনার দেখছি শুধু গোঁফটাই পাকা—মাথা পাক্‌লোনা কেন বলুন তো?" কলপ্‌ লাগানো রায়বাহাদুরের মাথা হেঁট হয়ে গেল।

এণ্ড্রুজ আর্টের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। আমাকে আমার কাজে কলাভবনে বিশেষ উৎসাহ দিতেন। মাঝে মাঝে এসে আমার ছাত্রদের রবার পেনসিল, রঙ প্রভৃতি দিয়ে উৎসাহিত করতেন। জাপানে কোনো প্রসিদ্ধ Porcelain Factoryর শিলমোহর করা পদ্মের আকারের রঙ গোলবার চিনামাটির বাসন উপহার দিয়েছিলেন আমায়—তখন আমি 'কুণালের চক্ষুলাভ' খুব বড় একখানা জলরঙে ছবি আঁকছিলুম আশ্রমে।* এণ্ড্রুজ কলাভবনের জন্য Art magazine, এবং বইও আমাদের তখন তিনি উপহার দিতেন।

ট্রেনে তৃতীয় শ্রেণীতে যাত্রাকালে এ-দেশের সর্বসাধারণের মত খিদে পেলে প্ল্যাটফর্মের ভেনডারদের কাছে হালুয়া-পুরি কিনে খেতেন। একবার বর্দ্ধমান ষ্টেশনে কাটা মাছিবসা তরমুজের ফালি কিনে খেয়ে তাঁর কলেরা হয়। ভগবানের দয়ায় সে যাত্রায় তিনি বেঁচে ওঠেন। রবিদার নিকট শেষে প্রতিশ্রুতি দেন যে কখনো এরূপ প্লাটফর্মের ভেনডারদের কাছ থেকে খাবার কিনে খাবেননা—ষ্টেশনে রেষ্টুরাঁতে গিয়ে খাবেন।

আশ্রমে মহাত্মা গান্ধীর শুভাগমণ

রবিদার সঙ্গে গান্ধীজির সাক্ষাৎ পরিচয় তখনো না থাকলেও প্রত্যক্ষদর্শী এণ্ড্রুজ এবং পিয়ার্সনের মারফৎ তাঁর পরিচয় ঘটে। মহাত্মাজির দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকার কালে তাঁর দেশ-হিতৈষিতা এবং বিরাট স্বার্থত্যাগের বিষয় জেনে রবিদা মুগ্ধ হয়েছিলেন। গুণীর গুণ গ্রহণে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। ছোট শিশুর মধ্যেও যদি কোনো গুণ দেখতেন তাকেও তিনি সম্মান দিতেন। রবিকর যেমন ধরণীর সর্ব রস গ্রহণ করে এবং মেঘবক্ষে ধারণ আর পুনরায় বর্ষণ করে—রবীন্দ্রনাথও সেইরূপই ক্ষমতা রাখতেন রস গ্রহণ ও রচনা বর্ষণের। রবিদার ভিতর মহত্বের সর্বলক্ষণই লক্ষিত হতো—দীনতা ক্ষুদ্রতাকে কখনোই প্রশ্রয় দেননি জীবনে।

রবিদাদার সাদর আহ্বানে মহাত্মা গান্ধীজি সপরিবারে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরে এলেন শান্তিনিকেতনে ১৯১৫ সালে। আশ্রমে তখন গ্রীষ্মাবকাশ চলছে। সোৎসাহে অধ্যাপক সন্তোষ মজুমদার সদলবলে গেলেন বোলপুর ষ্টেশনে গাড়ি নিয়ে তাঁদের আনতে। শাল বীথিকার পথের উপর আমি

* ছবিখানি রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের চিত্র-সংগ্রহে আছে।

কয়েকটি ছাত্রদের নিয়ে আলপনা ও ফুল দিয়ে সাজিয়ে তুললুম তাঁদের অভ্যার্থনার স্থান। রবিদাদার সঙ্গে বিধুশেখর শাস্ত্রী, ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী, জগদানন্দ রায়, কালীমোহন ঘোষ, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি এলেন গান্ধীজিকে আহ্বান করতে। সময়োপযোগী সংস্কৃত শ্লোকে বিধুশেখর মহাত্মাকে স্বাগত সম্ভাষণ নিবেদন করলেন। রবিদা অপূর্ব সুললিত ভাষণে মান-পত্র লিখে তাঁকে অভ্যার্থনা করলেন—প্রথমে দুজনে দুজনাকে আলিঙ্গন করার পর মহাত্মা রবিদাকে 'গুরুদেব' বলে পা ছুঁতে গেলেন—তিনি দিলেন না ছুঁতে। আমার হাতে তখন তৈরী ছিল 'বন্দিনী মাতা' ছবি একটি—সেটি মহাত্মার হাতে দিয়ে তাঁকে নমস্কার করলুম। জীবনে এই এক পরম সৌভাগ্য ঘটল আমার! ছবিখানি তৎকালীন প্রবাসীতে শ্রীমতী কস্তুরবা গান্ধীর সৌজন্যে প্রকাশিত হয়েছিল।

আশ্রমের মধ্যে তখন রবিদাদার বাসস্থান 'নতুন বাঙলা' অত্যন্ত সাধাসিধে এবং মনোরম ছিল। অতিথিশালা গৃহে গান্ধীজি এসে সপরিবারে বাস করলেন। অধ্যাপক সন্তোষ মজুমদার এবং আমার উপর ভার পড়লো অতিথি সেবার। গান্ধীজির আশ্রমিকেরা দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকার কালে যেমন ভাবে দৈনিক উপাসনা, ক্ষেতখামারের কাজ, পড়াশুনা করতেন সেই নিয়মই বজায় রাখলেন তাঁদের। প্রাতে উঠে নিমপাতা বাঁটা চায়ের বদলে পান করতেন, দুপুরে বাজ্রা ও আটা মেলানো হাতে গড়া রুটি, শাক, কলা চিনাবাদাম প্রভৃতি খেতেন। আর রাত্রেও প্রায় ঐ রূপ খাবার ব্যবস্থা ছিল তাঁদের। তাঁর গোষ্ঠির কারু অসুখ করলে রোদে শোয়ানোর ব্যবস্থা হতো—ফোড়া বা হাত পা কেটে গেলে মাটির প্রলেপ দিয়ে রোদে বসাতেন। Nature cure ছিল মহাত্মার চিকিৎসা। রবিদাকেও দেখি দিনকতক তাঁদের প্রথামত প্রাতে কাঁচা নিমপাতার নির্যাস খেতে।

খাদ্যের সংস্কার নিয়ে আশ্রমে তখন পড়ে গেল সাড়া। অধ্যাপক সন্তোষ মজুমদার আমাকেও টানলেন মহাত্মাজির খাদ্য সংস্কারে যোগ দিতে। দু-তিন দিন মাত্র মহাত্মাজিদের দলে ভোজনে যোগ দেবার পর আমার এবং সন্তোষ মজুমদারের যা অবস্থা হয়েছিল তার কথা না বলাই ভাল।

মহাত্মাজি দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে এসে আশ্রমে বাস করার পর রবিদাদা গেলেন জাপান হয়ে আমেরিকায় ১৯১৬তে। মহাত্মাজির উপর ভার দিয়ে

গেলেন আশ্রমের। গান্ধীজির তখন ঐকান্তিক চিন্তা ছিল কী উপায়ে দেশের স্বাধীনতা অর্জন করা যায়। তাই স্বায়ত্তশাসনের জন্যে সবাইকে তৈরী করতে চাইতেন স্বাবলম্বী কোরে। নিজে তিনি ঘর ঝাঁট দেওয়া, কাপড় কাচা থেকে সব কাজ করতেন এবং তাঁর পুত্রদের এবং ছাত্রদের দ্বারাও সেইরূপ করাতেন। রবিদা বিদেশ যাত্রা করার পরই গান্ধীজি তাই উঠে পড়ে লাগলেন আশ্রম সংস্কারের কাজে। প্রথমেই একটি সভা আহ্বান করলেন অধ্যাপক কর্তৃপক্ষদের সংস্কার বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্যে।

আশ্রমে তখন চাকর কেবল রান্নাঘরের জন্যেই ছিল, ছাত্রাবাসে ছাত্রদের ছিল স্বাবলম্বী হয়ে নিজের কাজ করার নিয়ম। প্রতি ছাত্রাবাসে পঞ্চায়তীর 'ইলেকশন্' হতো এবং তাতে যিনি 'কাপ্তান' নির্বাচিত হতেন তাঁর কথা ছাত্রদের সবাইকে শুনতে হোতো; নইলে ছাত্রাবাসের অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে কথাবন্ধ করিয়ে—কিম্বা এক পংক্তিতে খাবার ঘরে বসতে না দিয়ে বা অন্য কোনো প্রকারে অপদস্ত করে তিনি সাজা দিতেন।

মহাত্মাজির সংস্কারে রান্নাঘরের চাকরদের ছাড়ানো হ'ল খাদ্য বিভাগ থেকে। খাদ্যবিভাগ, স্বাস্থ্যবিভাগ এবং পূর্তবিভাগের কাজের বিশেষ বিশেষ অধ্যাপকের অধীনে ছাত্রদের উপর ভার দিয়ে ভাগ করা হলো।

আমার উপর ভার পড়ল রান্নাঘরের তরকারি কোটার তদারকের। অধ্যাপক সুধাকান্ত রায় চৌধুরী হলেন রান্নার ব্যাপারে হর্তাকর্তা। তাঁর একটু ভোজন-বিলাসী বলে ঝোঁক ছিল তাই তিনি রাঁধবার ভার নিলেন। ছেলেদের নিয়ে বঁটিতে তরকারী কুটতুম—আমার মামি (প্রতিমাদেবী) মাসি (মিরা দেবী) বড়মামি (হেমলতা দেবী) বোঠান (কমলা দেবী) এসে যোগ দিতেন। ঝোলের আলু, ঝালের আলু, আর চচ্চড়ির আলু কোটার তফাৎ কি?—শাকের সঙ্গে পটল চলে কিনা ইত্যাদি—সূপকারী বিদ্যার অনেক তথ্য রান্নাঘরের আওতায় এসে প্রথম জানতে পারলুম। যদিও আজ পর্যন্ত রান্না করা আমার দ্বারা আর হলোনা।

তারপর অন্যদিকে স্বাস্থ্যবিভাগে বন্ধুবর উইলি পিয়ার্সন ব্যস্ত রইলেন নোওরা নালা ছাত্রদের দিয়ে এবং নিজের হাতেও পরিষ্কার করা নিয়ে; ল্যাট্রিন ভেঙ্গে ফেলার অপ্রিয় কাজও তাঁকে করতে হলো। গান্ধীজির নিয়মে খেতখানার কোনো প্রয়োজন নেই। বেড়ালরা যেমন বিষ্ঠা মাটি চাপা

দেয়, সেইটি ছিল তাঁর আদর্শ, তিনি আমাদের বুঝিয়ে বলেছিলেন। জমিতে Night soil পড়লে জমি উর্বরা হয় এই ছিল তাঁর বিচার। তাঁর প্রবর্তিত প্রথা মত মাঠে প্রথমে গভীর নালা কাটতে হোতো এবং প্রত্যেক দিন প্রাতে বা সন্ধ্যায় ব্যবহারের পরে মাটি পায়ে করে নালায় ফেলে ভরিয়ে দিতে হোতো। মাসের পর মাস এই নালা ভ'রে গেলে অন্য জমিতে আবার অনুরূপ নালা কেটে খেতখানার কাজ চালাতে হোতো। সমস্ত মাঠ নালায় ভরে গেলে কিছুকাল ফেলে রেখে তার উপর হলকর্ষণ দ্বারা চিনাবাদাম, কপি প্রভৃতি তরিতরকারি লাগাতে হবে। তাতে জমি উর্বরা হওয়ায় ভাল ফল হবে। সর্বাধ্যক্ষ তখন ছিলেন অধ্যাপক জগদানন্দ রায় মহাশয়। এই বিষয়টি নিয়ে মতভেদ ঘটল তাঁর গান্ধীজির সঙ্গে। তিনি তখন রবিদাদার ফেরার প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব হয়ে রইলেন।

আশ্রমে গান্ধীজির সংস্কার ক্ষণস্থায়ী হল। মোটকথা, মহাত্মাজির চরকা কাটা, অত্যন্ত আদিমভাবে জীবন যাত্রার আদর্শ রবিদাদার আশ্রমে কেহই গ্রহণ করতে পারলেন না। রবীন্দ্রনাথের ছিল জন্মগত সাধনা সাত্বিক সৌকুমার্যের, সেখানে আদিম ভাবের কোন স্থান ছিল না—ছিল প্রগতি পন্থা।

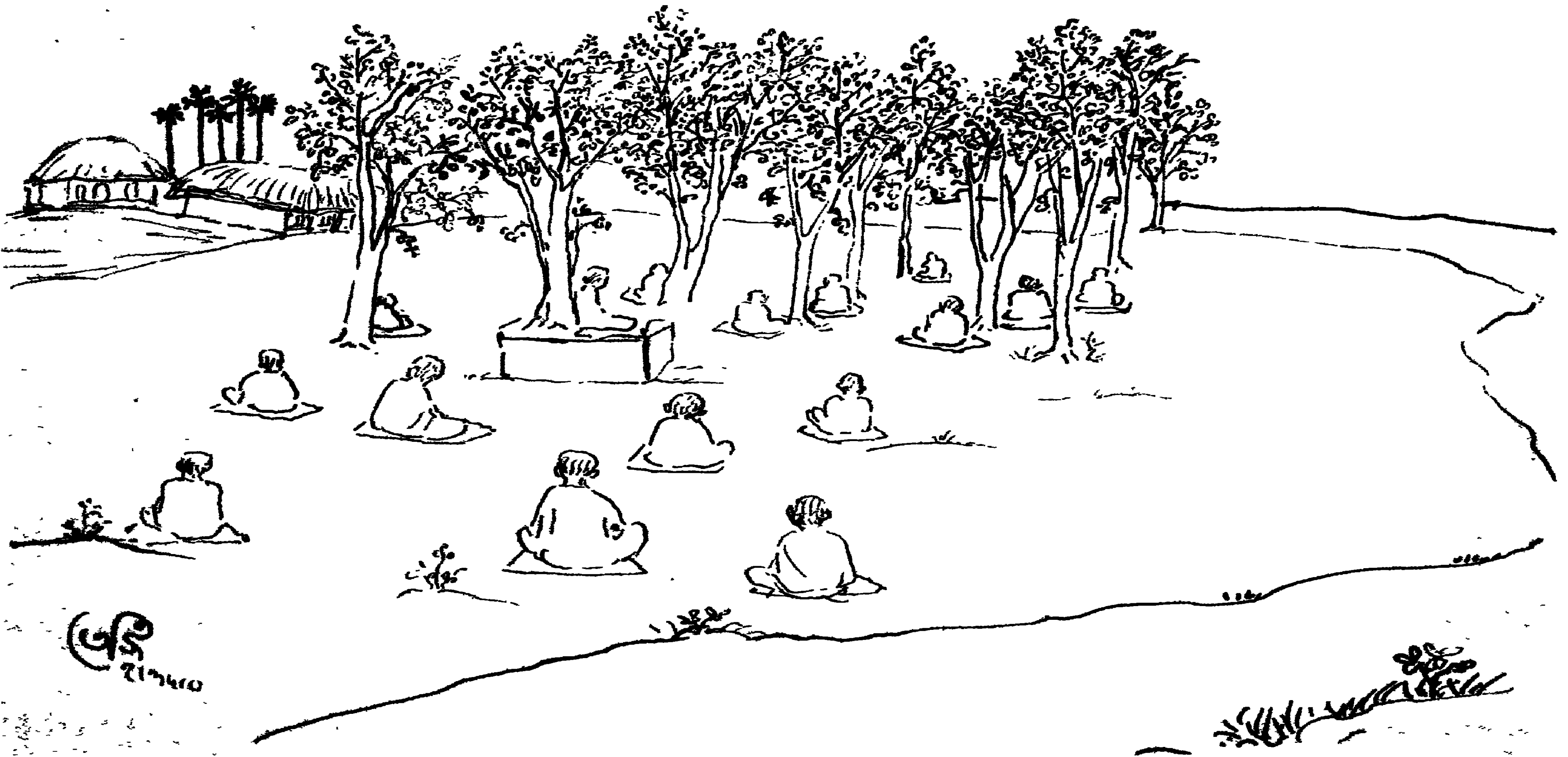
গান্ধীজির ললিতকলার রসবোধ না থাকায় আজ (ভারতবর্ষে তাঁর কংগ্রেসের দলের লোকদের দ্বারা) দেশের আর্টের যে কী দশা হয়েছে তা সহজেই অনুমেয়। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট ললিতকলা আকাদামীর প্রদর্শনীগুলি দেখলেই বোঝা যায় য়ুরোপের তথাকথিত মডার্ণ আর্টই বিশেষ ভাবে দেশে প্রবেশ করানো হচ্চে। অবনীন্দ্রনাথের প্রবর্তিত Renaissance School এর অবশিষ্ট কিছুই রইল না। গান্ধীজি যেমন রবিদাকে মেনে নিয়েছিলেন তেমনি যদি অবনীন্দ্রনাথের ভারত শিল্পের নবজাগরণের (Renaissance) বিষয় তিনি মেনে নিতে পারতেন তবে আজ এরূপ আর্টের দশা হ'তে পারতো না আমাদের দেশে। বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট অবনীন্দ্রনাথের কাজকে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল, কিন্তু এখনকার স্বদেশী গভর্ণমেণ্ট স্বদেশী আর্টের প্রতি আজও আস্থা রাখলেন না। মহাত্মা রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে কৃচ্ছ্র সাধনার উপাশক ছিলেন আর কবি রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সরস্বতীর বরপুত্র, তাই ললিতকলা মাধুর্যের তিনি ছিলেন পূজারী একজন। গান্ধীজির সামনে গেলে শিল্পীদের সেইজন্যেই মৌন থাকতে হতো। মহাত্মাজি নিজে আমাদের বলেচেন, যে

ফুলের গন্ধ বা বিষ্ঠার গন্ধের তফাৎ কি তা তিনি বুঝিতে পারেন না। গানের মধ্যে ভজন ছাড়া তিনি সঙ্গীতের মর্ম জানতেন না। চিত্রকলাও বোঝবার চেষ্টা করেননি তিনি। গান্ধীজির নিকট যখন কখনো দেশের আর্টের কথা উত্থাপন করেছি তখনই তিনি বলেছেন "তার জন্যে অপেক্ষা কর—দেশ স্বাধীন আগে হোক তারপরে দেখা যাবে।"

মহাত্মাজি তারপর আহমেদাবাদে ফিরে গেলেন এবং সাবরমতিতে একটি নিজের আশ্রম করলেন। সাবরমতিতে গিয়ে রবিদাদাকে তিনি লিখেছিলেন আমাকে সেখানে আহ্বান কোরে। আমি তাতে সম্মত হইনি রবিদাকে ছেড়ে তাঁর কাছে থাকার বিষয়। যদি যেতুম তো হয়ত রবিদার নিকট যে অনুপ্রেরণা পেয়েছিলুম তা ধুয়ে মুছে যেতো এবং সরস্বতীর চরণরাগও আমার মনের মধ্যে থেকে চিরদিনের জন্যে মুছে যেতো এবং ঘাড়ে পলিটীক্সের ভূত চাপতো। আহমেদাবাদ থেকে গান্ধীজির পুত্র ও ছাত্রের দল এণ্ড্রুজ ও পিয়ার্সন সহ একযোগে আমাকে একটি সচিত্র পোষ্টকার্ড সই করে পাঠিয়েছিলেন সাবরমতি থেকে। তাতে এণ্ড্রুজ পিয়ার্সন সহ আরো ১৪ জনের সই আছে। তিনজন সই করেছিলেন গুজরাটী ভাষায়, দেবদাস গান্ধী বাঙলা অক্ষরে এবং বাকি সবাই ইংরাজী বা হিন্দীতে সই করেছিলেন তাতে। নাম যতদুর পড়া গেছে, তা' এই:—এণ্ড্রুজ পিয়ার্সনের সইয়ের সঙ্গে আছে, মগনলাল গান্ধী, প্রভুদাস, মগনভাই, কুপ্পাস্বামী, শিবপূজন, পার্থসারথী, দেবদাস গান্ধী, রামদাস-এম-গান্ধী, বালাসুবরইলু, ছোটালাল এবং কে-করণস্বামী। গান্ধীজি যখন আবার তারপর একবার শান্তিনিকেতনে ফিরে এলেন তখন গুজরাট থেকে খাদি কাপড়ে মোড়া কাঠের একটি হ্যাণ্ড ব্যাগ আমার জন্যে এনে দেন। আর সেই সময় দক্ষিণ আফ্রিকাতে তোলা এণ্ড্রুজ পিয়ার্সন সহ তাঁর একটি ফোটোগ্রাফ সই করে আমাকে উপহার দিয়েছেন।

মহাকবি রবীন্দ্রনাথ মহাত্মা গান্ধীকে কিরূপ শ্রদ্ধা করতেন তার নিদর্শন স্বরূপ মহাত্মার শেষ অনশন ব্রত উদ্‌যাপন ব্যাপারে তিনি যা বলেছিলেন তার কিয়দংশ উদ্ধৃত করছি:

"যুগে যুগে দৈবাৎ এই সংসারে মহাপুরুষের আগমণ হয়। সব সময় তাঁদের দেখা পাইনে। যখন পাই সে আমাদের সৌভাগ্য।......যাঁরা



ছাত্রদের উপাসনা।

মহাপুরুষ তাঁরা যখন আসেন আমরা ভালো করে চিনতে পারিনে তাঁদের। কেননা, আমাদের মন ভীরু, অস্বচ্ছ, স্বভাব শিথিল, অভ্যাস দুর্বল।···যাঁরা জ্ঞানী, গুণী, কঠোর তপস্বী তাঁদের বোঝা সহজ নয়, কেননা আমাদের জ্ঞান বুদ্ধি সংস্কার তাঁদের সঙ্গে মেলেনা।

···সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে শোনো তাঁর বাণী। অনুভব করো, কী প্রচণ্ড তাঁর সংকল্পের জোর। আজ তপস্বী উপবাস আরম্ভ করেছেন, দিনের পর দিন অন্ন নেবেন না। তোমরা দেবেনা তাঁকে অন্ন? তাঁর বাণীকে গ্রহণ করাই তাঁর অন্ন, তাই দিয়ে তাঁকে বাঁচাতে হবে। ··· ··· ··· অভিশাপ অনেকদিন থেকে আছে দেশের উপর, সেইজন্যে প্রায়শ্চিত্ত করতে বসেছেন একজন—সেই প্রায়শ্চিত্তে সকলকে মিল্‌তে হবে, সেই মিলনেই আমাদের চিরমিলন সুরু হবে। মৃত্যুর বৃহৎ পাত্রে তাঁর প্রায়শ্চিত্ত, তিনি আমাদের সকলের সামনে ধরলেন, এগিয়ে দিলেন আমাদের হাতের কাছে। গ্রহণ কর সকলে ক্ষালন করো পাপ। মঙ্গল হবে।···আমি কীইবা বলতে পারি, আমার ভাষার জোর কোথায়? তিনি যে ভাষায় বলছেন সে কাণে শোনবার নয়, সে প্রাণে শোনবার—মানুষের সেই চরম ভাষা নিশ্চয় আমাদের অন্তরে পৌঁছবে।

···আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো সৌভাগ্য পর যখন আপনার হয়। সকলের চেয়ে বড় বিপদ, আপন যখন পর হয়। ইচ্ছা করেই যাদের আমরা হারিয়েছি—ইচ্ছা করেই আজ তাদের ফিরে ডাকো, অপরাধের অবসান হোক্, অমঙ্গল দূর হয়ে যাক্। মানুষকে গৌরবদান করে মনুষ্যত্বের সগৌরব অধিকার লাভ করি।”

জহুরীই জহুরীকে চেনে। যুগপ্রবর্তক এই দুই মহাত্মার পরস্পরের প্রতি যে প্রগাঢ় শ্রদ্ধানুরাগ তা বেশ বোঝা যেতো তাঁদের বর্তমানে।

আশ্রমের দু-একটি কথা

এতক্ষণ রবিতীর্থের গুরু-বিষয় বলার পর লঘু ঘটনার কথাও বলি। আশ্রমে তখন বিচিত্র ধরণের লোকেরও সমাগম হতো। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতি প্রাক্তন ছাত্র, প্রতিমা-লক্ষণ (Iconography) বিষয়ে একটি ভাতা পেয়ে বিশ্বভারতীতে এলেন গবেষণা করার জন্য। তিনি ছিলেন স্বল্প-ভাষী, মিষ্ট স্বভাব এবং পরম বৈষ্ণব। আমার সঙ্গে তাঁর বেশ সৌহার্দ্য

ছিল। গ্রীষ্মাবকাশে একদিন তিনি আমায় জানালেন যে বাঙলাদেশের নানাস্থান থেকে বৈষ্ণব পণ্ডিতদের একটি সভায় আহ্বান করবেন শান্তি-নিকেতনে। তখন পিয়ার্সনের তৈরী নতুন দোতলা বাড়িতে ছিল কলাভবন। নীচের তলায় সঙ্গীতের ক্লাস বসতো, উপর তলায় চিত্রবিদ্যালয় ছিল। অবশেষে আমার অনুমতি নিয়ে কলাভবনেই তিনি সভা বসালেন। রবিদাকে বলায় তিনিও এবিষয় কোন আপত্তি করলেন না। ঢাকা, ফরিদপুর, মৈমনসিং, নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর, ভট্টপল্লী, কলকাতা প্রভৃতি স্থান থেকে বহু হেডমাষ্টার, কলেজের অধ্যক্ষ, অধ্যাপকেরাও এলেন সে সভায়। ছুটির দিনে উপর তলায় কলাভবনের একটি ঘরে একলা আমি ছবি আঁকতে বসে গেলুম, মাঝের হলঘরে জমলো বৈষ্ণব সভা।

দূর থেকে আমার কাণে এল—সভার মাঝখান থেকে এক ভদ্রলোক উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে প্রশংসা করচেন অন্য একজনের, "বিশাখা সখির 'মাজা' খুব শক্ত, ধামা নিয়ে 'মোচ্ছবে' একলাই পাঁচশত লোককে পরিবেবণ করেছিলেন" ইত্যাদি। সভাসদগণ সবাই মুক্তকণ্ঠে বিশাখা নামধারী মহাপুরুষটিকে মহানন্দে অভিনন্দিত করলেন। এইভাবে তাঁরা পরস্পরের গুণগান ঘোষণা করার পর এল তাঁদের সম্মুখে এক সমস্যা, কি উপায়ে বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার-ব্রত গ্রহণ করতে হবে ? নবতরভাবে ধর্ম প্রচার না করলে বৈষ্ণবধর্ম শীঘ্রই উচ্ছন্নয় যাবে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নামও এখন আর কেহই করে না। এই প্রকার প্রস্তাব সভায় উত্থাপিত হওয়ার পর কিছুক্ষণ ধরে সবাই মৌন ও চিন্তিত রইলেন। হঠাৎ একজন মৌন ভঙ্গ করে বলে উঠলেন : "তা' বৈষ্ণব ধর্ম নিয়ে হ্যাণ্ডবিল পোষ্টার ছেপে বিতরণ করে বা যাত্রা গাওনা করেও তো কাজ হয় ?" অন্য একজন সভ্য মিষ্ট ভাষণে প্রতিবাদ করে বল্লেন, "না না—ওতে হবে না ; সিনেমা করতে হবে শ্রীভগবানের লীলাগুলি নিয়ে।" তখন সেই প্রস্তাব সমর্থিত হল এবং বৃন্দাবনেই ছবির সুটীং নেওয়া হবে স্থির হ'ল। তার বিরুদ্ধে মাত্র একটি সভ্য তখন বলে উঠ্‌লেন শান্তভাবে : "বৃন্দাবনের কদম্বগুলি বড় ছোট, ফটোতে সিনেমার রজতপটে সেগুলি হয়তো ভাল আসবেনা। শুনে সবাই দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার মৌন হয়ে ভাবতে লাগলেন। ধ্যানভঙ্গ করে অতঃপর সরু চিঁ চিঁ করা গলায় একজন ভদ্রলোক বলে উঠ্‌লেন, "বেশতো, হোগ্‌গেনা ? নাহয় এবার ছোট কদম্বেই বৃন্দাবন লীলা হোলো—ক্ষতি কি ?"

ব্যাপারটা এইখানেই শেষ হয়নি। তার অব্যবহিত পরেই যখন রবিদাদার সঙ্গে ট্রেনে কলকাতা যাচ্ছি আশ্রম থেকে, বর্দ্ধমান ষ্টেসনে ট্রেন বদল করার কালে দেখি সেই শিক্ষার্থী পণ্ডিত একটি ছাতা বগলে নিয়ে বই হাতে আমার নিকট এসে দাঁড়ালেন। সমীহভরে আমায় চুপি চুপি তিনি বল্লেন, "অসিতবাবু, গুরুদেবকে এই বইখানি দেব বলেই বোলপুর থেকে ট্রেনে এতদূর এসেচি আপনাদের অনুসরণ করে। এখন দয়া করে গুরুদেবের হাতে এই বইখানি দিন্ এবং তাঁর অভিমত আমায় জানান্।" আমি অবাক হয়ে গেলুম তাঁর ব্যবহারে এবং রবিদাকে বর্দ্ধমান প্ল্যাটফর্মেই বইখানি দিলুম। বইটির মুখপত্রে বাঁশরী হাতে রাধাবেশে তাঁর বৈষ্ণবগুরুর ফটোগ্রাফ—অপূর্ব ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমায় উজ্জ্বল। রবিদাদা বইয়ের পাতা উল্টেপাল্টে দেখে স্মিত মুখে ধীরে ধীরে আমায় বল্লেন, "পাগল রে পাগল; বোলেদে, আমার খুব ভাল লেগেছে।" শিক্ষার্থী ভদ্রলোককে রবিদাদার ভাল লেগেছে বলায় তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁকে প্রণাম করে বর্দ্ধমান থেকে বোলপুর ট্রেনে ফিরে গেলেন, আমরাও বর্দ্ধমান ষ্টেশনে মেল ট্রেন ধরে কলকাতায় গেলুম।

এই ধরণের আশ্রমে আগত তখনকার দেশবিদেশের লোকের কথা লিখতে গেলে মহাভারতে পরিণত হবে। এক য়ুরোপ থেকে উদ্‌ভ্রান্ত চিত্রকর এলেন, তিনি ডচ্। ইংরাজী ভাষা বেশী কিছু জানতেননা। দো-ভাষায় তাঁদের দেশের একটি বই দেখে দেখে অতিকষ্টে ইংরাজীতে আমাদের বোঝাতেন। তিনি ছবি আঁকতেন কাঁচের উপর তেল রঙে (Oil painting)। তাঁর বিশেষত্ব ছিল, তিনি প্রত্যেক লোককে কাউকে লাল, কাউকে নীল, কাউকে বা সবুজ এইভাবে দেখতেন এবং সেইমত রঙ দিয়েই চেহারাগুলি আঁকতেন। রবিদাকে এঁকেছিলেন সবুজ রঙে। শিল্পী বলতেন, "প্রত্যেক মানুষ এক একটি বিশেষ রঙ বহন করেন এবং মানস চক্ষেই তার সেই রঙ দেখতে পাওয়া যায়।" শিল্পী খেতেন কেবল আলু সিদ্ধ আর ডিম।

রবিদাদাকে এইরূপ বহু বিচিত্র লোকের সংসর্গে আসতে হোতো। দর্শন-অভিলাষিদের ভিড়ও কম ছিলনা।

একবার ট্রেনে তাঁকে একটা বিশ্রী উপদ্রব ভোগ করতে হয়েছিল—তা বিস্মৃত হয়ে যাবারই যোগ্য ঘটনা। তবুও বলছি। ২৫শে চৈত্র ১৯২০-তে রবিদার সঙ্গে যাচ্ছিলুম বোলপুর থেকে কলকাতা ট্রেনে। রবিদা ট্রেনের

কামরায় বসে গান রচনা করলেন : "আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে, দেখতে আমি পাইনি··· ··· ··· ··· ।" গান রচনা করে গাওয়া হয়ে গেলে আমায় বললেন টিফিন বাক্সটা বার করতে। আমি সিটের নিচে থেকে বাক্স বার করে তাঁকে দিতে যাব—অমনি একটা বিশ্রী কাণ্ড ঘটল—চলন্ত ট্রেনের বাইরে থেকে কে একজন একতাল গোবর ছুড়ে ফেল্‌লে আমাদের কামরায়। রবিদা কাপড় ছেড়ে চানের কামরা থেকে এসে বল্লেন, "দেখচিস্ তো, দেশের লোকের কাছে আমি এইরকম আদরই পেয়ে থাকি।"

পূর্বেই বলেছি—রবিদার গানের প্রেরণার কথা—কখন যে কিভাবে আসতো তা বলা যেতো না। সেই বছরেই চৈত্র মাসে আকস্মিক ঝড় এল ঘূর্ণি বাতাসে আশ্রমের শুকনো পাতা উড়িয়ে—রবিদার গান বেরুলো : "আমায় বাঁধবে যদি কাজের ডোরে, কেন পাগল কর এমন করে ? ··· ··· ··· ।"

সেদিন দিনুদা ছিলেননা আশ্রমে—তাঁর গানের সুর কে মনে সঞ্চয় করে ধরে রাখবে ? অজিত চক্রবর্তী আর আমি দুজনা মিলে শিখলুম এবং দিনুদা আসার পর সেই গানের সদগতি হ'ল। আজ ভাবি 'টেপ রেকর্ডার' যদি তখন আবিষ্কৃত হতো ত রবিদার শ্রীমুখের গান আজও আমরা শুনতে পেতুম।

তাঁর গান রচনার আর একটি ঘটনা এখানে বলি। আশ্রমে ক্রমশঃ ছাত্র, অধ্যাপক এবং দেশবিদেশের নবাগত অতিথি সংখ্যা এত বেড়ে গেল যে Wind-mill-pump-এ কুয়োর জলে আর কুলোতো না। অমূল্যবাবু এনজিনিয়ার এলেন পাতালপানি (Tubewell) খননের একজন বিশেষজ্ঞ। ৫।৬ শত ফুট নল মাটির বুকে গেড়েও জল আনতে পারলেন না, যদিও দ্বাপরে অর্জ্জুন ভীষ্ম পিতামহের শর-সজ্জায় শয়ান কালে গাণ্ডিবের একটি শরাঘাতে পাতালপানি গঙ্গাকে তাঁর মুখে ঢেলে দিতে পেরেছিলেন। নল মাটিতে গাড়ার pulley তে কুলিরা ছাড়াও আশ্রমের ছাত্ররা এমনকি স্বয়ং গুরুদেবও হাত লাগালেন উৎসাহ দেবার জন্যে। গান একটি বাঁধলেন : "তৃষ্ণার জল এস এসহে—কল কল, ছল ছল ; হাঁকিছে অশান্ত বায়ু—আয় আয় আয়—সে তোমারে ফিরে চায়··· ··· ··· ··· ।" রবিদার তখনকার কালের প্রত্যেক রচনা পাঠ করলে তাঁর সঙ্গে থাকার বহু স্মৃতি মনে জেগে ওঠে আজও। আশ্রমের সর্বত্র তখন রবিদার



নিজের দৃষ্টি থাকতো এবং এখনকার মত up to date ছাত্রাবাসগুলি না হলেও তখনকার খোড়োচালার dormitoryগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিল। আশ্রমে জীব-হিংসা করা বারণ ছিল—সাপ পর্যন্ত মারা নিষেধ ছিল। রবিদাদার ব্যক্তিত্ব ও ঔদার্যের গুণে সবাই মুগ্ধ থাকতো—দ্বেষ হিংসা তাই চাপা ছিল। শান্তিনিকেতন তখন ছিল আনন্দ নিকেতন।

রবিদাদার গয়া ও এলাহাবাদ যাত্রা

১৯১৪ আশ্বিন মাসের কথা। রবিদাদার সঙ্গে গয়া হয়ে এলাহাবাদ গিয়েছিলুম আমরা। সঙ্গে ছিলেন রবিদার আর এক নাতি তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়। হেমলতা দেবী (বড় মামী) মীরা দেবী (রবিদার ছোট কন্যা), রবিদাদার জামাতা নগেন গাঙ্গুলী আর সাহিত্যিক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখার সঙ্গে রবিদাদার সর্বপ্রথম কিভাবে পরিচয় ঘটে তার কথা এখন বলি। আমরা যখন বোলপুর ষ্টেশন থেকে ট্রেনে গয়ায় রওনা হলুম তখন শরৎবাবুর লেখা 'পণ্ডিতমশাই' বইখানি চারুবাবু দিলেন রবিদাদাকে পড়তে। বইখানা পড়া হবার পর রবিদা আমাদের উল্লসিত হয়ে বল্লেন, "বাঙলা সাহিত্যে এত ভাল গল্প এর আগে কখনো পড়েছি বোলে আমার মনে পড়েনা। —এই শরৎ চাটুয্যে লোকটি কে?" আমরা তখন শরৎবাবুর বিষয় সকল কথা তাঁকে বল্লুম এবং ভবিষ্যতে কবির সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেবেন বল্লেন বন্ধুবর চারু বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপর শরৎবাবুর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বন্ধুত্বের কথা সকলেই বিদিত আছেন।

রবিদাদা গয়ায় তিনদিন থাকার কালে মোট দশটি গান রচনা করেছিলেন সেখানে। বুদ্ধগয়ার পাণ্ডারাজার প্রাসাদে আমরা অতিথি ছিলাম। সেখানকার নিরামিশ রান্না রবিদার এত পছন্দ হল যে একটি রাঁধুনি সংগ্রহ করলেন আশ্রমের জন্য সেখান থেকে। বুদ্ধের চরণ-রেণু-পবিত্র বুদ্ধগয়ায় রবিদার মত মহাকবির সঙ্গে তিনদিন বাস করেছি এই কথা মনে হলেও কত আনন্দ হয় আজ।

রবিতীর্থে

গয়ায় রবিদাদার পুরোনো বন্ধু ঔপন্যাসিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল আমাদের। তাঁর এক বন্ধু স্থির করলেন গয়ার নিকটবর্তী 'বেলা' ষ্টেশনের কাছে আজীবক সাধুদের জন্যে অশোকের তৈরী বিখ্যাত 'বরাবর' গুহাগুলি তিনি রবিদাকে এবং আমাদের দেখাবেন। রবিদাদার চেয়ে আমাদেরই তাতে উৎসাহ ছিল আরো বেশী। বরাবরের কথা বরাবর আমাদের মনে থাকবে। প্রথমেই আমাদের গয়া ষ্টেশনে রাত্র সাড়ে চারটায় ট্রেন ধরতে হয়েছিল। ট্রেন যাতে ফেল না করি রবিদাই আমাদের যথাসময়ে জাগিয়ে দেন। 'বেলা' ষ্টেশনে ভোর বেলা গয়া থেকে পৌঁছে দেখা গেল যিনি রবিদার এই অভিযানের উদ্যোগী তাঁর দেখাই নেই সেখানে। তাঁর এই গাফিলতির ফলে রবিদাদা এবং তাঁর দলের সবাইকার দুর্দশার সীমা ছিল না। সকাল থেকে সমস্ত দিন নাওয়া-খাওয়া সবই ঘুচে গেল। আমরা গণ্ডগ্রামের একটি দোকানে ফুলুরি-কচুরি-কলা-দই যা' পেলুম তাই দিয়েই উদরপূর্তি করলুম। রবিদার জন্যে ষ্টেশন ওয়েটিংরুমে কলা কিনে নিয়ে গেলুম। আমাদের দুর্দশার কারণ প্রথমতঃ হল 'বেলা' ষ্টেশনে যেতে রাত জেগে ট্রেন ধরা, দ্বিতীয়তঃ প্রযোজকের প্ররোচনায় খাদ্য সামগ্রী আমরা সঙ্গে না নেওয়ায় এবং তৃতীয়তঃ হাতি, পাল্কি যানবাহনের ব্যবস্থা বেলা ষ্টেশনে যথা সময় না হওয়ায়—ঘটেছিল এই বিপদ।

বেলা ষ্টেশনেই আমাদের বেলা পড়ে গেল—সমস্ত সকাল ও দুপুর অতিবাহিত করার পর বিকেলের দিকে এল একটা বিরাট দাঁতওয়ালা হাতি প্রযোজকের এক বন্ধু রাজার কাছ থেকে, আর রবিদার জন্যে পাল্‌কি তখনো এসে পৌঁছায়নি। রবিদা এতক্ষণ আমাদের কাছে সুখ ও দুঃখের বিষয় দার্শনিক আলোচনার দ্বারা আমাদের শারীরীক ও মানসিক দুঃখ ভোলাবার চেষ্টা করছিলেন। ওয়েটীংরুমের ইজিচেয়ারে বসে গান বাঁধলেন :

"পান্থ তুমি পান্থজনের সখাহে
পথে চলাই সেই তো তোমায় পাওয়া···।"

আমরা পালা করে হাতির পিঠে চড়ে কতকটা পথ হেঁটে অগ্রসর হলুম বরাবর গুহার দিকে। ১০।১২ মাইল পথ অতিক্রম করলুম আমরা। এসে পড়লুম একটি পাহাড়ের কাছে, যেন কালো ঐরাবতের পাল শুঁতোগুঁতি

করছে এমনি দেখতে। পথের কোনো চিহ্নই নেই বরাবর পাহাড়টির গুহা মন্দিরে যাবার।

এই সময় চারু বন্দ্যোপাধ্যায় দাড়ি রাখার পরিহাসের একটি ঘটনা যা ঘটলো তা' তাঁরই ভাষায় তুলে দিচ্ছি ('লোক সেবক' বার্ষিকী সংখ্যা ১৩৬০-এ বেরিয়েছিল)।

"সেবার আমি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গয়া থেকে বরাবর পাহাড়ে বৌদ্ধ যুগের গুহা দেখতে গিয়েছি। আমরা কয়েকজন আগে গিয়ে পাহাড়ের কাছে পৌঁছেছি। রবীন্দ্রনাথের পাল্‌কি তখনো এসে পৌছয়নি। তাঁর আসতে বিলম্ব হচ্ছে দেখে আমরা অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। বেলা পড়ে আস্‌ছে। পাহাড়ের উপরে যা কিছু দ্রষ্টব্য আছে নীচে থেকে তার কোনও আভাসই পাওয়া যাচ্ছে না। রৌদ্রে পাহাড়ের উপরে ওঠা একটুও লাভজনক হবে কিনা, এই ভেবে আমরা ইতস্ততঃ করছি। এমন সময় একজন মুসলমান পাহাড়ের উপর থেকে নেবে এলো। সে যখন আমাদের আশ্রয়-তরুর কাছে এলো তখন আমি তাকে আমার ভাঙা উর্দুতে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম—"এ জী, পাহাড়কা উপর দেখনেকো কাবিল কুছ হৈ?" সে চট্‌করে আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে আমাকে দেখে নিয়ে বল্লে—"উহা আপ্‌ক্যা দেখিয়েগা? উহা হিন্দুয়োঁকা মন্দিল্‌ হৈ।"

তারপর সে আমার সঙ্গী বন্ধুদের দাড়ি-হীন মুখ দেখে বল্‌লে—"ইন লোগ্‌ উত্ত দেখনে যা সেকৃতা হৈ। লেকিন্‌ আপ উসকো ক্যা দেখিয়েগা। আপ ইধর্‌ যাইয়ে, মস্‌জেদ্‌ হৈ, দরগা হৈ··· ···।" আমি গম্ভীর ভাবে বল্‌লাম—"বেশক্‌।"

রবিদার পৌঁছনোর দেরী দেখে আমরা মুসলিম লোকটিকে নিয়ে অশোকের তৈরী আজীবক সাধুদের গুহাহর্ম দেখে এলুম পাহাড়ের উপরে চড়ে। যখন আমরা পাহাড়ের নীচে আশ্রয়-তরু (পাকুড় গাছের) তলে এসে পৌঁছেছি তখন রবিদার পাল্‌কি এসে পৌঁছল। বেশ বেলা পড়ে গেছে তখন। রবিদা আমাদের নিয়ে 'বেলা' ষ্টেশনে ফিরলেন। বরাবরে যাতায়াতের পথে পাল্‌কিতে বসে "জীবন আমার যে অমৃত আপন মাঝে গোপন রাখে; প্রতিদিনের আড়াল ভেঙে কবে আমি দেখবো তাকে? ··· ··· ···।" আর "সুখের মাঝে তোমায়

দেখেছি—দুঃখে তোমায় পেয়েছি প্রাণ ভরে ... ... ” দুটি গান রচনা করলেন কবি।

বরাবর গুহা দেখতে মেয়েরা কেহই আসেননি গয়া থেকে। আমরা বেলা ষ্টেশন থেকে গয়ায় ফিরে যাবার পর স্থানীয় একজন বাঙালী জজ রবিদাদাকে সদলবলে নিমন্ত্রন করলেন তাঁর বাড়ীতে মধ্যাহ্ন ভোজনে। খাওয়া দাওয়ার অন্তে জজসাহেব অনুরোধ করলেন রবিদাদাকে গান শোনাবার জন্যে। তাঁর গোলকামরায় টেবিল-হারমোনিয়মে রবিদা গীতাঞ্জলির একটি গান গাইলেন “ঐ আসন তলের মাটির পরে লুটিয়ে রব ... ... ।” তার পরিবর্তে জজসাহেব উৎসাহের ভরে তাঁর শিশুকন্যাকে গান গেয়ে শোনাতে বল্লেন কবিকে। সে গাইল একটি থিয়েটারী সঙ্গীত “লেও সখি দেও ভর পেয়ালা পিলাও দারু ফিন্।” জজসাহেব কবির সাম্‌নে মেয়েকে দিয়ে এইপ্রকার গান গাইয়ে যে কি অদ্ভুৎ কাণ্ড করলেন তা বোধহয় তিনি জীবনে অনুভব করতে পারেননি।

রবিদা জজসাহেবের বাড়ী থেকে গাড়ীতে বসেই আমাদের বল্লেন, “কাণ্ড দেখেছো? ভাল দুটো কথা আছে এমন রামপ্রসাদী বা বাউলওতো শেখাতে পারতেন শিশু মেয়েটিকে?” মেয়েটি ৮।৯ বৎসরের এবং বেশ সুশ্রী তাই কবি আকৃষ্ট হয়েছিলেন তার প্রতি। গাড়ীতে চারুকে এবং আমাকে বল্লেন, “দেশের মেয়েকে বিদেশে দেখে খুব ভাল লাগল—আদর করতে ইচ্ছা করছিল।” তারপর তাঁর লেখা দুই বিঘা জমি কবিতার “নম নম নম সুন্দরী মম জননী জন্মভূমি” অংশটা আবৃত্তি করলেন নিজের মনে। তাঁর স্মরণ শক্তি ছিল অপূর্ব। ছেলেবেলায় আমাদের কাছে বাল্মীকি রামায়ণের গঙ্গাবতরণের শ্লোকাংশ, মেঘদূতের কবিতা এবং স্বরচিত বহু কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতেন। তারপর বন্ধুবর চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর রচিত ‘যমুনা পুলিনে ভিখারিণী’ বইটির বিষয় নিয়ে সরস রসিকতা করলেন এবং বইখানির বিষয় তাঁর বক্তব্য বলতে বলতে গাড়ীতে ফিরলেন যথাস্থানে।

এরপর গয়া থেকে রবিদা রওনা হলেন এলাহাবাদ। আমি আর চারু বন্দ্যোপাধ্যায় উঠলাম ইণ্ডিয়ান প্রেসের মালিক চিন্তামণি ঘোষ মহাশয়ের বাড়ি অতিথি হয়ে। তাঁদের সেই প্রেস ও বাড়ি এখন এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতার অন্তর্গত। রবিদা গেলেন আত্মীয় ব্যারিষ্টার প্যারিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে জর্জটাউনে। সেখানে বসে ‘বলাকা’ বইখানির জন্য “তুমি কি কেবল

ছবি, শুধু পটে লিখা? ... ..."একথা জানিতে তুমি ভারত ঈশ্বর সা-জাহান; কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধনমান।" ... ... " হে বিরাট নদী, অদৃশ্য নিঃশব্দ তব জল—অবিচ্ছিন্ন অবিরল চলে নিরবধি" ... ... "কে তোমারে দিল প্রাণ---রে পাষাণ?" —এইসব কবিতাগুলি লিখলেন কবি তাঁর ঝরণা কলমে ঝরণা ধারার মত সাবলীল গতিতে।

অবশেষে এলাহাবাদে তাঁর 'গীতালি' গানের বইয়ের শেষের নয়টি গান তিনি তিনদিনে লিখে শেষকরে ছাপাতে দিলেন চিন্তামণি বাবুকে ইণ্ডিয়ান প্রেসে। গীতালি পাঁচদিনের মধ্যে নিভু́ল ছেপে দিলেন চিন্তামণিবাবু। গীতালির মলাটের কাগজ প্রভৃতি আমি আর বন্ধুবর চারুবাবু দেখে দিয়েছিলুম ছাপার কালে। এবিষয় রবিদা আমাদের উপর ভার দিয়েছিলেন। তখন রবিদার সব বই প্রকাশ করতেন চিন্তামণিবাবু ইণ্ডিয়ান প্রেস এলাহাবাদ থেকে। পরে বিশ্বভারতীর প্রেসের ব্যবস্থা হলে শান্তিনিকেতন থেকেই ছাপা হতো। রবিদাদার নিয়ম ছিল আত্মীয়দের মধ্যে যদি কেহ তাঁকে তাঁর কাব্য লেখার উপযোগী খাতা এনে দিতেন তো বই ছাপার পর পাণ্ডুলিপি তার প্রাপ্য হতো। 'গীতালি' আমার দেওয়া খাতায় লেখা। সাদা চামড়ার পার্চমেণ্টের মলাটে পদ্ম এঁকে দিয়েছিলুম। সেটি রথীমামা রবীন্দ্র-গ্রন্থ সংগ্রহে জমা রেখে দিয়েছিলেন আমার কাছ থেকে নিয়ে।

গীতালি ছাপার কালে প্রেসে রাত্রেও কাজ চলেছিল। প্রেসের কর্মচারীদের নিকট এবং নয়ন পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট চিন্তামণিবাবুর সততার বিষয় বহু গল্প শুনলুম। পূজার 'বোনাস্'—ছেলেমেয়ের বিবাহে কর্মচারীদের অর্থদান—ব্যাধি চিকিৎসার ব্যবস্থা প্রভৃতির বিষয় আমরা জানতে পারলুম। চিন্তামণিবাবু সদাশয় কর্মযোগী পুরুষ ছিলেন। ইণ্ডিয়ান প্রেসে ১০ খণ্ডে রবিদা তাঁর কাব্য গ্রন্থাবলী ছাপিয়েছিলেন। কবির হাতে আমার নাম লেখা গ্রন্থাবলী আমাকে যা উপহার দিয়েছিলেন তা সযত্নে গ্রন্থাগারে রাখা আছে। তিনি বরাবর বাবামাকে তাঁর কাব্য ছাপা হলেই পাঠাতেন। তখনকার টাকি এডিশনের গ্রন্থাবলী পিতার গ্রন্থাগারে আছে।

আশ্রমের অধ্যাপকগণ

এইবার আশ্রমের অধ্যাপকগণের বিষয় বলব। দেশীবিদেশী অধ্যাপকদের মধ্যে সর্বাধ্যক্ষ জগদানন্দ রায় মহাশয়ের কথাই সর্বাগ্রে বলা যাক্। দীর্ঘনাসা

প্রশস্ত ললাট—পাতলাচাপা ঠোঁট—উজ্জ্বল চক্ষু শ্যামবর্ণ ওজস্বী চেহারা ছিল তাঁর। অঙ্কশাস্ত্র এবং বিজ্ঞান এই দুই গভীর বিষয় নিয়ে তাঁর ছিল অধ্যাপনা। তাঁর লেখা ছেলেদের বিজ্ঞান বিষয় পুস্তক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল কলেজে তখন পাঠ্য ছিল। তিনি ছিলেন খুব রসিক ব্যক্তি এবং শিক্ষার্থীর পক্ষে নির্মম নিয়ম-নিয়ন্ত্রক শিক্ষক। আশ্রমের শৃঙ্খলা তাঁরই জন্যে সর্বদা রক্ষিত হতো। অঙ্কশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ পরীক্ষাসন্ত্রস্ত ছাত্রেরা তাঁর দ্বারা ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার সাগর পার হতে পারত সহজেই। আশ্রমের সকল গুরুতর বিষয়ে রবিদা তাঁর পরামর্শ নিতেন। তিনি বন্ধুবৎসল, দরাজ, হৃদয়বান ব্যক্তি ছিলেন।

পণ্ডিত বিধুশেখর ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী মহাশয় ছিলেন যৈন ও বৌদ্ধ দর্শনের যশস্বী পণ্ডিত। সর্বদা শাস্ত্র পাঠে মগ্ন থাকতেন। দেশে আমিষ আহার বন্ধ করার পণ করেছিলেন এবং নিজে স্বপাক হবিষ্যান্ন ভোজন করতেন। দেশের লোক মাছ মাংস খাওয়া ছাড়চেনা বলে দুঃখ করতেন। তিনি একদিন হঠাৎ তাঁর নিরবচ্ছিন্ন শাস্ত্রপাঠ থেকে বেরিয়ে এসে জগদানন্দবাবু, ক্ষিতিমোহন সেন প্রভৃতি অধ্যাপকদের মজলিসে এলেন। নানাকথা আলোচনার মধ্যে তাঁর প্রিয় টপিক্স আরম্ভ করলেন—মাছমাংস খাওয়া মৃতদেহ ভক্ষণ, এই কথা—হিংসাবৃত্তি ছাড়া আর কিছু নয় ইত্যাদি। আশ্রমে তখন মাছ, মাংস, ডিম খাওয়া নিসিদ্ধ ছিল। আহার সৌখীন জগদানন্দবাবু শাস্ত্রীমহাশয়ের কথা শুনে হাসতে লাগলেন। আমি তখন কথা তুললুম বৌদ্ধদের আমিষ খাওয়ার কোনো তাদের বারণ নেই। শুনে শাস্ত্রী মহাশয় বল্লেন "হাঁা বারণ আছে, যদি নিমন্ত্রিত ব্যক্তি জানতে পারেন যে বিশেষভাবে তাঁর জন্যে জীবহিংসা করা হয়েছে খাওয়াবার জন্যে।" জগদানন্দবাবু সকৌতুকে হেসে বল্লেন " তা' বেশ কথা, অসিতবাবু, হোটেলে গিয়ে খেতে পারা যাবে—কি বলেন ? কারু জন্যে বিশেষ ভাবে ত মাংস রাঁধেনা সেখানে ?" বিধুশেখর প্রাচীন ঋষিদের মত খড়ম্ পায়ে খালি গায়ে থাকতেন সারা বৎসর। বৃটিশ গভর্মেণ্ট তাঁকে মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি পরে আশ্রম ছেড়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হন। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার তাঁর প্রতি যে সম্মান দেখিয়েছেন তা সকলেই বিদিত আছেন।

অধ্যাপক হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন একজন আভিধানিক পণ্ডিত। সারাজীবন ধরে একটি বাঙলা শব্দকোষ তৈরী করেন। বৃদ্ধবয়সে রাজা

মণিন্দ্রচন্দ্র নন্দীর সৌজন্যে তা প্রকাশ করেন। তাঁকে ঘরের বাইরে কোথাও দেখা যেতো না। লাইব্রেরীর একটি প্রকোষ্ঠে গ্রন্থাবলীর মধ্যে অভিধান রচনায় নিরত থাকতেন।

নেপালচন্দ্র রায় ছিলেন পুরোনো কালের 'মাষ্টার মশাই'। বয়সে সকলের চেয়ে ছিলেন বড়। তাঁর গতিবিধি ছিল সর্বত্র—সরল-সরস হাসি তাঁর সর্বদাই সকলে উপভোগ করতেন। তিনি ছিলেন গল্পের রাজা। গ্রামবৃদ্ধেরা যেমন সেকালের গল্প বলেন; এঁর মুখেও লখনউ-এর ওয়াজেদ্ আলি শা, আসফ্-উদ্দৌলাহ্ প্রভৃতির কথা শুনতুম আমরা। এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান প্রেসের মালিক চিন্তামণি ঘোষ মহাশয় অল্প বয়সে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় নিস্বঃ অবস্থায় একলা কিভাবে একটি ছোট হ্যাণ্ডপ্রেস কিনে কঠোর পরিশ্রমে কাজ করে ক্রমশ বিরাট প্রেসে পরিণত করেছিলেন তার সকল কথা তিনি আমাদের বলেছিলেন। প্রবাসী প্রথমে এলাহাবাদ-প্রবাস থেকে ইণ্ডিয়ান প্রেসেই ছাপা হয়ে বেরিয়েছিল। মাষ্টার মশাই আমাকে সাক্ষাৎ হলেই Brother artist বলতেন স্মিতোজ্জ্বল মুখে।

অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী ছিলেন আমাদের অতি প্রিয় বন্ধু। আমরা সবাই তাঁর প্রত্যক্ষদর্শী অভিজ্ঞ জ্ঞানবৃদ্ধ ভাব দেখেই 'ঠাকুর্দা' বলতুম, যদিও বয়সে তেমন কিছু বড় ছিলেন না তিনি অন্যান্য শিক্ষকদের চেয়ে। তিনি আমার ছিলেন নিত্যসাথী সান্ধ্যভ্রমণের। পদযাত্রায় দেশভ্রমণ তাঁর একটি নেশা ছিল। আশ্রম থেকে দূরে নান্নুর, কেঁদুলে প্রভৃতি বৈষ্ণবদের পীঠস্থান গোজানে এবং হেঁটে 'ঠাকুর্দার' সঙ্গে আমরা গেছি।* সেখানকার পোড়ো ভাঙ্গা মন্দিরের ইটের মূর্তি (Terracotta) সংগ্রহ করেছিলুম কলাভবনের জন্যে। এইভাবে কলাভবনের যাদুঘরের গোড়াপত্তন আমি করেছিলুম কিছু কিছু সংগ্রহের দ্বারা। দাদু, কবীর, সুরদাস, তুলসীদাস প্রভৃতি প্রাচীন কবিদের দোঁহা তিনি পায়ে হেঁটে নানা দেশ থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। আমাদের সব সময় শোনাতেন সেই সব শ্লোক গাথা। তাঁর সংগ্রহ থেকে রবিদাদা কবীরের দোঁহার ইংরাজি অনুবাদ করেছিলেন অধ্যাপক Evelyn Underhill-এর

*শারদীয় আনন্দবাজার ১৩৫৩ পত্রিকায় ক্ষিতিমোহনবাবু বাউল উৎসব প্রবন্ধে ১৯১০।১১ সনে কেন্দুলিতে যাবার বৃত্তান্ত লিখেছিলেন পর্যন্ত সেইদিন যে আমিও ছিলুম সে কথা তার এখন মনে নেই তা বেশ বুঝতে পারলুম।

সহায়তায়। অমৃতসর গুরুদরবারের একটি সুন্দর গীতি ক্ষিতিমোহনবাবু সংগ্রহ করেছিলেন "এ হরি সুন্দর, এ হরি সুন্দর, তেরো চরণ পর শির নবৈঁ।" এই গানটির বাঙলা অনুবাদ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত করেছিলেন, তাঁর 'মণিমঞ্জুষা' বইটিতে আছে। একবার তিনি আমাকে একটি গান শোনালেন, নব্বই বৎসর বয়সের এক বৃদ্ধ সারেঙ্গী বাজিয়ে সেই গান গাইতে গাইতে মারা যান। গানটির গোড়ার কথা ছিল: "এ মোর সারেঙ্গিয়া দিল্ বিচ্ সব্ সুর বাজৈ।" আমি তার একটি রেখাঙ্কন-চিত্র এঁকেছিলুম।

ক্ষিতিমোহনের সরস-পরিহাস-নিপুণতার কথা সবাই জানেন। রবিদা তাই এঁকে খুব খাতির করতেন। দ্বিত্বার্থ ব্যঞ্জক কথা (Pun) বলায় কবিও আমোদিত হতেন। একদিন বর্ষায় মাঠ পার হয়ে রবিদার সংগে ক্ষিতিমোহন বাবু আর আমি যাচ্ছিলাম। মাঠে সাদা, নীল, লাল, হলুদ ঘেসোফুল বর্ষায় ফুটেচে। ঠাকুর্দা কবিরাজি ভেষজ হিসাবে কোন্‌টা কি কাজে লাগে বল্লেন। আর রবিদা ফুলগুলির নাম জিজ্ঞাসা করলেন ঠাকুর্দাকে এবং বল্লেন: আহা, এরা কত সুন্দর—এদের কিন্তু কেউ দেখেনা, মাড়িয়ে চলে যায়—ঘাসেই জন্মায় আর মরে যায়।" তারপর রবিদার একটি গান তৈরী হল: "সারা নিশি ছিলেম শুয়ে—ঘেসোফুলের পাশাপাশি।"

ক্ষিতিমোহনবাবু যখন বিশ্বভারতীর সংস্কৃত সাহিত্যের ক্লাস নিতেন তখন আমার মত অনেক অধ্যাপকরাও যেতেন নিয়মিত শুনতে। তিনি কাদম্বরী, মৃচ্ছকটিক, শকুন্তলা, রঘুবংশ, মেঘদূত প্রভৃতি এমন চমৎকার বুঝিয়ে দিতেন পড়াবার সময় যে মনে তা', গ্রথিত হয়ে যেতো—ছবি ফুটে উঠতো। শিবপার্বতী ছবি 'ন যযৌ ন তস্তৌ' শান্তিনিকেতনে এঁকেছিলুম এরই ফলে। সেটি এখন পাটনার পি-আর দাসের সংগ্রহে আছে।

একবার আমি রবিদাদাকে দুঃখ করে বলেছিলুম "এদেশে আর্টিষ্ট হয়ে লাভ কি? কজনই বা আর্ট বোঝেন? তাতে রবিদা বলেছিলেন, "সত্যি কথা, এদেশে য়ুরোপের মত শিল্পের সমঝদার নেই—তোর নিজের শিল্পানুরাগ যদি থাকে ত কোরে যা কাজ। তবে আমি বলি যদি তুই ক্ষিতিমোহনের মত একজন লোকের কাছেও কদর পাস্ এদেশে, তো ধন্য জ্ঞান করিস্।" রবিদার সব নাট্যাভিনয়ে ক্ষিতিবাবু দাদাঠাকুরের পার্ট করতেন। তাঁর অভিনয় দেখে লোকে মুগ্ধ হয়ে যেতো।

বিশ্বভারতী এবং দেশ-বিদেশের অধ্যাপকগণ

রবিদাদা স্বয়ং পড়াতেন Browning, Keats, Shelly প্রভৃতি ইংরাজি কাব্য। সন্তোষ মজুমদার, দিনুদা এবং বহু অধ্যাপকের সঙ্গে আমিও জুটতুম শুনতে। কখন কখন রবিদার অবর্তমানে এণ্ড্রুজ সাহেব ইংরাজি সাহিত্যের ক্লাস নিতেন। তিনি বেশীর ভাগ সেক্সপিয়ায় পড়াতেন বিশ্বভারতীতে। এণ্ড্রুজকে ছাত্ররা জ্বালাতন করতো খুঁটিনাটি ব্যাখ্যা নিয়ে, তাই তিনি তত জমাতে পারতেন না। রবিদার বেলায় সবাই স্থির হয়ে এবং অবাক হয়ে শুনতো; মনে হতো প্রত্যেকটি কাব্যের রূপ তাঁর বাণীতে চিত্রের মত প্রকাশ পাচ্ছে—তিনি স্বয়ং যেন তার রচয়িতা। শুধু কাব্য নয় কবিদের জীবনীর সঙ্গেও আমাদের পরিচয় করিয়ে দিতেন তিনি।

অধ্যাপক জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় আমি যাবার অব্যবহিত কাল পরেই আশ্রম ছেড়ে চলে যান এবং জামসেদপুরে শিক্ষা বিভাগের অধ্যক্ষ হন। তিনি যতদিন আশ্রমে ছিলেন ছাত্রদের নিয়ে বেশ মিলে মিশে চলতেন এবং ছাত্ররাও তাঁর বিশেষ অনুরক্ত ছিল। কালীমোহন ঘোষ শিশু বিভাগে পড়াতেন। তাঁর সঙ্গ-সুখ-সৌহার্দ আজও ভুলিনি। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ছিলেন গ্রন্থাগারাধ্যক্ষ। ইনি সাধকব্যক্তি সারা জীবন ধরে কবির একটি বৃহৎ জীবনী লিখেছেন। কবি নিজে তাঁকে এবিষয় বিশেষ ভাবে সাহায্য করেছিলেন। দর্শন শাস্ত্র পড়াবার জন্য এসেছিলেন রাসবিহারী দাস ১৩২৭-এ, এবং হিন্দী পড়াতে এলেন তখন রাজধর কাব্যতীর্থ।

বিশ্বভারতী এবং দেশ-বিদেশের অধ্যাপকগণ

ব্রহ্মচর্যাশ্রম ক্রমে দুই ভাগে বিভক্ত হল ১৯১৯-এ বিশ্বভারতী স্থাপনার সঙ্গে সঙ্গে। বিশ্বভারতীর মূল পরিকল্পনা বিধুশেখর শাস্ত্রীর ছিল বিশ্বের কাছে ভারতের ভারতী প্রচার করা। রবিদা শেষে এই বিশ্বভারতী কল্পনাকে চিরস্থায়ী করলেন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে। প্রথম বিভাগের (ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয়ের) শিক্ষকদের সম্পূর্ণ তালিকা এখন দিতে পারব না। তবে নগেন্দ্রনাথ আইচ, কালিদাল রায়, সুধাকান্ত রায় চৌধুরী, কালীমোহন ঘোষ, জগদানন্দ রায়, গৌর গোপাল ঘোষ, সরোজ রঞ্জন চৌধুরী, তেজেশ সেন, নেপাল চন্দ্র রায়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে কয়েকজন আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্রও ছিলেন। গৌরগোপাল ঘোষ মোহনবাগান ফুটবল ম্যাচে নামকরা একজন খেলোয়াড়।

সুধাকান্ত কবির শেষ জীবনে তাঁর পরিচর্যা এবং সেক্রেটারীর কাজ করেছিলেন। সুধাকান্তের কবিত্বশক্তি এবং বক্তৃতা দেবার বিলক্ষণ ক্ষমতা দেখা গিয়েছিল।

আশ্রমের দ্বিতীয় বিভাগ হ'ল 'বিশ্বভারতী'। তার দ্বিতীয় বার্ষিক বিবরণ (১৩২৬, ৮ই পৌষ থেকে ১৩২৭ ৭ই পৌষ পর্যন্ত) যা শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী এবং শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় সম্পাদিত 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকায় (পৌষ, ১৩২৭ ৫১৫ পৃষ্ঠায়) বেরিয়েছিল তাই থেকে নিম্নে দেওয়া গেল :—

বিশ্বভারতীর তিনটি বিভাগ, যথা : (ক) সাহিত্য, (খ) ললিতকলা এবং (গ) সঙ্গীত। এই তিনটি বিভাগে ১৪ জন অধ্যাপক অধ্যাপনা করাতেন। এঁদের নাম ও অধ্যাপনার বিষয় নিম্নে দেওয়া গেল :

(ক) বিভাগে :—১। পণ্ডিত কপিলেশ্বর মিশ্র···সংস্কৃত পাণিণীয় ব্যাকরণ ও কাব্য; ২। শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন···সংস্কৃত কাব্য; ৩। বিনায়ক গোবিন্দ শরদেশমুখ···সংস্কৃত কাব্য; ৪। সদ্ধর্ম্মবাগীশ শ্রীযুক্ত ধর্মধার রাজগুরু মহাস্থবির...পালি, সাহিত্য, বৌদ্ধ দর্শন ও মনোবিজ্ঞান; ৫। শ্রীযুক্ত বিধুশেখর ভট্টাচার্য শাস্ত্রী···পালি, প্রাকৃত ও সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্র; ৭। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর···ইংরাজী ও বাঙলা সাহিত্য; ৭। শ্রীযুক্ত সি এফ্ এণ্ড্রুজ ···ইংরাজী সাহিত্য; ৮। শ্রীযুক্ত গুরুদয়াল মল্লিক···ইংরাজী সাহিত্য; ৯। শ্রীযুক্ত এইচ পি মসিস্···ফরাসী ভাষা; ১০। শ্রীযুক্ত নরসিংভাই পাটেল···জার্মান ভাষা।

(খ) ললিতকলাবিভাগের অধ্যাপক ১১। শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার।

(গ) সঙ্গীত বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন :

১২। শ্রীযুক্ত ভীমরাও হাসুলকার শাস্ত্রী···বীণা, মৃদঙ্গ ও হিন্দী গান; ১৩। শ্রীযুক্ত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর···বাঙলা গান; ১৪। শ্রীযুক্ত নকুলেশ্বর গোস্বামী··· এসরাজ ও গান।

ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা : (ক) সাহিত্য বিভাগে ৩১ জন; (খ) ললিতকলা বিভাগে ১২ জন; (৬ জন ছাত্র, ৬ জন ছাত্রী); (গ) সঙ্গীত বিভাগে ২২ জন; (১২ জন ছাত্র ও ১০ জন ছাত্রী)।

উক্ত শান্তিনিকেতন পত্রিকায় ললিতকলা বিভাগের কাজের বিষয় বিবরণে (Report-এ) আছে : "কলা বিভাগের কার্য সবিশেষ প্রশংসনীয় ও সন্তোষপ্রদ; ইহা দেখিয়া আমাদের বহু আশা হইয়াছে। এবার চিত্রকলা ও শিল্পকলা

আলোচনা করিয়া অধ্যাপক অসিতকুমার হালদার মহাশয় তিনটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। অধ্যাপক ও ছাত্র উভয়েই এবার কতকগুলি নূতন চিত্র আঁকিয়াছেন। ……এই সমস্ত চিত্র "প্রাচ্য শিল্প সমিতিতে" প্রদর্শনের জন্য প্রেরীত হইয়াছিল এবং ইহাদের অধিকাংশ প্রশংসিত হইয়াছে। কোনো কোনো চিত্র বহু মূল্যে বিক্রীত হইয়াছে। কংগ্রেসের সময় যে চিত্রপ্রদর্শনী হইবে, তাহাতেও কতক চিত্র পাঠান হইয়াছে।"

শান্তিনিকেতন পত্রিকার রিপোর্টে যে চিত্রগুলির ফর্দ ছাপা হয়েছিল তাতে ছাত্রদের মধ্যে অর্দ্ধেন্দুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৭ খানি; কৃষ্ণকিঙ্কর ঘোষের ৫ খানি; হিরাচাঁদ দুগাড়ের ৫ খানি এবং ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মার ৫ খানি নির্বাচিত ছবির নাম আছে। আর আমার ৭ খানি চিত্রের নাম দেওয়া আছে : (১) 'কুনাল' (বেশ বড় ছবি, রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের সংগ্রহে আছে); (২) 'রাসলীলা' (বেশ ছোট ছবি, রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের সংগ্রহে আছে); (৩) 'রাসলীলা'র ছোট সাইজে আঁকা (রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের সংগ্রহে); (৪) 'আপদ বিদায়'; (৫) "ঊষা"; (৬) "ময়ূর"; (৭) "মত্ত সাগর পাড়ি দিল গো গহন রাত্র কালে"। ১৯০৬ থেকে ১৯২৩ পর্যন্ত আমার আঁকা সব ছবির নামকরণ করে দিতেন এবং আমার প্রবন্ধ বা লেখা দেখে দিতেন স্বয়ং 'রবিদা'।

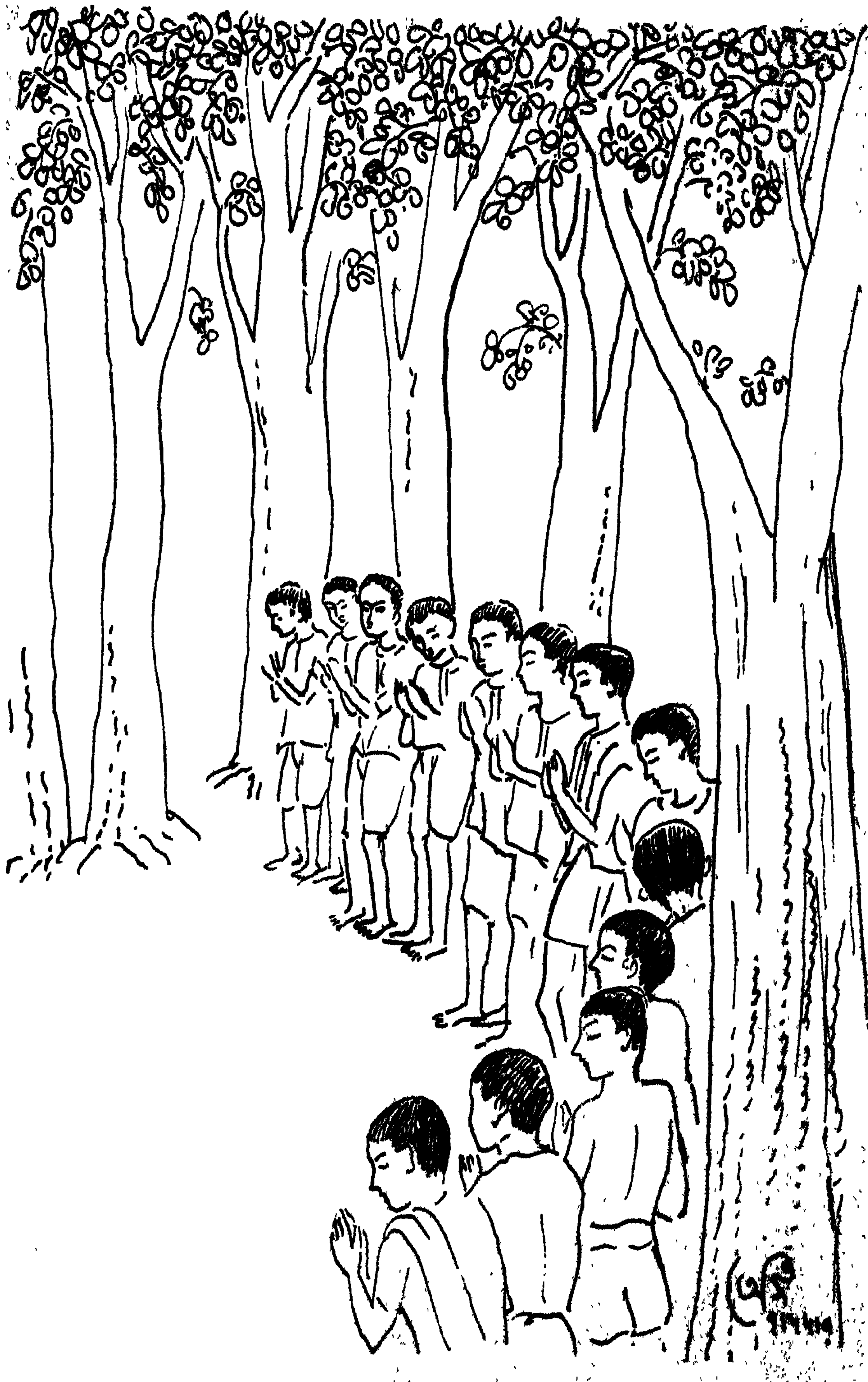
এখন বলি দেশ বিদেশ থেকে আগত অধ্যাপকদের কথা। কুমারী ডক্টর ষ্টেলা ক্রামরিশ (Dr. Stella Kramrisch) এলেন ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিল্প কলায় 'থিওরিতে' ডক্টরেট ক'রে। তিনি দেখতেন জার্মান শিল্প অধ্যাপকের দৃষ্টিভঙ্গীতে সব কিছু। ক্রমে শিল্পজগতে ভারতশিল্পের একজন বড় ক্রিটিক হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। পরে তিনি আশ্রম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান এবং আমাদের মত শিল্পীদের সঙ্গেও যোগ তাঁর ছিল না। ইনি প্রথম ১৯২০ তে ভারতবর্ষে এসে বাঙলা দেশে সাহিত্য ও শিল্পের জীবন্তভাবে চর্চা চলছে দেখে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন—বিশেষতঃ অবনীন্দ্রনাথের প্রবর্তিত শিল্পের নবজাগরণীর (Renaissance-এর) বিপুল অনুষ্ঠান দেখে। পরে অবশ্য তিনি Renaissance স্কুলের শিল্পীদের কাজ দেখবার বা বোঝবার কোনোই চেষ্টা করেননি। তিনি প্রত্নতাত্ত্বিক হিসাবে কলার বিচারে মন দিয়েছিলেন এবং বহু গ্রন্থও লিখেছেন। আশ্রমে এসেই তিনি গথিক আর্টের উপর একটি সারগর্ভ বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

ডক্টর ক্রামরিশ প্রথমে আশ্রমে যখন আসেন, তখন তিনি উইপোকা দেখবার জন্য খুব ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। কেননা য়ুরোপীয় পক্ষে সেটি অভিনব জিনিষ। তাঁর সাধ মিটতে দেরি হয়নি,—তাঁর জুতোর তলা উইপোকায় চেটে মেরে দিয়েছিল। তিনি উইয়ের ঢিবি আশ্রমে দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন—উইপোকার রাজত্ব ছিল তখনকার আশ্রমে।

তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল ভিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ে গথিক আর ব্যায়জান্তাইন আর্ট। তাই তাঁর চোখে আদিমভাবের (primitive) ছবি বেশী ভাল লাগত। পরিকল্পনার সাহায্যে জীবন্তভাবে আঁকা অজন্তার সৌন্দর্য তিনি বেশী কিছু উপভোগ করতে পারতেন না। তাঁকে একদিন যখন আমি চেপে ধরেছিলুম, গথিকের সমকালীন অজন্তার চিত্রকলা একই প্রকারের পরিকল্পনা-ধর্মি অথচ অজন্তার শিল্পীরা তাদের লীলায়িত তুলিকায় মন থেকে জীবন্তভাবে ছবিগুলি এঁকে গেছেন কি করে—আর গথিক আর্টই বা অংকন রীতিতে প্রিমিটিভ থেকে গেছে কেন? কারণ কি? তখন তিনি সঠিক উত্তর দিতে না পেরে আম্‌তা-আম্‌তা করতে লাগলেন। তারপর থেকে সাক্ষাতে আমার সঙ্গে আর্ট নিয়ে আর আলোচনা কখনো করেননি।

ইনি পরে শ্রদ্ধেয় শ্রীমতি জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সুপারিশে এবং সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কৃপায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিল্প বিভাগে অধ্যাপনা করেন। তিনি ভারতীয় শিল্পশাস্ত্র নিয়ে যে সব বক্তৃতা দিয়েচেন পড়লে বেশ বোঝা যায় তাঁর অন্তরে মূলতত্ত্ব প্রবেশ করতে পারেনি। 'রবিতীর্থে' এ বিষয় আলোচনা করার স্থান নয়। অন্যত্র বিস্তারিতভাবে বলবার ইচ্ছা রইল। মোট কথা তিনি আমাদের দেশের ছাত্রছাত্রীদের উপদেষ্টা হয়ে ভুল পথও কখন কখন দেখিয়েচেন আর্টে এবং সেইজন্য তারফল আজও ভাল হয়নি আর্ট শিক্ষার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মারফৎ।

এঁর পর শান্তিনিকেতনে এলেন ফরাসী দেশের মহিলা শিল্পী-দ্বয় কুমার আঁদ্রে কারপ্লে (Mlle. andre Karpeles) এবং তাঁর ভগ্নী কুমারী সুজঁা কারপ্লে (Mlle Sujan Karpeles)। শিল্পী-ভগ্নী আঁদ্রে ছিলেন ভারতশিল্পের বিশেষ ভক্ত। শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের 'বাঙলার ব্রতকথা' বইখানিতে আল্‌পনার ছবি দেখে মুগ্ধ হন এবং ফরাসী ভাষায় তার অনুবাদ প্রকাশ করেন। আশ্রমে তিনি কলাভবনের ছাত্রীদের মোম আর রঙ দিয়ে (Batik) কাপড় ছোপানো এবং



সমবেত উপাসনা।

সচিত্রিত ক'রে বই বাঁধাবার রীতি শেখান। এই 'বাটিক' যবদ্বীপের একটি প্রাচীন আর্ট।

কলাভবনের ছাত্রী তখন ছিলেন প্রতিমা মামি (প্রতিমা দেবী), তিনি শিখেছিলেন 'বাটিক' এবং কলাভবনের আমার একটি ছাত্র ভি-আর চিত্রা শিখেছিলেন তাঁর নিকট শিল্পোচিত বই বাঁধাই। তার ফলে শ্রীমান চিত্রা পরে লখনউ-এ গভর্মেণ্ট আর্ট স্কুলে বই বাঁধাই ক্লাসের অধ্যাপকেয় পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। পরে চিত্রা কেন্দ্রীয় সরকারের ইণ্ডাষ্ট্রীস ডিপার্টমেণ্টের ডেপুটী ডিরেকটার হন এবং এখন UNESCO তে একটি কাজে নিযুক্ত আছেন। কুমারী আঁদ্রে কারপ্লে আমার লেখা 'বাগগুহা' বিষয় বইটির ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন কিন্তু গত যুদ্ধের পর তিনি স্বর্গত হওয়ায় তা আর প্রকাশিত হয়নি। আমার পিতার ইংরাজিতে লেখা চাঁইবাসা অঞ্চলের হোমুণ্ডাদের উপকথাগুলি ফরাসী ভাষায় প্রকাশ করেছিলেন প্যারিস থেকে। ১৯২৩-এ বিলাত ভ্রমণ কালে তাঁর অতিথি হয়েছিলুম;—তিনি স্বর্গত হবার পূর্ব্বে পর্যন্ত সর্বদা চিঠি পত্রে খোঁজ নিতেন।

রুশ ভাষাবিদ পণ্ডিত 'বোগদানভ' (Bogdanav) এসেছিলেন আশ্রমে ১৯১৭র রুশ বিপ্লবের তাড়নায় পালিয়ে। পরে তিনি আফগানের রুশ রাষ্ট্র প্রতিনিধি হিসাবে কিছুদিন যান আশ্রম থেকে কাবুলে। তিনি একাহারী ছিলেন এবং তন্ত্রশাস্ত্র নিয়ে গবেষণা করতেন। চা আর ডিম ছিল তাঁর প্রধান খাদ্য। ঘরে মড়ার খুলি, কংকাল এবং নানা প্রকার তান্ত্রিক প্রতীকের 'চার্ট' টাঙ্গানো থাকত—যাদুঘর বলে ভ্রম হতো ঘরে ঢুকলে।

অধ্যাপক স্মিথ্ (Smith) এসেছিলেন লণ্ডন থেকে, তিনি ছিলেন ভাষা-তত্ত্ববিদ (Philologist)। ইনি কারু সঙ্গেই মিশতেন না। অধ্যাপনা এবং গবেষণা নিয়েই থাকতেন। রবিদাদার নিকট মাঝে মাঝে যেতেন এবং নানা বিষয় আলোচনা করতেন। প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় আমরা দেখতুম তাঁকে লাঠি হাতে বেড়াতে একলা।

ফরাসী দেশ থেকে রবিদার আহ্বানে আশ্রমে এলেন সস্ত্রীক ভারত-তত্ত্ববিদ (Indologist) সিলভিয়ান লেভি (Sylvain Levi) বিশ্বভারতীতে বক্তৃতা দেবার জন্য—ইনি জগৎ প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত ও তিব্বতি ভাষায় তিনি ছিলেন পণ্ডিত এবং প্রাচীন ইতিহাস নিয়ে ছিল তাঁর বিশেষ

গবেষণা। তিব্বত থেকে বহু হাতের লেখা প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করেছিলেন এবং তিনি পাঠোদ্ধার করায় ভারত-ইতিহাসের বহু তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

রবিদাদার সভাপতিত্বে আশ্রমের আম্রকুঞ্জে ডক্টর লেভি বক্তৃতা দেন। আর্যদের প্রথম ভারতাভিযান বিষয় তাঁর মৌলিক গবেষণা ধারাবাহিক ভাবে বক্তৃতা দিয়ে বিশ্বভারতীর ছাত্র এবং অধ্যাপকদের মুগ্ধ করেছিলেন। রবিদাদাও আমাদের সঙ্গে তাঁর ছাত্রের মতই প্রতিদিন আম্রকুঞ্জেতে বোসে লেভি সাহেবের লেকচার শুনতেন। মধ্য এসিয়ায় বোর্গাজ-কৈ (Borghz-koi) থেকে প্রাপ্ত আদিম একটি শিলালিপিতে ঋক্‌বেদোক্ত ইন্দ্র, বরুণাদি দেবতাদের নাম পাওয়া গেছে এবং হিত্তিতেদের (Hittite) সঙ্গে মিতানিদের (Mitani) যুদ্ধ প্রভৃতি বিষয় বহু কথা তিনি বক্তৃতায় বলেছিলেন। তাঁর গভীর গবেষণার বিষয়কে এমন সরলভাবে ব্যক্ত করতেন যে সকলের তা' মনে গেঁথে যেতো। একদিকে যেমন তিনি পণ্ডিত (savant) ছিলেন, তেমনি শিশু স্বভাবের লোকও ছিলেন—শিশুদের সঙ্গে তাঁর বনিবনাও হেতো ভালো। অবসর বিনোদন করতেন আশ্রমের শিশুবিভাগে ছেলেদের সঙ্গে খেলা করে। তাঁদের নিজেদের ছেলে-মেয়ে ছিল না। আমার শিশুকন্যা অতসীকে খুব আদর করতেন। তাঁর স্ত্রী উলের জামা বুনে দিয়েছিলেন তার জন্যে। ডক্টর কালিদাস নাগ এবং ডক্টর প্রবোধ বাগচী* এঁরই শিষ্য হন এবং প্যারিসে ১৯২৩এ এঁদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়।

ঠিক এই সময় এলেন Czechoslovakia থেকে জগৎ বিখ্যাত ভারতসাহিত্য-বিদ পণ্ডিত উইণ্টারনিজ (M. Winternitz)। ইনি আশ্রমে থেকে সংস্কৃত মহাভারতের ও রামায়ণের কাল এবং তার বিষয় নানা তথ্য ধারাবাহিকভাবে বক্তৃতা করেন। এঁর সঙ্গে সদ্ভাব জন্মেছিল বড়দাদামহাশয়ের (দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের)। গভীর তত্ত্ব গবেষণায় যখন তাঁরা লিপ্ত থাকতেন তখন বজ্রপাত হলেও ভ্রূক্ষেপ করতেন না। বড়মামীকে (হেমলতা দেবীকে) এঁদের সময় মত খাবার ব্যাপার নিয়ে বেশ ব্যতিব্যস্ত হতে হোতো কেননা সময়ের কোনো স্থিরতা থাকত না তাঁদের উভয়েরই। লেভি সাহেব এবং এঁর পেনসিলে প্রতিকৃতি এঁকেছিলুম। 'উত্তরা' পত্রিকায় পূর্বে তার প্রতিলিপি ছাপা হয়েছিল।

* ইনি মৃত্যুর পূর্বে শান্তিনিকেতনের ভাইসচ্যানসেলার ছিলেন

বিশ্বভারতী এবং দেশ-বিদেশের অধ্যাপকগণ

এইচ-পি মরিস একজন পার্সী ভদ্রলোক এলেন আশ্রমে বিশ্বভারতীতে ফরাসী ভাষার অধ্যাপনা করতে। রবিদা তাঁর নাম রাখলেন 'মরীচী'। ইনি ভারতশিল্পের বিশেষ অনুরাগী। সারাসানিক, গথিক, দ্রাবীড়ি ও উত্তর ভারতের প্রাচীন স্থাপত্যকলা বিষয় গবেষণা করার জন্যে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের Oriental Study বিভাগে যোগ দিতে বিলাতে রওয়ানা হন। দুর্ভাগ্যবশতঃ সমুদ্রপথে জাহাজেই তাঁর মৃত্যু ঘটে।

এঁর পর এলেন সুইজারল্যাণ্ড থেকে অধ্যাপক 'বেনোয়া'। ইনি বিশ্বভারতীর ফরাসী ভাষা অধ্যাপনার ভার নিলেন। ইনি স্বল্পভাষী এবং বন্ধুবৎসল ব্যক্তি ছিলেন। উইলি পিয়ার্সন এবং আমার সঙ্গে এঁর খুব বন্ধুত্ব হয়। এখন এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি ফরাসী ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত আছেন।

অধ্যাপক গেডিস (Geddis) সহর ও গ্রাম্য পরিস্থিতির পরিকল্পনার (Town and village planning-এর) একজন বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। পূজনীয় রবিদাদার কাছে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এলেন আশ্রমের পারিপার্শ্বিক স্থানের উন্নতির পরিকল্পনা করে দেবেন বোলে। আশ্রমের বুকে একটা পুকুর কাটা হয়েছিল বহুদিন পূর্বে মহর্ষির আমোলে—কিন্তু তাতে জল ভালো করে আঁটকাতোনা, ফলে আশ্রমের স্বাস্থ্যের পক্ষে একটি বিশেষ ভাবনার কারণ হল। গেডিস সাহেব তার এমন সুন্দর প্ল্যান করে দিলেন যাতে সেটি একটি মনোরম পার্কে পরিণত হতে পারে। পারিপার্শ্বিক স্থানীয় আকার প্রকার লক্ষ্য করে—যেখানে যেমন মানায় এবং স্বাস্থ্যের পক্ষেও অনুকূল হয় সেইমত তিনি পরিকল্পনা করতেন। আমার সৌভাগ্য হয়েছিল কিছুদিন তাঁর সঙ্গলাভ এবং সাগ্‌রেদি করার। তিনি নিজে প্রকৃতির মধ্যে প্রকৃতভাবে থাকার পক্ষপাতী ছিলেন, তাই তাঁর সকল পরিকল্পনার মধ্যে প্রকৃতিগত বৈচিত্র্যকে রক্ষা করাই ছিল লক্ষ্য। দিবারাত্র ঘরের জানলা কপাট তিনি খোলা অবস্থায় রাখতেন—চোরে চুরি করে নিয়ে যাবে বল্লে তিনি হাসতেন। তাই অনেকে তাঁকে পাগল বলতো। ইনি সস্ত্রীক আশ্রমে এসেছিলেন।

কর্নেল বেণ্টলি (Col. Bently I. M. S.) এলেন সস্ত্রীক। ইনি ম্যালেরিয়ার গবেষণায় বেশ নাম করা ডাক্তার। ম্যালেরিয়া নিবারণের উপায় নির্দেশ করার জন্যেই তিনি এসেছিলেন আশ্রমে। অধ্যাপক সন্তোষ মজুমদার এবং আমার

উপর আশ্রমের কর্তৃপক্ষ ভার দিলেন তাঁদের আতিথ্যের। তাঁরা স্বামী স্ত্রী দুজনা মিলে রান্না ঘর, চানের ঘর প্রভৃতি স্থানের জল নিকাসের পথ, পারিপার্শ্বিক সাঁওতাল পল্লিগুলি এবং ভুবনডাঙার পল্লির নালি ও প্রণালিগুলি বীক্ষণ করলেন। তাঁরই মুখে শুনলুম কিভাবে ম্যালেরিয়ার এনোফ্যালিস জাতীয় মশা জন্মায় পরিষ্কার জল নিকাসের অপরিসর যায়গায়—ময়লা, পচা জলে ম্যালেরিয়ার মশা জন্মায় না। মিসেস বেণ্টলি সব স্থানের জলের নমুনা শিশিতে সংগ্রহ করলেন এবং অনুবীক্ষণ সাহায্যে পরীক্ষাও করলেন। বন্ধুবর সন্তোষবাবু দেখে আশ্চর্য হয়ে যখন জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি ত দেখচি পতির হয়ে সবই কাজ করেছেন?" তিনি তার উত্তরে বল্লেন, "মহাশয় এটা কি উপযুক্ত কাজ নয় আমার? আপনি এ বিষয় কি বলেন?" সেইখানে কর্নেল বেণ্টলি সাহেব বসে শুনছিলেন বল্লেন, "আপনি কি জানেন না, আমায় সাহায্য করতে পারবেন বলেই আমি এই ডাক্তার মহিলাটিকে বিবাহ করেচি?" এই সময় প্যারিসের সংস্কৃতজ্ঞ লেভি সাহেবের ছাত্রী ম্যাডাম-দি ম্যানজিয়ার্লি এসেছিলেন। তিনি গীতা সর্বদা সঙ্গে রাখতেন। গীতার বিষয় বিশ্বভারতীতে বক্তৃতা দেন। তিনি থিওসফিষ্ট ছিলেন। রবিদাদার একজন বিশেষ ভক্ত।

আশ্রমের অতিথি-অভ্যাগত

রবিদাদার বন্ধু পিঠাপুরমের মহারাজা স্বয়ং স্বপরিবারে আশ্রমে আসার পর তাঁর সভার বীণাচার্য সঙ্গমেশ্বর শাস্ত্রীকে পাঠিয়েছিলেন রবিদার কাছে আশ্রমে। তাঁর তন্ত্রী-সঙ্গীত শোনার জন্যে কবি স্বয়ং ৩।৪-টে পর্যন্ত গ্রীষ্মের চাঁদনী রাত্রে খোলা মাঠের উপর তক্তাপোষে স্থির হয়ে বস্‌তেন। তাঁর বীণার মীড় মূর্চ্ছনায় সকলে মুগ্ধ এবং স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। শাস্ত্রীজি প্রাণ দিতেন বীণার তারে, মত্ত হয়ে যেতেন তখন নিজে। শয়ন ভোজনের সময়ের কিছুই ঠিক থাকতো না—এমন সাধক ছিলেন তিনি। তাঁর স্ত্রীর ছিল বিপদ এবং অশান্তি তারই জন্যে। উভয়ের মধ্যে তাই নিয়ে খিট্‌মিট লেগেই থাকত। আমার মনে তাঁদের এই অবস্থা দেখে একটি ছবির উদয় হল। আঁকলুম ছবিতে একটি বীণকার ঘরে অশান্তি দেখে নদীর তীরে নিরিবিলি গাছতলায় বীণা বাজাতে বাজাতে অভুক্ত অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়েচেন। স্ত্রী তাঁর অনুসন্ধানে বেরিয়ে তাঁকে সেই অবস্থায় সেখানে পেয়ে বীণাটি নদীর জলে

ভাসিয়ে দিচ্চেন। রবিদাদা আমার আঁকা ছবিটি দেখে নামকরণ করলেন "আপদ-বিদায়"।

১৯১৬ সালে রবিদাদার সঙ্গে স্থির করে সহপাঠী নন্দলাল বসুকে আহ্বান করলুম আশ্রমে। আশ্রমে সেই প্রথম তিনি এলেন। আম্রকুঞ্জে আশ্রমের অধ্যাপক ও ছাত্রসহ আয়োজন করা হল তাঁর অভ্যর্থনার। আমার ছাত্র মুকুল, ধীরেন এবং মনিগুপ্ত প্রভৃতিদের দিয়ে অভ্যর্থনার স্থানটি আলপনা চিত্রচর্চিত এবং ধূপবাসিত করা হল। কলাভবনের ছেলেরা বাঁধ থেকে শ্বেতপদ্ম আনলে তুলে অতিথিকে উপহার দেবার জন্যে। কলকাতা থেকে নন্দলাল এলেন তাঁর পিসতুতো ভাই সুরেন করকে নিয়ে, মুকুলও ফিরলেন আশ্রমে তাঁদের সঙ্গে একই ট্রেনে। চন্দন-চর্চিত ললাটে নন্দলাল আসনস্থ হলেন সলজ্জভাবে। রবিদাদাকে অনুরোধ করে পূর্বেই একটি আশীর্বাদী কবিতা সেই উপলক্ষ্যে লিখিয়েছিলুম, তিনি সেইটি পাঠ করলেন আশীর্বচন দিয়ে অভিনন্দিত করে। কবিতাটি প্রবাসীতে তখন বেরিয়েছিল।

এই প্রথম চাক্ষুসভাবে আশ্রম দেখে নন্দলালের জড়তা ভাঙল। মধ্যে মধ্যে তখন থেকে আশ্রমে যাতায়াত সুরু করলেন আমি থাকার কালে। সেই সময় তিনি প্রাচ্য শিল্প সমিতিতে (Indian Society of Orientul Art-এ) অধ্যাপনা করেন। তবুও তাঁর টান রইল আশ্রমের প্রতি। দোটানা মন নিয়ে তখন কলকাতা থেকে আমায় সচিত্র পোষ্ট কার্ড এঁকে তাঁর সোসাইটীতে থেকে কাজ করার সব দুর্ভোগের কথা জানাতেন, [কর্তৃপক্ষের ভয়ে প্রতীক এঁকেই সব জানাতেন।] এখন তাঁর সেই পোষ্টকার্ডগুলি রায় কৃষ্ণদাস আমার কাছ থেকে নিয়ে কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতকলা পরিষদ মিউজিয়ামে রেখেছেন। নন্দলালের দূরদৃষ্টি ছিল, তিনি বুঝেছিলেন অবন মামার কাছে বা সোসাইটীতে থাকলে তাঁর উন্নতির আশা কম—বিশ্বের নিকট পরিচিত হবার স্থানই বিশ্বভারতী। পরে ১৯২৩-এ তাঁর মনোগত অভিপ্রায় বুঝে আমি অল্পদিন বিলাত ভ্রমণ করে ফিরে আশ্রম ত্যাগ করে জয়পুরের রাজকীয় আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ হয়ে চলে গিয়েছিলুম; ১৯২৫ সালে তার পরে আবার সেখান থেকে লক্ষ্মৌ-এ এসেছিলুম।

আশ্রমে অতিথি অভ্যাগতের সীমা ছিল না। তাঁদের অতিথি সেবায় বহু অর্থব্যয় এবং সময় ক্ষয় হতো আশ্রমের। অবশ্য অনেক সময় ভাল

ভাল লোকেরা এসে তাঁদের জীবনের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান যা' দিয়ে যেতেন তা অমূল্য।

আশ্রমে বম্বের বিখ্যাত ধনিক তারাপুরওয়ালা এসেছিলেন এবং তিনি রবিদাকে আশ্রমের ভাণ্ডারের জন্যে কিছু দানও করেছিলেন। বহরমপুর কলেজের অধ্যক্ষ লেদার সাহেব (Dr. Leather) কিছুদিন আশ্রমে এসে বাস করে ছিলেন। যখন অধ্যাপক ডক্টর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় এলেন, তখন আশ্রমে একটা সাড়া পড়ে গেল। তিনি বিশ্বভারতীতে বক্তৃতা দিলেন প্রাচ্যদর্শনের উপর রবিদার সভাপতিত্বে। তাঁর ওজগুণান্বিত সৌম্য চেহারা আর রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব রূপ-দীপ্তি যাঁরা একসঙ্গে দেখেছেন তাঁদেরই মনে আজো সেই ছবি গ্রথিত আছে। যেন নীলা আর হীরা দুইটি উজ্জ্বল রতন।

এর পরে এলেন মহম্মদ শাহিদুল্লাহ্ এবং মোওলানা সওকৎ আলি আশ্রমে। মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে একযোগে এঁরা বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছেন বাক্যের দ্বারা এবং কার্যের দ্বারা। জেলেও যেতে হয়েছে তার দরুণ।

পরে এলেন আর্য সমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা স্বামী শ্রদ্ধানন্দ মহারাজ। তিনি বেদ ও গীতার উপর নানা উপদেশ দিয়ে আশ্রমের সকলকে মুগ্ধ করেছিলেন। আশ্রমে রবিদাদার প্রভাবে একটি বিষয় দেখা যেতো, হিন্দু মুসলমানের প্রীতির অভাব বা কোনো সাম্প্রদায়িকতা আপনা থেকেই হঠে যেতো। শ্রদ্ধানন্দের গীতা পাঠ শুনতেও মুসলমান-খৃষ্টান ছাত্ররাও যেতেন; মুসলমান মৌলানার বাণীও সকলে সেইভাবে একাসনে বসে শুনতেন। শ্রদ্ধানন্দ স্বামিজীকে কোনো ধর্মদেষী পরে হত্যা করেছিল। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল।

বড়োদা অঞ্চলের প্রসিদ্ধ শিক্ষা-সংস্কারক মোতিভাই আমিন, করাচীর অন্যতম প্রধান সওদাগর অধ্বানি এবং বোমানজি এসেছিলেন আশ্রমে। য়ুরোপীয় অভ্যাগতের মধ্যে Miss Flume এবং Miss Piterson, Mr, এবং Mrs Albert E. Bailey, Mrs. Tracy প্রভৃতি অনেকে এসেছিলেন। মার্কিন Mrs Tracy আমার আঁকা 'শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা' ছবিখানি তখন ৫০০৲ টাকায় কিনেছিলেন। তিনি নিউইয়র্কের লোক। লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অধ্যাপক নিকসন (Nixon) গিয়েছিলেন আশ্রমে। এখন তিনি "কৃষ্ণ প্রেম" নামে পরিচিত সাধু এবং আলমোড়ার মিরতাল আশ্রমে নিভৃতে বাস করেন।

তিনি হিন্দু দর্শন শাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং উপনিষদ ও গীতার ব্যাখ্যা প্রভৃতি অনেক বই লিখেছেন।

কবি অতুলপ্রসাদ সেন কবির পুরোনো ভক্ত ও বন্ধু গেলেন আশ্রমে লক্ষ্ণৌ থেকে। তাঁর স্বদেশী গান সুবিখ্যাত—বাঙলা দেশের আপামর সাধারণ সে-গানে মুগ্ধ। তাঁর একটি নতুন গান তখন শোনালেন :

"ওগো আমার নবীন শাখি
ছিলে তুমি কোন বিমানে"

আশ্রমে গাইয়ে ছাত্র ও অধ্যাপকেরা শুনে শিখে ফেললেন এবং ঠুম্‌রী সুর ধ্বনিত হল। লক্ষ্ণৌয়ের শেষ নবাব ওয়াজেদ আলি শাহ এই ঠুম্‌রী সুরের প্রবর্তক এবং বাঙলা গানে অতুল প্রসাদই প্রথম এই সুর পরিবেষণ করেন। লক্ষ্ণৌয়ের ইনি বড় ব্যারিষ্টার ছিলেন এবং দাতা বলে প্রসিদ্ধ। তাঁর অকাল মৃত্যুতে লক্ষ্ণৌয়ের প্রবাসী বাঙালী সমাজের সমূহ ক্ষতি হয়েছে।

এইবার শিল্পগুরু অবন মামার আশ্রমে আসার কথা বলি। তাঁদের বাড়ির প্রথা ছিল তাঁরা একলা কোথাও দূর দেশে যেতেন না। যখন যেতেন প্রায় অর্দ্ধেক ট্রেন রিজার্ভ করে মায় বাড়ির পোষা পাখিটাকে পর্যন্ত সঙ্গে নিয়ে যেতেন। তাই অবন মামার এবং তাঁর অন্য দুটি দাদার কলকাতা শহর ছেড়ে কোথাও সহজে বেরুনো হতো না। আশ্রমেও বোধ হয় সেইজন্যেই আসতেন না।

আমরা আশ্রমের সবাই মিলে তাঁর অভ্যর্থনার বিরাট আয়োজন করলুম। নন্দলালও তখন সেই উপলক্ষ্যে আমার চিঠি পেয়ে এসে পড়লেন কলকাতা থেকে। সুরেন কর তখন আশ্রমের স্থাপত্য বিভাগে কাজ করছেন। অনেক বাড়ি তৈরীর কাজে হাত দিয়েচেন তখন। পূর্ববৎ রবিদাদার নিকট গেলুম অবন মামার অভ্যর্থনার যোগ্য তাঁর লেখা কবিতার মানপত্র দিতে হবে। রবিদা তখন আমায় একটি কাগজের টুক্‌রো হাতে ধরিয়ে দিয়ে বল্লেন, "নন্দলালের জন্যে তোর অনুরোধ রক্ষা করেছি, এবার তা' চল্‌বেনা—এবার তোর গুরুকে তুই অভিনন্দিত কর্ কবিতা লিখে।" আমি তাঁর কাছে বসে এর আগে ছবি বহু এঁকেছি কিন্তু কবিতা লিখতুম লুকিয়ে; ধরাও পোড়েছিলুম কয়েকবার এবং প্রশংসাই অর্জন করেছিলুম। কিন্তু তবুও আমার অবস্থা তখন কাহিল! পেনসিল দিয়ে লিখতে লিখতে যা'

বেরুলো তাই তাঁর সম্মুখে তখুনি ধরে দিলুম। কবিতাটিতে দু'একটি শব্দ বদ্‌লে দিয়ে তিনি 'চান্‌কে' দিতেই উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠল। কবিতাটি তখন এইরূপ দাঁড়াল :

চিত্রকলার কবি তুমি
আলোক-তুলি হাতে ;
ভারতবাণীর চিত্তটিরে
জাগাও আপনাতে।
বর্ণচ্ছটার সুরের মীড়ে
অঙ্গারেতে ফলাও হীরে
অমর রেখাপাতে।
রূপের দীপে অরূপ আলো
হৃদয় মাঝে তুমিই জ্বালো
রসের বেদনাতে।

এইটে হল রবিদার কাছে আমার কবিতায় প্রথম দীক্ষা নেওয়া। অবন মামা অভ্যর্থনায় প্রীত হয়ে ফিরেছিলেন কলকাতায় সেবার।

আশ্রমের আর সব অতিথিদের কথা এখন আর আমার মনে নেই। ভ্রাম্যমান দেশ বিদেশের অতিথিও যে কত আসতেন তার ইয়ত্তা নেই। মহাত্মার সহকর্মী মীরাবেন আশ্রমে এসেছিলেন। আশ্রমের অধ্যাপকদের তখন বিশেষ এক কাজ ছিল পালা করে এই সব আগন্তুক অতিথিদের সেবা এবং হাসপাতালে রুগ্ন ছাত্র বা অধ্যাপকদের সেবা করা।

আশ্রম থেকে আমার রামগড় ও বাগগুহা যাত্রা

১৯১৪-তে লাহোর গভর্মেণ্ট আর্ট স্কুলের অধ্যাপক সমরেন্দ্রনাথ গুপ্তের সঙ্গে সুরগুজা ষ্টেটের এলাথায় রামগড়ে গিয়েছিলুম শীতকালে। কেন্দ্রীয় গভর্মেণ্টের প্রত্নতত্ব বিভাগের ডায়রেকটার জেনারেল সার জন মার্শেল আমাদের ভার দেন সেখানকার 'যোগীমারা' গুহার (আঃ খৃঃ পূ ৩৫০) প্রাচীন ভিত্তিচিত্রের নকল নেবার জন্যে। আমি আশ্রম থেকে গিয়েছিলুম রবিদার অনুমতিক্রমে। তার সকল বিবরণ তখন 'প্রবাসী' এবং Mcdern Review এ লিখেছিলুম। 'রামটেককে' কালিদাস বর্ণিত 'রামগিরি' বলা হয়।

কিন্তু রামগড়ই যে 'রামগিরি' হতে পারে এই নিয়ে শ্রদ্ধেয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে আলোচনা হয়। তিনি আমার কথা অনুমোদন করেন।

১৯১৭-তে আবার আমাকে যেতে হল আশ্রম থেকে কেন্দ্রীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কাজে গোয়ালিয়ার ষ্টেটের বাগগুহায়। সেখানকার প্রাচীন ভিত্তি-চিত্রের অবস্থা দেখে বিবরণ (Report) দেবার জন্যেই সেবার গিয়েছিলুম। মাউ-ক্যানটন্‌মেণ্ট ষ্টেশন থেকে একলা কিভাবে তখন ডাকবাহী অশ্বচালিত টাঙ্গায় ৯০ মাইল পথ গিয়েছিলুম তার বিস্তারিত বিবরণ ১৩২৪-এর ভাদ্র সংখ্যায় প্রবাসীতে বেরিয়েছিল আমার লেখা।

আমার বাগগুহার প্রত্যক্ষ দর্শন এবং বিবরণ দেওয়ার ফলে সরকারের তরফ থেকে আবার আহ্বান এল বাগগুহার ছবির অনুলিপি করার জন্যে ১৯২১ সালে। আমার দেওয়া এসটিমেটের মতই আরো দু'জন শিল্পীকে নেবার সুযোগ হল—নন্দলাল বসু এবং সুরেন্দ্রনাথ করকে নিলুম সঙ্গে। আমাদের সেখানকার সকল অভিজ্ঞতার বিষয় তৎকালীন 'প্রবাসী' এবং Modern Review-তে লিখেছিলুম। তাছাড়া—১৩২৮-এ আমার বই "বাগগুহা ও রামগড়" ছাপা হয় শান্তিনিকেতন প্রেসে এবং এলাহবাদ ইণ্ডিয়ান প্রেসের কর্তৃপক্ষ তার প্রকাশনার ভার নেন। পূজনীয় রবিদাদা তাতে চমৎকার একটি ভূমিকা যোগ করে দিয়েছিলেন। তার শেষের দিকে লিখেছিলেন "………একটি কথা বলে আমার ভূমিকা শেষ করি—শ্রীমান অসিতকুমারের এই বইখানি পড়ে আমি খুসি হয়েছি; এর রচনা সরস, সরল এবং শিক্ষা ও প্রত্যক্ষবোধের দ্বারা উজ্জ্বল।"

ফাল্গুন ১৩২৭ সংখ্যায় 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকায় আশ্রম সংবাদে আছে: "শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার গোয়ালিয়ার রাজ্যের অন্তর্গত 'বাগ' গুহার ও সেই প্রদেশের তাঁহাদের অঙ্কিত বিবিধ চিত্র প্রদর্শন করাইয়া সকলকে প্রীত করিয়াছিলেন।" রবিদাদা এই চিত্রপ্রদর্শনীর দ্বার উদ্‌ঘাটন করেন শান্তিনিকেতনে। বাগগুহায় থাকার কালে রাত্রি জেগে বহু কষ্টে প্রত্যেক ছবির duplicate তৈরী করে ডাকযোগে আমরা আশ্রমে জগদানন্দবাবুর নামে পাঠাতুম। ৪০´×৪-১/২´ ফুট বিরাট চিত্র তৈরী করে আমরা কলাভবনে উপহার দিয়েছিলুম। এরই অনুরূপ একটি রেখাঙ্কনের নকল এলাহাবাদ যাদুঘরে আছে আর এর রঙে সম্পূর্ণভাবে আঁকা নকল লখনউ আর্ট কলেজের

যাতুঘরের সংগ্রহে উপহার দিয়েছিলুম। আসল নকলগুলি আমরা যা' করেছিলুম, এখন গোয়ালিয়ার প্রত্নবিভাগের সম্পত্তি।

কবি আমার বইখানির ভূমিকায় আমাদের দেশের প্রাচীনকালের চিত্রকলার বিষয় যা' বলেচেন তার কিছুটা উদ্ধৃত করে দিচ্চি ঃ

"চিত্রকলাকে আধুনিক ভারত অনেক দিন থেকে অবজ্ঞা করে এসেচে। এ সম্বন্ধে আমাদের চিত্তের অসাড়তা এতদূর এগিয়েচে যে, আমরা যে কেবলমাত্র চিত্র-সৃষ্টি করতে পারচিনে তা' নয়, প্রাচীন ভারতের চিত্ররচনা-রীতি আমরা বুঝ্‌তেই পারিনে, তাকে আমরা ব্যঙ্গ করতে ছাড়িনে। আমরা যখন স্বাদেশিকতার অভিমানে উন্মত্ত হ'য়ে উঠি তখনো এই কথাটি বুঝতে পারিনে যে, যে জাতি কলাবিদ্যায় আপন চিত্তের পরিচয় দেয়নি, সে জাতি মহাপ্রাণ জাতি নয়। তাছাড়া একথা আমরা মনের দৈনবশতই ভুলেচি যে, একটুক্‌রো কাগজে একটুখানি ছোট ছবি যদি সত্য করে আঁকতে পারি তার দ্বারা নিত্যকালের কাছে দেশের যে পরিচয় প্রকাশ হবে তা' রাষ্ট্রপতির ক্ষেত্রে খবরের কাগজের ধ্বজা আস্ফালন করেও হবে না! অজন্তার সময়কার রাষ্ট্রীয় ঐশ্বর্যের একটি ক্ষুদ-কুঁড়োও আজ ভারতের ভাগ্যে বাকি নেই কিন্তু অজন্তা গুহার ভিত্তিচিত্রে তখনকার ভারত যে লিপিখানি লিখে গেছে সেই লিপি যুগ হতে যুগান্তরে আপন বাণীকে প্রচার করে চলেচে।"

এখন কিন্তু ভাবি স্বরাজ হল বটে কিন্তু যে সব রাষ্ট্রপালকদের হাতে দেশের সংস্কৃতির (culture-এর) ভার, দেশের আর্টের প্রতি তাঁদের দরদ কোথায়? এবিষয়ে তাঁরা এমন অজ্ঞ যে বুঝতেই পারচেন না দেশের আর্টের সংস্কৃতি কিভাবে য়ুরোপের হাটে মাথা বিকোচ্চে তাঁদেরই প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক কলা আকাদামীর দ্বারা—'আকাদামী' নামটিই তার পরিচায়ক। এবিষয় বিস্তারিতভাবে বলা হবে পরে।

কবির নাট্যকলা

সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রের মতে নাট্যকলা হ'ল দৃশ্যকাব্য। কবির নাট্য-কলার মধ্যে শিল্পীর পরিচয় বিশেষভাবে ফুটে ওঠে। কেবল নাটকীয় নায়ক নায়িকার মনস্তত্ত্বের বৈশিষ্ট ফুটে নেই, আছে রূপক ছবি যার দ্বারা মানুষের গূঢ় ও অবসুপ্ত চৈতন্য জাগে। 'অচল আয়তন' 'ডাকঘর' আর 'রক্তকরবী'

তাঁর এই ধরণের নাটক। তাঁর নিজস্ব শিক্ষা, রুচি ও সংস্কার-শুদ্ধ এই রচনাগুলি সর্বসাধারণের কাছে কেবলমাত্র হেঁয়ালি বলেই ঠেকে। অথচ যদি তাঁর নাটকের অন্তর্গত নায়ক নায়িকার চিত্র বিশ্লেষণ করে দেখা যায় ত মনে হবে সেগুলি যেন সব ঘরোয়া কিন্তু এই প্রকার সহজ-সরল ব্যঞ্জনার দ্বারা তিনি ফুটিয়ে তুলেচেন গভীর শাশ্বত সত্যকে; ধর্ম ও দর্শনের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে কুসংস্কারের অন্ধকার দুর করবার প্রথা দেখিয়েছেন এতে।

গোড়ার দিকে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে মেয়েরা ভর্তি হতেন না, এমনকি আশ্রমে অধ্যাপকদের পরিবার নিয়ে বাস করারও ব্যবস্থা ছিল না। তাই গোড়ার নাটকগুলিতেও নায়িকার পার্ট থাকতো না। ১৯১১ সালে যখন পাকাপাকি ভাবে থাকবার জন্যে গেছি তখন 'শারদোৎসব' ছেলেরা অভিনয় করলে— রবিদা ও দিনুদা তাদের তৈরী করলেন অভিনয়ে এবং গানে। তারপর দিনুদা প্রভৃতি সবাই মিলে রবিদাদাকে ধরে পড়লেন নতুন নাটিকা রচনার জন্যে। তিনি আশ্রমের কাজ থেকে ছুটি নিয়ে গেলেন সুরুলে শ্রীনিকেতনের নতুন কেনা চিফ্ সাহেবের কুঠিতে নিরিবিলিতে থেকে রচনা করবার জন্যে। প্রথমে দেখতুম রোজ সন্ধ্যায় সেখান থেকে এসে ২।৩টে করে নতুন গান দিনুদাকে শেখাচ্চেন। তারপর অল্পদিনেই তাঁর 'অচল আয়তন' লেখা হয়ে গেল।

রবিদা ফিরে এলেন সুরুল থেকে। অভিনেতা অধ্যাপকবৃন্দ নিয়ে দিনুদা রবিদার কাছে উপস্থিত হলেন। আমাকে রবিদাদা ডেকে পাঠালেন। আমায় সেইবার প্রথম ধরা পড়তে হ'লো রবিদার কাছে অভিনয় ব্যাপারে। যতদূর মনে আছে মহাপঞ্চক—দিনুদা; পঞ্চক—জগদানন্দবাবু; দাদাঠাকুর—কবি স্বয়ং; আচার্য—ক্ষিতিমোহনবাবু; এবং উপাধ্যায় হ'তে হল আমাকে। [শোণপাংশুর দলে ছেলেদের মধ্যে পরে একবার ছিলেন উইলি পিয়ার্সন। ইংরাজির মত accent দিয়ে তাঁর পার্ট অভিনয় করেছিলেন তিনি—শোণপাংশুর পার্টে তা বেশ মানিয়ে গিয়েছিল।] রবিদাকে আমি বল্লুম, "আমি অভিনয় করিনি কখনো—লজ্জা পাব।" তিনি বলেছিলেন "তোর লজ্জা আমি ভেঙে দেব— অভিনয় কর।" তারপর আমায় অভিনয় করার রীতির বিষয় উপদেশ দিয়ে বল্লেন, "ষ্টেজের সামনে চেনাশোনা বহু লোক বসে থাকবে—তুই তাঁদের দিকে চাইবিনে কেবল ভাববি তোর সামনে একটা অরণ্য।

Self-conscious হলে অভিনয় হয় না,—কোনো আর্টই হয় না। নিজেকে ভুলে যেতে হবে অভিনয়ের সময়। অভিনয়ের পার্ট আমাদের ভালো করে মনে রাখতে হতো এবং দুমাস ধরে তার রেয়াজ (rehearsal) চলত।

ষ্টেজ বাঁধা, অভিনেতাদের সাজানো প্রভৃতি সব কাজের দায়িত্বভার আমার উপর পড়ল। কলকাতা থেকে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি আসতেন সবান্ধবে অভিনয় দেখতে। মুগ্ধ হয়ে ফিরে যেতেন অভিনয় দেখে। আমার প্রথম অভিনয় অচলআয়তনে উপাধ্যায়ের পার্ট করার পর রবিদা একদিন পিয়ার্সনের কুটিরের দাওয়ার সিঁড়িতে বসে কবিতা লিখছিলেন। আমায় সম্মুখ দিয়ে যেতে দেখে ডেকে বল্লেন "অসিত শোন্, অহংকার যদি না করিস তো একটা কথা বলি?" তারপর বল্লেনঃ "তোর অভিনয় perfect হয়, কলকাতার সবাই খুব প্রশংসা করেচেন তোর অভিনয় দেখে। [এই অভিনয়-শিক্ষার ফলে আমি নিজে যে সব নাট্যকণিকা রচনা করেছিলুম তা' অনেকেই জানেন। তখনকার 'বিচিত্রা' পত্রিকায় কিছু বেরিয়েছিল। 'ফল-লাভ', 'দৃষ্টিদান', 'আপোদ-বিদায়', 'বাঁশির ডাক', 'কালো আর ভালো' প্রভৃতি অনেক ছোট ছোট নাটক লিখে অভিনয় করেচি লখনউএ এসে। ইণ্ডিয়ান প্রেস থেকে আমার নাট্যকণিকাগুলি তখন ছাপা হয়েছিল।]

এরপরে হল ১৯১৫-তে 'ফাল্গুনী' রচনা এবং তার অভিনয়। স্কুলে থেকে অল্পদিনেই বহু গান ফাল্গুনীর জন্যে কবি রচনা করলেন এবং প্রত্যহ দিনুদাকে শেখাতে লাগলেন। এইবার পালা পড়ল আমার ষ্টেজ-বাঁধার এবং অভিনয় করার। অভিনয় দেখবার জন্যে কলকাতা থেকে যথা নিয়মে বহুলোকের সমাগম হল, তার মধ্যে আমার জানাশোনাও বহু ব্যক্তি সস্ত্রীক এসেছিলেন। ফাল্গুনীর ষ্টেজ শালবীথিকা গৃহেই তৈরী হল, ফুললতাপাতা দিয়ে। কলকাতা থেকে আগত আত্মীয়া ও জানাশুনা মেয়েদের লাগিয়ে দিলুম মালা গাঁথতে এবং লতাপাতার ষ্টেজ সজ্জায় সাহায্য করতে। রবিদা খুব খুসি হলেন সবাইকে কাজে লাগিয়েচি দেখে।

রবিদার নিজের অভিনয় ক্ষমতা অপূর্ব ছিল। তাঁর ব্যক্তিত্বের মহত্ব, দেহের অপূর্ব সৌন্দর্য, আর তার সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে আশ্চর্য অভিনয় করার রীতি দেখে সকলেরই প্রীতির উদ্রেক হতো। সবাই মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাঁর দিকে ষ্টেজে চেয়ে থাকতেন। আমার মনে হয় কোনো অপূর্ব সুন্দরীর

প্রতিও এত আকৃষ্ট কেহই হতে পারতো না। এরূপ দিবা দর্শন পুরুষের অভিনয় ভাগ্যেই দেখতে পাওয়া যায়। সে সৌভাগ্য হওয়ায় ধন্য হয়েচি।

রবিদাদা নিজে এই প্রকার অভিনয় গীতোৎসব করতেন এবং ছাত্ররা মিলে কোনো কিছু অনুষ্ঠান করলে তাতে তিনি নিজে যোগ দিয়ে তাদের উৎসাহ বর্ধন করতেন। কলাভবনের ছাত্রদের নিয়ে রবিদার হাস্য কৌতুক ব্যঙ্গকৌতুক বই থেকে অভিনয় করেচি রবিদার নিকট তাতে উৎসাহ পেয়ে। মহাকবি রবিদাদা শৈশবেই 'বাল্মীকি প্রতিভা' রচনা করেন তার কথা পূর্বেই বলেচি। মহাকবি বাল্মীকি যেমন প্রথম অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন শোক থেকে শ্লোক রচনায়, অমর কবি তাঁরই অনুপ্রেরণায় প্রথম কবিত্বশক্তিতে দীক্ষিত হয়েছিলেন তাঁর সেই প্রতিভাকে জাগিয়ে নাট্যকলায় এইভাবে।

বিচিত্রার কথা

রথীমামা (রথীন্দ্রনাথ) তখন কলকাতায় বেশীর ভাগ থাকতেন এবং জমিদারীর কাজকর্ম দেখতেন রবিদার হ'য়ে। তিনি অবনমামা এবং গগনমামার সঙ্গে পরামর্শ করে রবিদাদার সহায়তায় জোড়াসাঁকোর লালবাড়ীতে তাঁদের বৈঠকখানায় স্থাপনা করলেন "বিচিত্রা সভা" দোতলার উপরের প্রকাণ্ড হল-ঘরে। তার নীচেরতলার হল ঘরে তাঁদের দু-বাড়ির বইয়ের সংগ্রহ (লাইব্রেরী) স্থাপনা করা হোল। গগনমামা বহু পূর্বেই তাঁদের পূর্বপুরুষের ভিক্টোরিয়ান ভেলভেটের গদি আঁটা কৌচ চৌকি তাঁদের বৈঠকখানা থেকে সরিয়ে ফেলে দেশী নতুন খাটোলা ধরণের কৌচ ফার্ণিচার পরিকল্পনা করেছিলেন। রথীমামারও সখ হ'ল সেইভাবে বিচিত্রাঘর সাজাবার। নন্দলাল আর আমি গগনমামার সহায়তায় তার পরিকল্পনায় নিযুক্ত হলুম।

নন্দলাল একবার রাঁচি থেকে আমার সঙ্গে জোন্‌হার জলপ্রপাত দেখতে যান। সেখানে জঙ্গলের পথে একটি হোমুণ্ডার বাড়িতে তার বসবার খাটোলা-চেয়ার দেখেছিলেন। তার একটি নক্সা করা ছিল। নন্দ সেই ধরণের একটি চেয়ারের পরিকল্পনা করলেন। পাল্‌কির হাতোলের মত কৌচের হাতল দেওয়া চৌকী, নানাপ্রকার বেতের আসন প্রভৃতি তৈরী করা হল উপযুক্ত নক্সায়। দেয়ালের খানিকটা শীতলপাটি দিয়ে মুড়ে

তার উপর ছবি টাঙাবার ব্যবস্থা করা হল। সব ছবিই গগনমামা, অবনমামা, নন্দলালের এবং আমার আঁকা—কোনো বিলাতি ছবির গন্ধও তাতে ছিল না।

বিচিত্রার নীচেরতলার লাইব্রেরীটি ছিল আমার এবং সৌম্যের বিশেষ আকর্ষণ। এই সুযোগে আমরা দুজনে বহু বিলাতি classics পড়ে ফেল্‌লুম। সবই রবিদাদার পূর্বে পড়া বই, অনেক বইয়েতে তাঁর নিজের হাতে পেন্‌সিলে দাগ দেওয়া থাকতো। একদিন আমাকে ডিক্‌সেনারি বার বার ঘেঁটে বই পড়তে দেখে বল্লেন, "কেবল পোড়ে যা, ডিকসেনারি দেখিসনে; —আবৃত্তি সর্বশাস্ত্রাণাম্ বোধাদপিগরিয়সী।"

বই পড়ার বিষয় রবিদা একদিন আরো আমায় বলেছিলেন তার কথা বলি। সেই সময় আমেরিকা থেকে বহু গ্রন্থ উপহার পেলেন তিনি—এরূপ প্রায়ই পেতেন পৃথিবীর সর্বত্র বড় বড় প্রকাশকদের কাছ থেকে বিশ্বভারতীর জন্যে। একটি বেশ মোটা ঝকঝকে মলাটের দার্শনিক তত্ত্বকথার বই আমাকে পড়তে দিয়ে স্নানের ঘরে স্নান করতে গেলেন। রবিদাদার স্নানে দেরি হতো—রাজা রামমোহন রায়ের মতই। স্নানের পর আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, "কেমন লাগল ?" আমি নেড়ে চেড়ে তার একটি চ্যাপটার পড়তে গিয়ে দেখি বাক্যের জালে কুয়াসাচ্ছন্ন—শব্দচাতুর্যের মাধুর্য ছাড়া একেবারেই অন্তঃসার শূন্য। রবিদাকে বলতেই তিনি হাত থেকে বইটি নিয়ে ফাল্‌তু কাগজের ঝুড়িতে (W. P. B.তে) ফেলে দিলেন। বল্লেন: "রাবিশ্ ওটা; বই পড়তে হলে গোড়াতেই নির্বাচন করে নিতে জানা চাই। কোনো বইয়ের পাতায় কেবল চোখে বুলিয়ে যেতে হয়—কোনো বই দেখেই ফেলে দিতে হয়—আবার কোনো কোনো বই খুঁটিয়ে পড়তে হয় যাতে চিন্তার বস্তু আছে।" অতিরিক্ত পঠন যে সাহিত্য ও শিল্প সৃষ্টির ব্যাঘাত করে তার কথাও তিনি বলেছিলেন।

নিট্‌শে (Nietzscho) বলেচেন: The scholar who actually does little else than welter in a sea of books.........finally loses completely the ability to think himself. He cannot think unless he has a book in his hand.........In him the instinct of self-defence has decayed, otherwise he would defend himself against books. The scholar is a decadent.

বিচিত্রার কথা

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাযন্ত্রাগার থেকে লক্ষ লক্ষ ছাত্র প্রতি বৎসর পাশ করে বের হয় অন্তঃসার শূন্য হয়ে, তাদের লক্ষ্য করে 'Parrot's Training' বই লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং অবনমামা সেটিকে সচিত্র করেছিলেন। তাতেই গগনমামা অনুপ্রেরণা পেলেন তাঁর ব্যঙ্গচিত্র আঁকার কালে। দেশের বহু নৈতিক ও রাষ্ট্রীয় কুফলের বিরুদ্ধে তখন রসালো ব্যঙ্গচিত্র তিনি আঁকছিলেন। গগনমামার এই ব্যঙ্গচিত্র হ'ল 'বিশ্ববিদ্যার যন্ত্রাগার'। ছবিতে আছে, বিরাট বইয়ের জাঁতাকলের পেষণে 'চিঁড়ে চ্যাপ্‌টা' জীর্ণ ছাত্রের দল বেরুচ্চে ভগ্ন স্বাস্থ্য ও অন্তঃসার শূন্য হয়ে;—আর অপর দিক থেকে প্রবেশিকা পথে নবাগত ছাত্রের ভিড় যন্ত্রের মধ্যে ঢোকবার জন্যে উৎসুক হয়ে এগিয়ে চলেচে। দূরে 'সোনার চাঁদ' লেখা চাঁদের টোপর বিদ্যালয়ের অট্টালিকা শীর্ষে দেখা যাচ্চে—তাতে B.A. লেখা আছে—বিয়ের দড় বাড়ার সম্ভাবনা তার ইঙ্গিতটিতে বোঝা যাচ্চে। বিশ্ববিদ্যাযন্ত্রের উপরের তোরণের মাঝে ঘড়ি এবং একপাশে ছাদের উপর সামলাপরা উকিল এবং অপরদিকের ছাদে হ্যাটকোটপরা ব্যারিষ্টারের প্রস্তর মূর্তি দাঁড় করানো আছে। গগনমামার ব্যঙ্গচিত্র বিষয় আরো কথা পরে বলা হবে। আমাদের সমসাময়ীকেরা জানেন একবার এনট্রান্স একজামিনেশনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক পণ্ডিত বাঙলা ভাষার পরীক্ষার প্রশ্ন রচনা করেছিলেন অদ্ভুতভাবে। প্রশ্নতে ছিল—রবীন্দ্রনাথের লেখা গদ্য অংশকে শুদ্ধ বাঙলায় পরিণত করে লেখার। রবীন্দ্রনাথের ভাষা পণ্ডিতমহলে তখন অশুদ্ধ বলেই গ্রহণীয় ছিল। এখন দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথের ভাষাই বাঙলা ভাষা, যেমন ইংরাজি ভাষা King's English। [২৫শে বৈশাখ ১৩৫৯ সংখ্যায় দেশ পত্রিকার ৯৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ নিজে শিক্ষা বিষয় যা বলেচেন তা' দ্রষ্টব্য] প্রকৃতির মধ্যে বাস করেই শিশুর মন প্রকৃতভাবে গড়ে উঠতে পারে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাকা বাড়ির বেড়ায় তা সম্ভব নয় এই ছিল তাঁর বক্তব্য। দেশে সর্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষা প্রচার না হলে দেশ স্বাধীনতা লাভ করলেও যে কোনোই ফল হবে না সে কথা কবি সকল সময় আমাদের বলেচেন। আজও সেই শিক্ষারই অভাব আমরা হাড়ে হাড়ে অনুভব করচি।

বিচিত্রা সভার কথা

তারপর বিচিত্রা সভার পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হল এবং অধ্যাপক ডক্টর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের সভাপতিত্বে প্রথম বৈঠক বসল। তাতে বহু মাননীয় ব্যক্তিরা এসেছিলেন। সেই বৈঠকে স্থির হল সুরেনমামা (সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর) বিচিত্রা ক্লাবের নিয়মাবলী তৈরী করবেন অবনীন্দ্রনাথ এবং গগনেন্দ্রনাথের সহায়তায়। আমাকে রাঁচিতে গরমের ছুটিতে (২২শে জুন, ১৯১৭) অবনমামা চিঠি লিখলেন কলকাতায় এসে বিচিত্রায় যোগ দিতে। বিচিত্রার টাইপ করা সুরেন মামার তৈরী নিয়মাবলীও তার সঙ্গে আমাকে পাঠিয়েছিলেন, সেটি আজও রাখা আছে। আমায় লিখলেন:

"প্রিয় অসিত, আষাঢ় মাস থেকে তোমাদের এখানে কাজ করার কথা ছিল। কবে আসবে?......রবিকাকা কলকাতায় এসেছেন। ঠিক কবে আসবে জানিও। সময় হয়েছে আর দেরী না ক'রে এসে পড়।"

নিয়মাবলীতে শিরনামায় লেখা ছিল "The Bichitra Studio for Artists of the Neo-Bengal School। তার First Master হলেন অবনীন্দ্রনাথ, Director—গগনেন্দ্রনাথ; Sir John Woodroff, N. Blunt এবং S. Mullar হলেন Visitors; এবং Foundation Members হলেন: নন্দলাল বসু, অসিতকুমার হালদার এবং মুকুলচন্দ্র দে।

তখনকার কলকাতার বড় বড় মনীষী কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিকরা তার সভ্য হলেন। তার সম্পূর্ণ ফর্দ্দ দেওয়া সম্ভব নয়। তবে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে যথা—ডক্টর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, সার জগদীশচন্দ্র বসু, কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, রামানন্দ চট্টপাধ্যায়, ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, প্রমথনাথ চৌধুরী, ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টপাধ্যায়, শ্রীঅমল হোম, ডক্টর প্রশান্ত মহালানবীস, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ডক্টর রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, ডক্টর রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, ডক্টর কালীদাস নাগ অর্দ্ধেন্দুপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়, নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত, শরৎচন্দ্র চট্টপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রনাথ বাগচী এবং আরো বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিরা বিচিত্রার সকল অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন। রবিদার নিত্য নূতন সরস রচনা পাঠ হোতো। বিচিত্রার সভ্যদের জন্যে 'নির্দ্দেশ কার্ড' ছাপানো হল। বাঁশী, তুলি এবং



অধ্যাপক ভিন্টার নিৎস



দীনবন্ধু সি. এফ. এণ্ড্রুজ

তুণীর দেওয়া নক্সা (seal) নন্দলাল বিচিত্রার জন্যে তৈরী করলেন। সেটি বিচিত্রার নিমন্ত্রণপত্র, নির্দেশপত্র এবং অন্য সব চিঠিপত্রের শিরনামায় ছাপা হতো। যে সব অনুষ্ঠান বিচিত্রায় তখন হয়েছিল তার সম্পূর্ণ ফর্দ নেই আমার কাছে। তবে নিমন্ত্রণপত্র যে কখানি আমার নিকট আজো রাখা আছে তা থেকে একটি তালিকা দিচ্ছি :

১। উপলক্ষ্য—"ভ্রমণ বৃত্তান্ত"—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
কাল—৫ই চৈত্র, বুধবার, সন্ধ্যা ৬-৩০

২। উপলক্ষ্য—"পাঠ"—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
কাল—১৮ই শ্রাবণ, রবিবার, সকাল ৭-৩০

৩। উপলক্ষ্য—"ভারতের চিত্রশিল্পের ধারা"—শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
কাল—৬ই ভাদ্র, বুধবার সন্ধ্যা ৬টা

৪। উপলক্ষ্য—'বক্তৃতা'—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
কাল—২০শে ভাদ্র, বুধবার, সন্ধ্যা ৬টা

৫। উপলক্ষ্য—"আমার ধর্ম"—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
কাল—১৭ই আশ্বিন, বুধবার, সন্ধ্যা ৬টা

৬। উপলক্ষ্য—"বৈকুণ্ঠের খাতা" (অভিনয়)
কাল—আগামী শুক্রবার (তারিখ নাই)

৭। উপলক্ষ্য—'বক্তৃতা'—Prof. Geddis
কাল—শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টা (তারিখ নাই)

কোনো নিমন্ত্রণপত্রেই সন তারিখ নিয়মিতভাবে লেখার রীতি ছিল না।

বিচিত্রাতে নন্দলাল, আমি আর আমাদের ছাত্র মুকুল দিনের বেলায় ছবি আঁকতুম। আমি থাকতুম জোড়াসাঁকোতে রবিদাদার কাছে, সন্ধ্যায় মজলিস বসতো নানা প্রকারের। প্রতিমামামী তখন আমার কাছে আর একজন জাপানী শিল্পী কাম্পো আরাইসানের নিকট ছবি আঁকা শিক্ষায় মন দিয়েছিলেন। একহাতে তিন আঙুলে তিনটি তুলি একই সময় চালানোর প্রণালী এই জাপানী শিল্পী আমাদের দেখিয়েছিলেন।

আমি তখন ১০´×৪-১/২´ ফুটের কাঠের উপর কাপড় জুড়ে "গুহকের সঙ্গে রামের মিতালি" ছবিখানা আঁকছিলুম। আমাদের 'রেনেসাঁ স্কুলে' এর পূর্বে এত বড় ছবি আঁকায় কেহই হাত দেননি। [এ্যাটর্নী ক্রটিক অর্দ্ধেন্দুকুমার

গাঙ্গুলি তাঁর প্রকাশিত Modern Indian Artist Vo I. ২৭ পৃষ্ঠায় এই ছবিটির টিকায় লিখেচেন, "This was the largest composition ever attempted by the artist" এতে মনে হয় যেন অন্যেরা তখন এর চেয়ে বড় ছবি এঁকেছিলেন, কেবল আমিই কষ্টেসৃষ্টে এই প্রথম বড় ছবি আঁকলুম। কথাটা কত যে অসত্য তা বলার প্রয়োজন নেই। কেননা যে সময় আমার এই ছবি আঁকা হয়েছিল তার পূর্বে আমাদের ভিতর কোনো শিল্পীই বড় ছবি যে আঁকেননি তা সবাই জানেন।] রবিদা এবিষয় শিল্পগুরু অবনমামাকে বলায় তিনি নন্দলালের রাঁচি থেকে তাঁকে পাঠানো পোষ্টকার্ডের উপর আঁকা 'সাঁওতাল নাচ' ছবিটি ঠিক অনুরূপ সাইজে তেল রঙে (oil-এ) আঁকলেন। এইভাবে বিচিত্রায় সজীবভাবে ললিতকলার চর্চা চলেছিল তখন আমাদের মধ্যে। মুকুল Copper plate Etching নিয়ে তখন ব্যস্ত থাকতেন। মুকুলকে Etching বিষয় আমি প্রথমে উৎসাহ দিয়েছিলুম। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি অধ্যবসায় অভাবে অধিক দূর অগ্রসর হতে পারেননি।

এই সময় থেকে রথীমামারও আর্টের চর্চা একটু করে আরম্ভ হয়। কতকগুলি ফুলের ছবি তিনি জল-রঙে তখন সুন্দর এঁকেছিলেন। পরে বিলাত থেকে চামড়ার কাজ শিখে তিনি artistic leather work শিষ্য-পরম্পরায় সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে দেন। এখন অনেকে জানেনই না যে রথীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষে এই আর্ট প্রথম আমদানী করেন। তিনি আজকাল কাঠের বিচিত্র শিল্প সৃষ্টি করচেন। তাঁর তৈরী কাঠের জিনিষ এবং ছবি যাঁরা দেখেচেন তাঁরাই মুগ্ধ হয়েচেন। প্রতিমামামী (তাঁর পত্নী) বিলাত থেকে শিখেছিলেন artistic pottery করার রীতি কিন্তু স্বাস্থ্য ভাল না থাকায় তার চর্চা করতে পারেননি।

বিচিত্রার সভ্যদের মধ্যে কবি সতেন্দ্রনাথ দত্তের কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। ইনি—স্বনামধন্য অক্ষয়কুমার দত্তের পৌত্র। ইনি অল্পকাল জীবিত থেকে বাঙলা দেশের কাব্যে মহাকবি রবীন্দ্রনাথ এবং মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের মতই প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। সমসাময়ীক কবিরা সকলেই যে রবীন্দ্রনাথ এবং সতেন্দ্রনাথের কাছে ঋণী তা' তাঁদের কাব্য পাঠেই বেশ বোঝা যায়। রবিদা স্বয়ং সত্যেন্দ্রনাথকে বলতেন 'ছন্দ সরস্বতী'। সত্যেন্দ্রনাথের রচিত বহু নতুন ছন্দ আজ বাঙলার নিজস্ব সম্পদ

হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমারা আজও তাঁকে তাঁর প্রাপ্য মর্যাদা দেইনি, কিন্তু লুণ্ঠন করেছি তাঁর বিরাট অভিজ্ঞতা।

একবার মনে আছে, রবিদা একটি নতুন কবিতা রচনা করে বিচিত্রায় আমাদের শোনাচ্ছেন। একটি শব্দের আধমাত্রা কম হওয়ায় সত্যেন্দ্রনাথের কানে বাধ্‌লো এবং তিনি রবিদাদাকে তার কথা বললেন। রবিদা হেসে বল্লেন, "সত্যেন, তোমাকে ফাঁকি দিতে পারলুম না—তোমার কানে ঠিক বেধেছে কথাটা—কিন্তু ঐ শব্দের বদলে অন্য কোনো লাগ্‌সই শব্দ পাচ্ছিনে যে।" বন্ধুবর সত্যেন্দ্রনাথ তখন খুঁটিয়ে ভালো করে চিন্তা করে দেখে স্বীকার করলেন যে শব্দটি বদলানো যাবে না। অবশ্য সাধারণ পাঠকদের কানে সে শব্দের খট্‌কা কখনই বাধ্‌তো না।

সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন মণিলাল গাঙ্গুলির কান্তিক প্রেসের মজলিসের একজন বিশেষ সদস্য। সেই স্থানটি ছিল তখনকার বাছাই করা সাহিত্যিক-দের একটি মধুচক্র। সেখানে আমারও নিয়মিত যাতায়াত ছিল। আমি সে সময় রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের বাগান বাড়ীর জন্য পদ্মের বড় বড় ছবি আঁকছি। বঙ্গসরকার লর্ড কারমাইকেলের উদ্যান দেখতে যাবার উপলক্ষ্যেই রাজা প্রফুল্লনাথ ছবিগুলির ফরমাস দিয়েছিলেন আমাকে। দুখানি পদ্মের ছবির নাম চেয়ে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে সেই ছবি দুটির ফোটো পাঠিয়েছিলুম রাঁচি থেকে, জ্বর হওয়ায় কলকাতায় তখন ফিরতে পারিনি। বন্ধু কবি সত্যেন্দ্রনাথ ১৪ই অগষ্ট ১৯১৬ এ একটি কার্ডে ছবি দুখানির নামকরণ করে আমাকে লিখেছিলেন :

আমি বলি রাঁচি। স্বাস্থ্য সুখের চাঁচি॥
রোগ বালাইয়ের নাক কাটবার কাঁচি॥
শীতে সেথা হয় না হাঁচি। গ্রীষ্মেতে ঘামাচি;
সেথাও হবে জ্বর? এ যে ভয়ঙ্কর!
কেমন আছ এখন? সেটা জানাও বন্ধুবর॥
দেখছি এখন কল্‌কাতাতে আমরা ভাল আছি।
যদিও হেথা রাতে মশা দিনের বেলায় মাছি॥

* * * *

তোমার ছবির নাম নীচেতে লিখিলাম।

(এক) বোধনের বাণী। (দুই) ঘুমন্তের হাসি॥

এখন তবে আসি বন্ধু, এখন তবে আসি॥
রং-মহলের রঙ্গী তুমি পাঁচপীরের একপীর।
বহুৎ সেলাম জানায় তোমায় কবি-কলম্‌গীর॥
—(alias) শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

এই পাঁচ পীরের বিষয় তিনিই তাঁর 'স্বাগত' কবিতায় উল্লেখ করেছিলেন, কলিকাতা নগরীর বর্ণনায় এবং কলিকাতার টাউন হলে বিরাট সাহিত্য সম্মিলন সভায় সেটি পড়েছিলেন। তাতে আছে,—

"একদা যে দীপ জ্বালিল ধীমান, সে দীপ আজি এ-নগরী জ্বালে।
পঞ্চ-প্রদীপ অবনী গগন অসিত মুকুল নন্দলালে॥"

সত্যেন্দ্রনাথ রবিতীর্থের সঙ্গে বিশেষ ভাবে যোগযুক্ত ছিলেন তার সকল অনুষ্ঠানে যতদিন তিনি বেঁচেছিলেন।

বিচিত্রার আনুষঙ্গীক কথা

অবনীন্দ্রনাথ এবং গগনেন্দ্রনাথের কথা এই বিচিত্রা সম্পর্কে না বল্লে সম্পূর্ণ হবে না। আন্তরিক ভাবে চিত্রকলা চর্চার উপরেও অবনীন্দ্রনাথ এবং গগনেন্দ্রনাথের দৃষ্টি আর্টের অন্য সব দিকেও ছিল।

তাঁদের বিচিত্র প্রাচীনকালের তৈজসপত্র সংগ্রহ করার সখ ছিল। বহু তিব্বতী বণিক শিল্প পণ্য নিয়ে আসতো বিক্রি করতে। লখনউ, লাহোর, অমৃতসর, দিল্লী এবং সুদূর দক্ষিণ থেকেও কখনো কখনো আসতো বণিকেরা নানা সুন্দর সুন্দর ব্যবহারিক শিল্প ও প্রাচীন চিত্র নিয়ে। এই সংগ্রহের সময় 'সাচ্চা' ও 'ঝুটো' (নক্‌লি) ছবির কি করে বিচার করতে হয় এবং প্রাচীন শিল্পনৈপুণ্যের মধ্যে যে সব প্রতীক ও নক্সা, তার গুণ বিচার কি করে করতে হয়, গগনেন্দ্রনাথ এবং শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ তাঁদের শিষ্যদের দেখাতেন এবং বোঝাতেন। ভালমন্দ যাচাইয়ের ক্ষমতা আমাদের মধ্যে সেই শিক্ষার ফলে আজো কাজে লাগ্‌ছে।

মোগল ছবির ভাল সংগ্রহ লালা ঈশ্বরীপ্রসাদের বন্ধু বাবু মাতাপ্রসাদ এবং বালকৃষ্ণ শেঠরাই বেশীরভাগ নিয়ে যেতেন তাঁদের কাছে লখনউ থেকে

কলকাতায়। এই ভাবে তাঁদের ঘরে চিত্র, ভাস্কর্য্য, তৈজসপত্র ও পুঁথি-চিত্র, পট-চিত্র প্রভৃতির উৎকৃষ্ট সংগ্রহ গড়ে উঠেছিল অপূর্বভাবে।

অনেকে মনে করেন যে যামিনীরায়ের পূর্বে—বাঙলা দেশের পটের চিত্র বিষয়ে অবনীন্দ্রনাথ বা তার শিষ্যরা আদৌ জানতেন না, অথচ অবনীন্দ্রনাথের সংগ্রহে বহু পূর্বেই পটের ছবি আমরা দেখেচি। তাছাড়া সহপাঠি নন্দলাল, সুরেন গাঙ্গুলী এবং আমি কালিঘাটের পোটো-পাড়াতে গিয়ে তাদের আঁকা বহু ছবি সংগ্রহ করেছি। অবনমামার সংগ্রহ থেকে পাল যুগের একটি পটের এবং কালিঘাটের একটি পটের ছবি ১৩২০তে আমার "অজন্তা" পুস্তকে প্রকাশ করেছিলুম। অজন্তার রেখাঙ্কনের সঙ্গে তার তুলবার জন্য।

অবনীন্দ্রনাথের নিকট ১৯১১ সালে আসেন একজন 'বামন-উদ্যান' রচনা নিপুণ শিল্পী 'কাসাহারা' জাপান থেকে। অবনমামা গোড়ায় জানতেন না যে তিনি একজন জাপানের শ্রেষ্ট 'বামন উদ্যান' শিল্পী (Miniature-gardener)। তিনি জাপান থেকে সপরিবারে আসেন কলকাতায় এবং অবন-মামা তাঁকে ছুতোর মিস্ত্রীর কাজ করার ভার দেন। মাদ্রাজি মিস্ত্রী আচারিয়া এবং জাপানী মিস্ত্রী কাসাহারাই তাঁদের বৈঠকখানার নতুন ধরণের ফার্নিচার সব তৈরী করেছিলেন তাঁদের পরিকল্পনা অনুযায়ী। আচারিয়া পুরী মন্দিরের গোরুড়স্তম্ভের একটি কাঠের অবিকল নকল গোলকামরার উপযুক্ত সাইজে তৈরী করেন। দেয়াল-আলমারী, মেঝের উপর বেতের চৌকী, মেঝ প্রভৃতি জাপানী শিল্পী তৈরী করেছিলেন। মেঝেটি জাপানী শিল্পী তাঁদের তাতামীর মত সুন্দর তৈরী করলেন। তার উপর কাঠিওয়ার এবং উড়িষ্যার বাহারে ছিটের রঙিন তাকিয়া সজ্জিত হল।

রবিদাদাও একঘেঁয়েভাবে আসবাবপত্র সাজিয়ে রাখতে চাইতেন না—নানা প্রকারে জিনিসপত্র হর-বদল করে সাজাতেন। ঘরেরও অদল-বদল হতো। একবার দেখলুম লেখাপড়ার ঘরের টেবিলের আশেপাশে বাহারে হাঁড়ি রাখার সিকে ঝুলচে—তাতে রেখেচেন তাঁর পাণ্ডুলিপি ইত্যাদি। কবি বোলে মোটেই 'বোহেমিয়ান' ধরণে অগোছালো ছিলেন না। তাঁর কলম কাগজ বইপত্র সব ঠিক্‌ঠিক স্থানে রাখতেন। মিলিটারী অফিসারের মত গোছালো থাকত তাঁর টেবিল।

পরে ১৯২২-তে জাপানের সুবিখ্যাত কাউন্ট ওকাকুরা (Kakuzo Okakura San)—কাসাহারার প্রকৃত পরিচয় করিয়ে দেন অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে। অবনমামা তাঁর নিকট বড় তেঁতুল, বট, পাকুড় প্রভৃতি গাছকে বামন করার উপায় শিক্ষা করেন। তাঁর তৈরী একটি তেঁতুলগাছ ২২ বৎসর ধরে চিনাবাসনে ছিল, দেখলে মনে হোতো খুব বড় গাছ বামন হয়ে গেছে। আমিও তাঁর নিকট সে-প্রণালী শিখে নিয়েছিলুম।

সেই সময় গগনমামা লর্ড কারমাইকেল (Lord Carmichael) গভর্ণারের পৃষ্ঠপোষকতায় Bengal Home Industries প্রতিষ্ঠানটি খোলেন। তারফলে বঙ্গদেশের বহু মুহ্যমান কুটিরশিল্প পুনর্জীবিত হয়। মুর্শিদাবাদের সিল্ক আবার নবতরভাবে প্রচলিত হল। কোনো প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষে তখন এইপ্রকার শিল্প-প্রতিষ্ঠান খোলেননি।

গগনমামা লর্ড কারমাইলকে মুর্শিদাবাদ সিল্কের একটি খুঞ্চেপোষ ঢাকা (tray cover) উপহার দেন। বঙ্গসরকার সেটি রুমালের মত তাঁর পকেটে ব্যবহার করেন—পরে তাঁর দেখাদেখি সেটা কলকাতায় ফ্যাসানে পরিণত হল। রুমালের নাম হল 'কারমাইকেল হ্যাণ্ডকারচিপ'। প্রচুর বিক্রি হল—ফ্যাসানের খাতিরে। আর গ্রাম্য আলপনা প্রথম প্রচার করলেন অবনীন্দ্রনাথ তাঁর "বাঙলার ব্রতকথা" বইখানি প্রচার করে।

গগনেন্দ্রনাথের দ্বারা যে প্রথম ব্যঙ্গচিত্র ভারতবর্ষে প্রচারিত হয় তার কথা পূর্বেই বলেছি। আমি তাঁকে একটি ব্যঙ্গচিত্রের বিষয় বলেছিলুম, সেটি তিনি সেই বর্ণনার মতই সুন্দরভাবে এঁকেছিলেন। গল্পটি এইরূপ :—একটি ধুতি শার্ট পরা বাঙালী ভদ্রলোক ট্রেনের ভিড়ে স্থান না পেয়ে "কেবল য়ুরোপীয়দের জন্য" (Europeans only) নামদাগা তৃতীয় শ্রেণীর বিশেষ কম্পার্টমেণ্টে উঠে পড়েছিলেন। ঠিক্ সেই সময় এক কাকবর্ণ ফিরিঙ্গি তাঁকে দেখে ছুটে গিয়ে ষ্টেশন মাষ্টারকে ডেকে আনলে ভদ্রলোকটিকে সেখান থেকে উঠিয়ে দেবার জন্যে। বেগতিক দেখে, ইতিমধ্যেই বাঙালি ভদ্রলোকটি ট্রাংক খুলে প্যাণ্ট বার করে তাড়াতাড়ি পরতে আরম্ভ করলেন। ষ্টেশন মাষ্টার আস্তেই ট্রেনের জানলা থেকে গলা বাড়িয়ে ভদ্রলোক তাঁকে তখন বল্লেন, "Never mind sir, please wait a minute, I am about to become a Saheb!" গগনেন্দ্রনাথের দেখাদেখি চঞ্চল বন্দ্যোপাধ্যায়, চারু

রায় প্রভৃতি পরবর্তীকালে ব্যঙ্গচিত্র বাঙলা দেশে প্রচার করেন। গগনেন্দ্রনাথের ব্যঙ্গচিত্র এবং অবনীন্দ্রনাথের আলপনার বই বিচিত্রার লিথো প্রেস থেকেই তখন ছাপা হয়েছিল।

বিচিত্রা সভায় একদিন সকালে এলেন রবিদার কাছে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু। মুকুল তাঁর পেনসিল স্কেচ করলে রবিদার সঙ্গে কথাবার্তার সময়। আমি তখন রাম ও গুহকের বড়ছবি বিচিত্রার একটি ঘরে আঁকচি। মুকুলের ছবিখানি আঁকা শেষ হতে শ্রীমতী নাইডু দেখে পছন্দ করলেন না। শেষে রবিদা আমায় আঁকতে বল্লেন। আমার আঁকা তাঁর প্রতিকৃতি রবিদার এবং সরোজিনী নাইডুর পছন্দ হল। রবিদা তখন আমার আঁকা অন্যান্য সব ছবি তাঁকে দেখাতে বল্লেন। তিনি দেখে বল্লেন "অসিতের ছবি Lyric—আমার খুব ভাল লাগছে।" ভগ্নী নিবেদিতাও আমার আঁকা ছবিকে lyric বলতেন।

বিচিত্রা সভার অভিনয়

বিচিত্রার সভা প্রতিষ্ঠানের পূর্ব থেকেই প্রত্যেক বৎসর ১১ই মাঘের উৎসবে রবিদাদা শান্তিনিকেতন আশ্রম থেকে গাইয়ে ছাত্রদের নিয়ে আসতেন জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে কলকাতায়। তাঁদের বাড়ির দালানের ভিতরকার প্রশস্ত আঙ্গিনায় বস্‌তো উৎসবের বৈঠক। ষ্টেজ বেঁধে সামিয়ানা টাঙ্গিয়ে রবিদার বক্তৃতা এবং ছাত্রদের গান হোতো। রবিদাদার বক্তৃতা ও গান শুনতে কলকাতার বিশিষ্ট ভদ্রলোকেরা সপরিবারে আসতেন। প্রায় এক হাজার নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা আসতেন উৎসবে।

১৯১৫ সালের ৭ই পৌষে শান্তিনিকেতনে ফাল্গুনী অভিনয় দেখে কবির বন্ধুরা এবং আত্মীয়েরা ধরলেন তাঁকে কলকাতায় সেটি পুনরায় অভিনয় করতে। ১৯১৬ জানুয়ারীতে কলকাতায় ফাল্গুনী অভিনয়ের বিরাট আয়োজন হল জোড়াসাঁকোর বাড়ির আঙ্গিনায়। রবিদাদার সঙ্গে অভিনয়ে এবার যোগ দিলেন গগনমামা এবং অবনমামা। রবিদাদা তখনকার যোগ্য কবিশেখরের আগে একটি অংশ তার গোড়ায় জুড়ে দিলেন। রাজদরবারের কবিশেখর রাজার কথামত অনুষ্ঠান করবেন এই ছিল গোড়ার নিবন্ধ। সেই দরবারের রাজা হলেন গগনমামা, কবিশেখর স্বয়ং কবি এবং অবনমামা হলেন শ্রুতিভূষণ।

বইখানির আসল অংশে পূর্বের মত রবিদাদা অন্ধ বাউল সাজলেন, কোটাল সাজলুম আমি, চন্দ্রহাস—দিনুদা, দাদাঠাকুর—ক্ষিতিমোহন সেন এবং মাঝি জগদানন্দবাবু। নব বসন্তদুতে ছেলেদের সঙ্গে পিয়ার্সনও যোগ দিয়েছিলেন।

রাজদরবারটা খুব জাঁকালো অজন্তার রাজদরবারের মত করা হল—রাজ-মুকুট গহনা সব মিলিয়ে। তার পাশেই বিরাট গাঢ় নীল কাপড়ের পর্দার মধ্যে লাল শালু গোল করে কেটে তার ভিতর শ্বেত পদ্মের নক্সা সাদা কাপড় কেটে সেলাই করে দেওয়া হল। 'ঘরওয়া' বইখানিতে পদ্মের পরিকল্পনাটা অবনমামা ভুলে নন্দলাল করেছিলেন লিখেছেন। সেটি আমি করেছিলুম এবং জোড়াসাঁকোর বাড়ীর মেয়েদের দিয়ে সেলাই করিয়ে নিয়েছিলুম তা বাড়ির মেয়েরা অনেকে জানেন। রঙ্গমঞ্চর পর্দার পদ্মের নক্সা এতো লাগ্‌সই ও সুন্দর হয়েছিল যে অভিনয় দেখার পর রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুর আমাকে দিয়ে তদনুরূপ একটি চিত্র আঁকিয়ে নিয়েছিলেন। তারজন্যে দক্ষিণাও ভাল রকম পেয়েছিলুম তাঁর নিকট।

যখন নাটক রচনা করতেন এবং তার অভিনয় করাতেন, রবিদা আমাকে এবং দিনুদাকে সাবধান করে দিয়ে বল্‌তেন; "নাটকের জন্যে আমি দায়ী, গানের জন্যে দিনু আর সাজসজ্জার জন্যে আর্টিষ্ট অসিত দায়ী রইলেন।" অবশ্য কেবল মহাকবির আশীর্বাদেই এবং তাঁর দীপ্তোজ্জ্বল প্রভাবে সর্বদা আমাদের কাজে আমরা সফলতা অর্জন করতুম। দর্শকেরাও প্রীত হয়ে ফিরতেন অভিনয় দেখে।

এইবারে বিচিত্রায় 'ডাকঘর' অভিনয়ের কথা বলি। একদিন কোনো শুভ মুহূর্তে কবিকে বন্ধুবর ডক্টর প্রশান্ত মহালানবিশ এসে জানালেন যে আশামুকুল দাস নামে একটি ১০-১২ বৎসরের শিশু অমলের ভূমিকায় ব্রাহ্ম সমাজে 'ডাকঘর' অভিনয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে অভিনয় করেছেন। ডাকঘর 'প্লে' করার ভয় রবিদার সর্বদা ছিল এই অমলের পার্ট নিয়ে। ছোট শিশু অথচ স্বাভাবিকভাবে পার্টটি অভিনয় করবে এ ছিল তাঁর ভাবনার অতীত। রবিদা ছেলেটিকে আনতে বলায় মহালানবীশ তাঁকে বিচিত্রায় আনলেন একদিন রবিদার নিকট। পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখলেন আশামুকুল অভিনয় করছেন বটে কিন্তু ঠিক্ লাগসই হচ্চে না। অভিনয় ভঙ্গীর বাড়াবাড়ি করে একটা বিশেষ সুর দিয়ে টেনে টেনে শ্রীমান আশামুকুল যখন অমলের পার্ট

বলতে আরম্ভ করলেন ; "ঐ দেখ না, যেখানে ভাঙা ডালের খুদ্‌গুলি দুই হাতে তুলে নিয়ে—লেজের উপর ভর দিয়ে বসে কাঠবেড়ালী কুটুস্ কুটুস্ ক'রে খাচ্চে, ওখানে আমি যেতে পারব না ?"—কৃত্রিম আবৃত্তি শুনে কবি হতাশ হয়ে পড়লেন! অবশেষে তিনি দিনুদা এবং আমার উপর ভার দিলেন, যদি আমরা শোধ্‌রাতে পারি। আমরা দুজনে মিলে আশামুকুলকে তৈরী করলুম অমলের পার্ট নেবার জন্যে। রবিদা শুনে খুসি হলেন এবং মনোনীত করলেন আশামুকুলকে। ডাকঘর অভিনয় করতে বাধা আর রইল না তাঁর।

বিচিত্রা সভায় আসর বসলো অভিনয়ের রেয়াজ করার। গগনমামা সাজলেন ডাকঘর নাটকের প্রধান নায়ক মাধব ; অবনমামা কবিরাজ আর কোটাল দুটি পার্ট নিলেন, ঠাকুর্দা সাজলেন স্বয়ং কবি ; অমল আশামুকুল ; রথীমামা, প্রহরী ; ফকির রবিদাদা এবং দিনুদা ফকিরের সাথী ; আর দৈওয়ালা সাজতে হল আমাকে। অবনমামার ছোট মেয়ে একটি ছোট্ট পার্ট নিয়েছিলেন অমলের খেলার সাথী হিসাবে।

দৈওয়ালার পার্ট নিয়ে গোড়ায় এক গোল বাধ্‌ল। পূর্বে পূজনীয় রবিদাদা অচল আয়তনে—উপাধ্যায় ; ফাল্গুনীতে কোটাল ; রাজা অভিনয়ে, রাজার পার্ট, আমাকে দেওয়ায় বন্ধুবর অধ্যাপক অজিত চক্রবর্তী ছিলেন অভিমান কোরে। তাঁকে রবিদাদা 'দৈওয়ালা' সাজতে বলায় তিনি কুণ্ঠিত হয়ে প্রত্যাখ্যান করলেন এবং বল্লেন, "গুরুদেব, আপনার সুন্দর নাতিটিকে সর্বদা ভাল পার্ট বাছাই করে দেন, আর আমার বেলায় দৈওয়ালা ? তা হবে না!" কবি মৃদু হাস্যে আমার দিকে তাকিয়ে বল্লেন, "তা, তুই কি বলিস্ অসিত ? —দুইওয়ালা হবি ?" আমি 'তথাস্তু' বলে মেনে নিলুম। তারপর একসঙ্গে টেবিলে খাবার সময় রবিদা আমার রহস্য ভেদ করে বল্লেন : "অসিত, তুই আইডিয়াল দৈওয়ালা সাজবি—অজিতকে তাক্ লাগিয়ে দিবি—এখন কাউকে কিছু বলিস্‌নে।"

ষ্টেজ বাঁধার পালা পড়ল। জোড়াসাঁকোর লালবাড়ির দোতলা হল-ঘরের একপাশে উঁচু করে ষ্টেজ বাঁধা হল বিচিত্রভাবে—দরমা চালা বেঁধে—গোবর-মাটি লেপে আলপনা কেটে। পিছনে গবাক্ষে গাঢ় নীল পর্দায় রুপোলি কাগজে চাঁদ কেটে লাগানো হ'ল তাতে। অভ্রের টাসেল্ দেওয়া সিকেতে রং করা মাটির হাঁড়ি ঝুলিয়ে মাটির পিলসুজে প্রদীপ জেলে রঙ্গমঞ্চ এক

অপূর্ব শ্রীধারণ করল। সাধারণ ষ্টেজের সিনপেন্টিং এতে মলিন হয়ে গেল একেবারে। সাম্‌নের যবনিকায় নীল পর্দা টানা হল।

পূর্বেই বলেচি দুমাস ধরে রিহার্সাল এবং পার্ট ভাল করে সবাইকার মুখস্ত না হলে অভিনয় করা হতো না—এবারও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। অভিনয় নিখুৎ করাই কবির তাৎপর্য ছিল। ডাকঘরের ষ্টেজ বিচিত্রার শিল্পীত্রয় (নন্দ, মুকুল আর আমি) রচনা কর্‌চি—রবিদা এসে মাঝে মাঝে দেখচেন। ডাকঘরের জন্য সেই সময় একটা নতুন বাউল সঙ্গীত রচনা করলেন: "ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে?" তাঁর হাতের সেই খসড়াটা আজও আমার কাছে আছে। সেই সময় হঠাৎ আমার নিজের আঁকা ছবিতে নাম অঙ্কিত করার উপযুক্ত একটি সিলমোহরের নক্‌সা এঁকে আমায় উপহার দিয়েছিলেন। আমি পূর্বে ছবিতে যেভাবে নামাঙ্কিত করতুম তার বদলে তারপর থেকে রবিদাদার পরিকল্পিত সিলমোহর আজ পর্যন্ত ব্যবহার করচি। তাঁর সেই নক্সা তাঁর আশীর্বাদ স্বরূপই গ্রহণ করেছিলুম। তাঁর স্বহস্তে আঁকাটি আজও আছে আমার কাছে।

তারপর, 'ডাকঘর' অভিনয়ের দিন আমাদের উপর যথা নিয়মে ভার পড়ল অভিনেতাদের সজ্জিত ক'রে তোলার; গগনমামা সহায় হলেন। আর সকলকে সাজানোর পর নিজে সাজলুম 'দৈওয়ালা'। প্রতিমামামীর কাছ থেকে কাঁচ বসানো কাঠিওয়ারী কাপড় নিয়ে তার একটি গ্রাম্য ধরণের বাণ্ডি জামা করালুম এবং রথীমামার বিবাহের বেনারসি চেলির জোড় ধুতি আর পাগড়ি হিসাবে পরে সাজলুম দৈওয়ালা। বাঁশের ভারবহনের বাঁকটিকে লাল শালু এবং জরি দিয়ে মুড়ে নিয়ে তার দুধারে যশোরের অভ্র আর জরির কাজ করা দুটো ঝল্‌মলে 'সিকে' ঝুলিয়ে তার মাঝে রাখলুম পিতলের মোরাদাবাদি নক্সাকারি দুটি পালিসকরা ঘড়া। সেই সব তোড়জোড় করে বাঁক নিয়ে যখন সেজে দাঁড়িয়েচি দৈওয়ালার সাজে, গ্রীনরুমে (সাজঘরে) ঢুকে এলেন বন্ধুবর অজিত চক্রবর্তী। আমার রাজসিক দৈওয়ালার সাজ দেখে একেবারে ব্যাকুল হয়ে পড়লেন তিনি; থাকতে না পেরে রবিদাদাকে সেখানে ডেকে আনলেন দেখাবার জন্যে আমার স্পর্দ্ধা। রবিদা সাজঘরে এসে সকৌতুক-ভঙ্গীতে আমাকে দেখে ঈষৎ হেসে বল্লেন "এঁ্যা, আর্টিষ্ট এ কি করেচিস্? তা' বেশ, এও মন্দ হ'বে না—আইডিয়াল দইওয়ালা।" বলেই চলে গেলেন।

বিচিত্রা সভার অভিনয়

এই ডাকঘর অভিনয় কলকাতার একটি স্মরণীয় ঘটনা। বহু গণ্যমান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন অভিনয়ে। সৌম্য আর বুলা মহালনবিশ দিনুদার পরিচালিত সঙ্গীতের সঙ্গে বাঁশি বাজিয়ে চমৎকৃত করেছিলেন সবাইকে। সবাই মন্ত্রমুগ্ধবৎ দেড় ঘণ্টা ধরে এই অভিনয় দেখেছিলেন। কলকাতার বিখ্যাত ফটোগ্রাফার Jhonston and Hoffmann ডাকঘরের নানা দৃশ্তের ছবি তুলেছিলেন। এই অভিনয়ের শেষে আবার যখন অভিনয় হল সেটিতে বিশেষভাবে কংগ্রেসের অধিবেশনের নেতারা উপস্থিত ছিলেন। মিসেস বেসেণ্ট, মদনমোহন মালবিয়া, মহাত্মা গান্ধী লোকমান্ত তিলক এসেছিলেন অভিনয় দেখতে।

বিচিত্রা সভায় তারপর হয়েছিল "বৈকুণ্ঠের খাতা" অভিনয়। গগনমামা, অবনমামা, সমরমামা, তিন ভাই পার্ট নিয়েছিলেন তাতে এবং দিনুদা প্রভৃতি সবাই তাতে একটা-নাএকটা পার্ট নিয়েছিলেন রবিদাদার সঙ্গে একযোগে। আমার অভিনয়ের জন্তে 'বৈকুণ্ঠের খাতা'তে একটা বখা পাঁচুর পার্ট আরো লিখে জুড়ে দিলেন রবিদাদা। পাঁচুর 'মেকাপ্' এমন হয়েছিল যে ষ্টেজে আমার পরিচিতেরাও আমাকে দেখে চিনতেই পারেননি। রবিদাদার করা এই অভিনয়ও বিচিত্র হয়েছিল এবং সবাই দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। রবিদাই প্রথম সনাতন থিয়েটারি বিশেষ ভঙ্গীতে টেনে টেনে কথা ব'লে অভিনয় করার রীতি ভেঙ্গেছিলেন। গতানুগতিক থিয়েটারি ন্যাকামি তাঁর মোটেই পছন্দ ছিল না।

এখন এই বিচিত্রার কালে ঘরোয়াভাবে মেকাপের ও অভিনয়ের খেলার কথা বলি। আসলে এর পরীক্ষা নিলেন রথীমামা আমার কাছে। প্রতিমা-মামীর গেল গলার দামী একটা সোনার হার চুরি। নেপালি একটা ছোক্‌রা চাকরের উপর হলো রথীমামার সন্দেহ। বল্লেন ছোক্‌রাটাকে ভূতের ভয় দেখালে সে হার নিশ্চয় বার করে দেবে। বল্লেন "তোমার মেকাপ আর অভিনয় করার ক্ষমতাকে একটা কাজে লাগাও অসিত।" ভূতের অভিনয় করতে হলো। প্রথমে সাজগোজ করে রথীমামাকে জানিয়ে ঢুকলুম্ দিনুদার ঘরে। তিনি ঘুমোচ্ছিলেন—জেগে উঠে দেখে ভয়ে আঁৎকে উঠলেন। তখন রথীমামা তাঁকে আমাদের সব প্ল্যান জানালেন। ছোক্‌রা নেপালি চাকরকে ভূতের ভয় দেখাবারমাত্র সে হারটা পাপোষের নিচে যেখানে লুকিয়ে রেখেছিল

প্রকাশ করে দিলে। হার পাওয়া গেল অবিলম্বে। এও বিচিত্রার একটি বিচিত্র পার্ট হয়েছিল তখন।

বিচিত্রা সভার কালে আরো কথা

অবনমামা গগনমামা আসতেন রবিদাদার কাছে, অনেক কথা তখন আর্টের বিষয় আলোচনা হোতো। ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত ও তাঁর কন্যা মৈত্রেয়ীও মাঝে মাঝে তাতে যোগ দিতেন। যে সব গভীর বিষয় তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করতেন কবি তা সব সময় তখন বুঝতেও পারতুম না আমি। শিব, শক্তি নিয়ে একদিন বল্লেন একদিন বৈষ্ণব, শৈব ও শাক্ত দর্শনের বিষয় আলোচনা করলেন। তিনি উপনিষদের এক ঈশ্বর চিন্তায় দীক্ষা পেলেও হিন্দু দর্শনের সকল বিষয় তাঁর অনুপ্রবেশ ছিল। তিনি কবিও ছিলেন এবং দার্শনিকও ছিলেন। তাই তাঁর কাব্য কেবল love and lust নিয়েই শেষ হয়নি। তাঁর হিন্দুত্ব পুঁথিগত হিন্দুত্ব ছিল না—অত্যন্ত গভীর ছিল তাঁর অনুভূতি। তিনি য়ুরোপের দার্শনিক মতবাদের বাস্তবতান্ত্রিক সীমাও বুঝতেন এবং হিন্দুদর্শনের আধ্যাত্মবোধের গতি যে কত দূর তাও জানতেন।

একদিন রবিদাকে অতর্কিতে দেখতে পেলুম ধ্যান মগ্নভাবে বসে আছেন। মনে হল যেন সব ঋজুরেখা উত্তুঙ্গ শিখরের মত দাঁড়িয়ে আছে (Gothic structure)। কেবল 'ঋজুরেখা' (Straight line) দিয়েই তাঁর ধ্যান মূর্তি এঁকে তুললুম। বলা বাহুল্য ১৯১৭তে বিলাতের কিউবিষ্ট আর্টের আন্দোলন তখনো প্রচার হয়নি বহুলভাবে এবং আমার মাথায়ও তার অনুকরণের দুর্বুদ্ধি চাপেনি। রবিদার সেটি দেখে খুব ভালো লেগেছিল এবং তাতে তাঁর নাম সই করে দিতে বলায় ঋজুরেখাতেই ঠিক ছবিটির মতন করে মিলিয়ে তাঁর নাম লিখে দিলেন। ছবির সঙ্গে যেভাবে ছন্দ মিলিয়ে নামটি তিনি লিখেছিলেন তাতে তখন লোকেরা তা' যে তাঁর লেখা, বুঝতেই পারেননি। তাঁর কাব্যের ছন্দজ্ঞান ললিতকলায় যে কি করে খাটল তা' বোঝা শক্ত কেননা ললিতকলায় তার জন্যে রীতিপদ্ধতির শিক্ষার প্রয়োজন আছে।

চিত্রকলায় আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন ক্রমাগত। তখন যাচ্ছেন বিলাতে (১৯১৩-তে) অস্ত্রচিকিৎসার জন্য। আমাকেও সঙ্গে নিতে চেয়েছিলেন। অদৃষ্টের বৈগুণ্যে যেতে পারিনি। আমায় শান্তনা দিয়ে বসেছিলেন তখন

"চারু শিল্পের ভাষা সর্বজনীন—একদেশের ছবি অন্য দেশের লোক বুঝতে পারে কিন্তু সাহিত্যের বেলায় ভাষার বেড়া আছে অন্য দেশের লোকের জন্যে তার তর্জমা করার প্রয়োজন হয়। তোর হাতে যখন (সার্বজনীন) আর্ট আছে, কুঁড়েমি করিসনে। আমার হাতে রঙ তুলি থাকতে ছবির পর ছবি এঁকে যেতুম।" এই কথাগুলি তখন 'ছিটে ফোঁটা' নাম দিয়ে আর্টের বিষয় লেখায় পরিবেশন করেছিলুম। Rupam-এ তাঁর ইংরাজি তর্জমা বেরিয়েছিল ডক্টর অমিয় চক্রবর্তীর করা এবং আমার art and Tradition বইয়ে তা' স্থান পেয়েছে।

বিচিত্রাতে পাশের ঘরে একটি পিয়ানো ছিল। একদিন রবিদা সৌম্যকে আর আমাকে নিয়ে গেলেন লালবাড়ীর (বিচিত্রার) সেই ঘরে। পিয়ানো বাজিয়ে দুটি তাঁর পুরোনো গান আরো খানিকটা রচনা করে বাড়িয়ে গাইলেন। একটি গানের গোড়া "পথ ভুলো এ পথিক" আর একটি "অলকে কুসুম না দিও।" গান দুটি সৌম্য আর আমি শিখে নিলুম বটে কিন্তু রবিদার মনঃপূত হল না। বল্লেন "ওরে আমার সুর-সুন্দরীকে তোরা সহজে বশে রাখতে পারবিনে—একা দিনুই তা পারে।"

বিচিত্রার আর একটি বিচিত্র অনুষ্ঠানের কথা বলি। সেটা ছিল কবি-পুত্র রথীন্দ্রনাথের বিবাহবাৎসরিকের উৎসব দিন। রবিদাদা তাতে যথানিয়মে শুধু ঘরওয়াভাবে আত্মীয়দের নিমন্ত্রণ না করে, করলেন বিচিত্রা সভার সভ্যদের নিমন্ত্রণ। খাবার ঘর বিচিত্রভাবে সাজানোর ভার পড়ল বিচিত্রার তিনটি শিল্পী নন্দলাল, মুকুল এবং আমার উপর। রবিদাদা গগনমামা এবং অবনমামার সঙ্গে পরামর্শ করে আমরা স্থির করলুম বিবাহের 'শালগিরা' উৎসবে সব জিনিষ লাল হওয়া চাই। গোলাপি রঙে নিমন্ত্রণপত্র ছাপা হল এবং তাতে অনুরোধ করা হল আমন্ত্রিত অভ্যাগতরা যেন বিবাহিত হলে তাঁদের বিবাহের লাল চেলির চোলির জোড় পরে আসেন আর অবিবাহিত হলেও লাল জামা কাপড় চাদরে আসতে হবে নির্দিষ্ট সময়ে রাত্র-ভোজে। মেঝের উপর গোলাপি রঙে আলপনা দেওয়া হ'ল। প্রত্যেকের জন্যে লাল কার্পেটের আসনের সামনে রাখা হল জলচৌকি থালা রাখার পিতলের দীপধারে প্রদীপ রেখে দীপালোকে উজ্জ্বল করা হল ধূপবাসিত কোরে।

খাবারের জিনিষও তৈরী হলো যতদূর সাধ্য লাল রঙের। লাল পোলাও, লাল সন্দেশ লাল রঙের পিঠে ইত্যাদি ভূরিভোজের ব্যবস্থা হল। পিঠেগুলো লাল করম্‌চার কাটা সমেৎ ডালে গেঁথে—'পিঠে গাছ' তৈরী করে সকলের সম্মুখে রাখা হল। অনেকে সেটাকে কেবল সজ্জার একটি অঙ্গ বলে মনে করে ছুঁলেনও না। অতিথিদের প্রথমেই লাল ফুলের মালায় এবং রক্তচন্দনে আহ্বান করা হয়েছিল। রথীমামা এবং প্রতিমামামী বিবাহের জোড়ে এলেন। চিত্রপত্র কপালে এঁকে বরকনের সজ্জায় শঙ্খধ্বনি, হুলুধ্বনি, লাজবর্ষণ বংশীধ্বনি ও সঙ্গীত কিছুরই ত্রুটি ছিল না ভোজের সময়। আমরা তিনজন আর্টিষ্টও রঙিন বেশে বসে গেলাম। এইভাবে ভোজের সময় নিরস খাবারের উৎকটভাবকে রবিদা আর্টে পরিণত করে প্রথম দেখালেন সবাইকে। পরে এইভাবে আশ্রমেও খাওয়া দাওয়া হয়েছিল সুষ্ঠুভাবে কয়েকবার। মারমুখে শুনেছি পূর্বেও কখনো কখনো এরূপ বিচিত্রভাবে ভোজের ব্যাপার রবিদা জোড়াসাঁকোতে করিয়েছিলেন।

কবিগুরু এবং শিল্পগুরু (রবীন্দ্রনাথ এবং অবনীন্দ্রনাথ) উভয়ে এইভাবে বিচিত্রায় তখন দেশের বোনেদি কৃষ্টিকে নানাপ্রকারে সঞ্জীবিত করে প্রচার করতে চেয়েছিলেন, বসনে, ভূষণে, ব্যবহারে দেশের নিজস্ব বোনেদি জিনিষকে আধুনিক যুগের উপযোগী করে তুলে ধরেছিলেন সকলের সামনে। কৃত্রিম স্বদেশীয়ানা এর ভিতর ছিল না—ছিল সৃষ্টির নবোদ্যম। বিলাতি শিক্ষার আবহাওয়ায় দেশ যখন উৎসন্ন যাবার দিকে প্রবলবেগে চলেছিল তখন তাঁরা দেশের নিজস্ব সংস্কৃতির পরিকল্পনার প্রাণ-শক্তি সম্পদকে এই ভাবে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। সেই রঙিন দিনের ঘটনাবলী আজও মনে উঁকি মারে।

১৯২৪-এ যখন জয়পুরের আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ হয়ে গিয়ে সেখানকার রাজ-দরবারের রীতি দেখেছিলুম। দরবারিদের ঋতু ও কালোচিৎ উৎসবে উপযোগী বর্ণের পোষাক পোরে রাজদরবারে যেতে হোতো। এইরূপ ঋতু উৎসবের কথা প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যে অনেক দেখা যায়। ঋতু উৎসবও রবিদাদা প্রবর্তন করেন আশ্রমে নবীনরূপে তাঁর রচিত গান ও নৃত্যের মধ্যে দিয়ে সে কথা আজ সকলেই জানেন।

রবিদাদার নিকট থাকার কালে সে সময় কত অমূল্য শিক্ষণীয় কথা শুনেছি কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তা' এখন সব হারিয়ে বসেছি। লিখতে লিখতে মনে পড়ল একটা কথা। একদিন রবিদাকে প্রশ্ন করেছিলুম "রবিদা ঈশ্বর

জানিত কোনো মহাপুরুষের কি দর্শন পেয়েছেন কখনো?" তিনি অল্পকাল মৌন থেকে একটি ঘটনার কথা বল্লেন :

আমি তখন আমার হাউস বোটে (বাজরায়) পদ্মা-বক্ষে শিলাইদহের নিকটে একটি পণ্ডগ্রামের সাম্‌নে বাস করছি। রোজ দেখি নিজের বোটে বসে, নদীতীরে পর্ণকুটিরে একটি জরাজীর্ণ কঙ্কালসার বৃদ্ধ জেলে থাকে, সে রোজ নদীতে জাল ফেলে যে কটা মাছ পায় বাজারে বিক্রি করে আর সেই পয়সায় চাল ডাল কিনে এনে রেঁধে খায়। এইভাবে নিঃসঙ্গ জীবন সে যাপন করে। কিন্তু মাঝে মাঝে দেখ্‌তুম গ্রামের দুরন্ত ছেলেরা এসে "এই হরিবোলা—এই হরিবোলা—বল্‌ হরি হরি বোল।" বল্লেই তখন সে নদীতে জাল ফেলা ভুলে গিয়ে তাদের সঙ্গে দুহাত তুলে হরিবোল বলে নৃত্যে জুড়ে দিতো—নাওয়া খাওয়া সেদিন তার ঘুচে যেতো—অভুক্ত থাকত সে। সেই আমি দেখছি একজন ঈশ্বর জানিত মহাপুরুষকে।"

মাছ ধরে জেলে বিক্রি করে এবং সেই পয়সায় খায়—এই জীব-হিংসা-কারী ব্যক্তিকে যে কবি ঈশ্বর-জানিত পুরুষ বল্লেন তার দৃষ্টান্ত মহাভারতে (বনপর্বে) আছে :

ব্রাহ্মণ তাপস কৌশিক তরুতলে বসে স্বাধ্যায় নিরত আছেন, হঠাৎ তার মাথায় একটি বক মলত্যাগ করলে। তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে তারপ্রতি তাকাতেই সে ভস্মিভূত হল। দেখে কৌশিক অত্যন্ত অনুতপ্ত হলেন এবং ভিক্ষার্থে তাঁর পরিচিত এক গৃহস্থের গৃহে গেলেন। গৃহিনী তখন নিত্য-করণীয় গৃহকর্মে নিযুক্ত ছিলেন, কৌশিককে দ্বারে অপেক্ষা করতে বোলে ঘরে প্রবেশ করেই দেখেন সেই মুহূর্তে তাঁর স্বামী কর্মান্তে ক্লান্ত ও ঘর্মাক্ত কলেবরে বাড়ি ফিরেছেন।

গৃহিণী ব্রাহ্মণ কৌশিকের কথা না-ভেবে পূর্বে পতি সেবার-সকল কর্তব্য সমাধা করলেন। পরে পতিকে বিশ্রাম করতে দেখে গৃহিনী আবার আগন্তুক কোশিকের নিকট গেলেন। তখন কৌশিক তাঁকে ভয় দেখিয়ে বল্লেন "এই ব্রাহ্মণকে তুমি উপেক্ষা কোরে অপমান করলে, তোমার স্বামীকে অতিথি অপেক্ষা তুমি শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করলে—জানো, এর পরিণাম কী? ব্রাহ্মণ অতিথি তোমাকে দগ্ধ করতে পারেন।" গৃহিণী তখন কৌশিককে বোঝালেন "স্ত্রীর পক্ষে পতি পরমগুরু এবং তাঁর সেবা যথোচিত

ভাবে করলে কোনো ব্রাহ্মণ অতিথিরই অভিশাপ গায়ে লাগে না। তুমি বককে ভস্মীভূত করেছ বলে আমায় তুমি কিছুই করতে পারবে না।" কৌশিক তখন ক্রোধ পরিহার করাতে গৃহস্থ বধূ উপদেশ দিয়ে আবার বল্লেন তাঁকে জনকপুরে গিয়ে এক ধর্ম-ব্যাধের নিকট উপদেশ নিতে।

কৌশিক তারপর সেখান থেকে জনকপুরে গেলেন। দেখলেন ধর্মব্যাধ তাঁর দোকানে বসে মৃগ ও মহিষের মাংস বিক্রি করচেন। কৌশিক এরূপ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করে বিস্মিত হলেন। তখন ধর্মব্যাধ তাঁর মনোভাব বুঝতে পেরে তাঁকে বল্লেন: "আমায় বিধাতা যে ধর্ম দিয়েছেন তাই পালন করছি; পিতামাতার সেবা করি মাংস বেচে উপার্জ্জনের দ্বারা; সদা সত্যকথা বলে থাকি, রাগ বা হিংসা করি না, দান করি, মাংস খাই না, দেবতা অতিথি এবং ভৃত্যদের ভোজনের পর অন্ন গ্রহণ করি।" এই হিসাবেই রবিদা জেলেটিকেও ঈশ্বর জানিত পুরুষ বলেছিলেন। মাছ ধর্তো বোলে উপেক্ষা করেননি।

হাউসবোটে থাকার কালে রবিদাদা একবার নিজে কিভাবে সন্ধ্যাবেলায় পদ্মার জলে ভেসে যাওয়া একটি মেয়েকে নিজে উদ্ধার করেছিলেন তার কথা তাঁর পুত্র রথীন্দ্রনাথ সম্প্রতি তাঁর ইংরাজিতে লেখা একটি পুস্তকে বর্ণনা করেছেন। (On the Edges of Time by Rathindranath Tagore Page 36)

বিচিত্রার কালে আমার দুটি স্মরণীয় ঘটনা

এই সময় দুটি ঘটনা ঘটলো—আমার ভাগ্যে একটি সুখকর, অন্যটি দুঃখের। সুখকর ঘটনাটি এই যে, এই দেশে আর্টের কদর করতে পূজনীয় রবিদাদা ছাড়া খুব অল্প লোককেই দেখেছি। তখন 'ডাকঘর' রিহার্সাল হচ্চে বিচিত্রায়। হঠাৎ সেখানে বন্ধুবর অমল হোম এসে আমায় বল্লেন প্রাচ্য শিল্প সমিতির প্রদর্শনীতে আমার 'প্রণাম' *আর সুরের আগুন (অগ্নিময়ী সরস্বতী) দেখে

*প্রণাম ছবিটির Pose রবিদাদা আমাকে নিজে ঐভাবে অভিনয় করে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। আমার ছবির মত প্রণামের ভঙ্গি যে অজন্তার একটি ছবিতে আছে তা তখন রবিদাদা জানতেন না এবং আমিও সে কথা ভুলে গিয়েছিলুম।



শ্রীনিকেতনের অধ্যক্ষ এলম্‌হার্স্ট



অধ্যাপক বেনোয়া

বিচিত্রার কালে আমার দুটি স্মরণীয় ঘটনা

দিল্লি থেকে আগত খৃষ্টান দম্পতি মোহিত হয়েছেন এবং আমার সাক্ষাৎ পরিচয় করতে চান। রবিদা শুনে ধমক দিয়ে বল্লেন, "না, তোকে যেতে হবে না রিহার্সাল ফেলে—শেষটা ভক্তদের পাল্লায় পড়ে গুরুভোজ কোরে অসুখে পড়বি, সব মাটি হয়ে যাবে অভিনয়।"

পরে শুনলুম ভক্তযুগল আমার সাক্ষাৎ না পেয়ে অত্যন্ত দুঃখীত হয়েছিলেন এবং যে-কদিন তাঁরা বড়দিনের ছুটিতে কলকাতায় ছিলেন প্রদর্শনীতে এসে মুগ্ধ হয়ে দেখতেন। আর্টের ভক্তের সাক্ষাৎ দীর্ঘ জীবনে কম ঘটেছে। এই বৃদ্ধ বয়সে সুদূর মাদ্রাজ থেকে ডাক্তার সত্যনারায়ণ এসেছিলেন আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এবং আমার আঁকা ছবি দেখতে। যাঁরা এদেশে আর্টের রসিক বা ক্রিটিক বোলে খ্যাত তাঁরা ভুলেও কখনো আমার মত শিল্পীর ছায়াও মাড়ান না—এ দেশের এই এক বিশেষ গুণ।

আর দুঃখের ঘটনা একটা ঘটেছিল তখন। যামিনীদাদা (শিল্পী যামিনী প্রকাশ গাঙ্গুলী) বিচিত্রায় এসে আমায় খবর দিলেন কলিকাতা গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ Percy Brown আমাকে আর্ট স্কুলে চাকরি দিতে চান। কাজটা হবে অবনমামার ক্লাসের কাজ—(ভাইস্‌প্রিনসিপ্যালের কাজ) আর বেতন পাব Subordinate Educational Service-এর। বাবাকে সেই কথা জানাবার মাত্র তিনি আদেশ দিলেন শান্তিনিকেতনে না গিয়ে আর্টস্কুলের কাজে যোগ দিতে। আমি অতি দুঃখে শেষে রবিদাকে বোলে কিছুদিনের জন্য সরকারি কাজ নিয়ে কলকাতার আর্টস্কুলে মাষ্টারি করলুম। অবনমামার ক্লাসে (Advanced Design Class-এ) ঈশ্বরী প্রসাদ তখনও মাষ্টার, আমি তাঁর সঙ্গে কাজে নিযুক্ত রইলুম। ছাত্র হিসাবে পেলুম হিরাচাঁদ দুগাড়, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, নটেশন, সর্বাধিকারী, মহাবীর প্রসাদ, অর্দ্ধেন্দু বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকজনকে।

রবিদা তখন আমার স্থলে আশ্রমে নন্দলালকে পেয়েও পাচ্ছেন না এই এক তাঁর বিভ্রাট ঘটল। একদিকে তিনি আহমেদাবাদ ও বম্বে ভ্রমণ কালে কতকগুলি তাঁর ধনী ভক্তের মেয়েরা চাইলেন কলাভবনে যোগ দিতে আর অন্যদিকে তখন আমি আর কলাভবনে (আশ্রমে) গেলুম না ফিরে। নন্দলাল প্রাচ্য কলা পরিষদে (Oriental Art Society-তে) তখন ২০০৲ মাসিক বেতনে নিযুক্ত আছেন।

সেই সময় শান্তিনিকেতন থেকে আমার এক মাসতুতো বোন কুমারী এলা চট্টোপাধ্যায় (তিনিও রবিদার বড়দিদির নাতনী) ফিরে এসে আমায় জানালেন আশ্রমে রবিদাদা আমাকে ডেকেছেন বিশেষ জরুরি ব্যাপারে। এদিকে আমার পিতৃদেব চাননা যে আমি আর্টস্কুলের গভর্ণমেণ্টের চাকরি ছেড়ে আবার আশ্রমে যাই। আমি আশ্রমে যেতেই রবিদা কলাভবন চালনার তখন তাঁর সব অসুবিধার কথা খুলে আমায় বল্লেন এবং আশ্রমে থাকাতে আমার কি লাভ হচ্ছে বাবাকে পত্র দ্বারা লিখতে চাইলেন। কিন্তু পাছে বাবা তাতে ভুল বোঝেন তাই রবিদাকে পত্র লিখতে তখন বারণ করেছিলুম। কিন্তু এণ্ড্রুজ এবং বড়দাদা মহাশয় উভয়েই আমার অবস্থা বুঝতে পেরে বাবাকে যে তখন পত্র দেন তাই নীচে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। এণ্ড্রুজ সাহেব লিখলেন :

My dear Mr. Haldar, I feel very strongly indeed that you are making a very great mistake in asking Asit to go back into Government service. It will certainly ruin his Art,—which is now rapidly bringing him into the rank of the leading artists of the day and will soon win him recognition in Europe.··· ···I am not well in health and travelling is very trying to me in my present weak health. But what I hope you will be able to do by letter, is to give me the assurance that you will trust my judgement in the matter and leave him in my hands. Yours very sincerely— C. F. Andrews.

বড়দাদা মহাশয় বাবাকে লিখলেন :

প্রিয়দর্শন সুকুমার,—অসিতের নির্বাসনের হুকুম আসাতে আমরা সকলেই দুঃখিত। অসিতের চিত্রাঙ্কন প্রতিভা দিন দিন অল্প অল্প করিয়া বিকশিত হইতেছে। আমরা চক্ষের সামনে প্রত্যক্ষ করিয়া কোন প্রাণে তাহাকে বিদায় দিব—তুমিই বা কোন প্রাণে তাহার নবোন্মেষিত প্রতিভাকে—লক্ষ্মী সরস্বতী উভয়েরই সাক্ষাৎ কৃপাদৃষ্টির প্রসাদকে Government service-এর পেষণী যন্ত্রের পদতলে সমর্পণ করিতেছ? আমার যেহেতু ধ্রুব বিশ্বাস যে, তুমি জল্লাদ নহ—এইজন্যে এই পত্রের উত্তরের প্রতীক্ষায় আমি অসিতকে জোর করিয়া ধরিয়া রাখিলাম। লক্ষ্মী সরস্বতী উভয়েই সমস্বরে বলিতেছেন যে, অসিতের প্রতিভাকে পেষণী-যন্ত্রে সমর্পণ করিলে তাহার এ কুল ও-কুল

দু-কূল যাইবে—Government service-এও তাহার মন বসিবে না—তাহার প্রতিভাও বন্ধনদশায় আধমরা হইয়া গুম্‌রাইতে থাকিবে। এখানে সরস্বতী তাহাকে inspiration প্রদান করিয়া তাহার ছবি বিক্রয়ের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিবেন। এটা আমার কল্পনা নহে—ইহারই মধ্যে অসিত ছবি বিক্রয় করিয়া যথেষ্ট অর্থ মধ্যে মধ্যে হস্তগত করিয়াছে ইহা আমাদের সকলেরই দেখা কথা। এখন আর সেকাল নাই—ছবির demand দিন দিন বাড়িতেছে—এরূপ সুবিধা সত্ত্বেও অসিতের geniusকে Government service-এর পেষণী-যন্ত্রে পদদলিত হইতে দিবে তুমি কোন্ প্রাণে? তোমার একখানি লম্বা পত্র এইমাত্র পাইলাম। এখনো তাহা পড়িয়া দেখি নাই—পড়িয়া তাহার উত্তর দিব। শুভাকাঙ্খী বড়মামা শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।"

বড়দাদা এবং এণ্ড্রুজ সাহেবের পত্রের ফলে এ যাত্রায় আমি রবিতীর্থ-আশ্রমে থেকে গেলুম। কলকাতা গভর্ণমেণ্ট আর্টস্কুলের কাজ থেকে ছুটি নিলুম। এতকাল ধরে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে কোনো অধ্যাপকই সস্ত্রীক থাকতেন না। নারীবর্জিত আশ্রম ছিল। সস্ত্রীক থাকার নিয়ম প্রচলিত হওয়ায় রবিদা আমায় কলকাতা থেকে ফিরে আসার কালে লিখলেন ঃ

"কল্যাণীয়েষু—পূর্বেই লিখেছি এখানে তোর ঘর ঠিক হয়ে গেছে। ঘরকন্নার জিনিষপত্র এনে ফেল্‌লে কোনো অসুবিধা হবে না, অবশ্য প্রধান আসবাবটিকে আন্‌তে ভুলিসনে—এখানে আমার একটি নাতবৌ আছে দুটি হবে—অধিকন্তু ন দোষায়। —আসচে শনিবারে এখানে গভর্ণর আসছে। তার আগে তোর আসা চাই। যখন গভর্ণর কলাভবন দেখতে আসবে তখন কলানাথকে খাড়া করতে না পারলে সে দেখবে কি? এইবেলা তুই এসে কলাভবনটাকে ভাল করে সাজিয়ে নে—শীঘ্র আয়, একটুও দেরী করিসনে—এখানে কুইনাইনের আয়োজন রাখবো। তোর জিনিষপত্র প্যাক করার ভার কোনো যোগ্য লোকের উপর দিস্, এসব কাজ আর্টিষ্ট মানুষের যোগ্য নয়। কলাপ্রিয় হনুমান আর্টিষ্ট ছিল, সেতু নির্মাণে তার পরিচয়;—সে গন্ধমাদনও বহন করেছিল কিন্তু হাওড়া ষ্টেশনে মাল চালান করতে সে কখনই পারত না—এই কথা মনে রেখে শীঘ্র চলে আয়—মাল শুদ্ধ পিছনে টেনে আনবার চেষ্টা করলে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড বেধে যাবে—সে চুকতে অনেক দেরি। —রবিদাদা"

একটি সে সময় তার'ও পেলুম রবিদার কাছে "Come to arrange Art Hall, Governor comes saturday."

আশ্রমে গভর্ণরদের শুভাগমন

১৯১৯এ আবার আশ্রমে সস্ত্রীক এলুম—সঙ্গে তখন একমাত্র পুত্র অভিজিৎ ছিল। আশ্রমে গভর্ণরদের আসার কথা বলার পূর্বে একটি কথা বলি। ১৯২১-এ একটি আকস্মিক ঘটনা যা হল তার দ্বারা অশেষ গুণসম্পন্ন পূজীয় রবিদাদার একটি ঔদার্যের পরিচয় দিতে পারব বলেই উল্লেখ করছি—কেননা এটা অত্যন্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার।

শান্তিনিকেতনে আমার প্রথমা কন্যা অতসী জন্মালেন ১৯২১ সেপ্টেম্বারে। ঠিক তার অব্যবহিত পরে একদিন দেখি আমার কন্যাটির মতই সুশ্রী একটি শিশু কন্যাকে আমার স্ত্রী কোলে নিয়ে বসে আছেন। জিজ্ঞাসা করায় তাঁর কাছে জানতে পারলুম যে আমাদের কুটিরের নিকটবর্তী একটি কুটিরে ৩।৪টি শিশুপুত্র ও কন্যা নিয়ে সস্ত্রীক একজন গুজরাটি ভদ্রলোক সম্প্রতি এসেছেন। ভদ্রলোকটির স্ত্রীর শিশুকন্যা হবার পর সূতিকা ব্যাধিতে মানসিক বিকারগ্রস্ত হওয়ায় শিশুকে সময়মত স্তন্যদানে মানুষ করতে অক্ষম। শিশুকন্যাটি সমেৎ আশ্রমে এসেছেন—উদ্দেশ্য, অন্য শিশুপুত্রদের আশ্রমের শিশুবিভাগে রেখে ভদ্রলোক দেশে ফিরে যাবেন।

ঠিক সেই সময় ডিসেম্বার মাসে আমাকে যেতে হল সদলবলে বাগগুহায় ভিত্তিচিত্রের অনুলিপি নেবার জন্যে। বাগগুহায় অবস্থানকালে আমার স্ত্রীর পত্রে জানলুম যে গুজরাটি ভদ্রলোক রক্ষণাবেক্ষণের সম্পূর্ণ ভার আমার স্ত্রীর উপর দিয়ে শিশুকন্যাকে তাঁর নিকট রেখে সপরিবারে দেশে ফিরে গেছেন। আমি পত্নীর সাহস দেখে বিস্মিত হলুম কেননা কোলে তখন তাঁর ঠিক সেইরূপ কচি শিশুকন্যা অতসী রয়েছে। আবার কিছুদিন পরে আমার স্ত্রীর পত্র বাগগুহায় থাকার কালে পেলুম। রবিদা নাতবৌকে (আমার স্ত্রীকে) দেখতে এসে এই ব্যাপার জানতে পেরে নিঃসন্তান দিনুদার স্ত্রী এবং রথীমামার স্ত্রীকে (প্রতিমামামীকে) বলায় কন্যাটির সম্পূর্ণ ভার নিতে বলেছেন। কন্যাটিকে নিজের মেয়ের মতই পরে প্রতিমামামী মানুষ করেছেন তা' সকলেই জানেন। এতে রবিদাদাকে মনে মনে প্রণাম করলুম তাঁর ঔদার্য গুণ দেখে।

আশ্রমে গভর্ণরদের শুভাগমন

আশ্রমে ১৯২০-তে আবার যোগ দেবার পর ফেব্রুয়ারী ১৯২০-তে বঙ্গ-সরকার লর্ড রোনালড্‌শে (Marquess of Zetland) এলেন শান্তিনিকেতনে। আমি তার অব্যবহিত পূর্বে রবিদার টেলিগ্রাফ ও পত্র পেয়েই সস্ত্রীক আশ্রমে পৌঁছে গেলুম। এঁর আগমনের ব্যাপারটা বলার পূর্বে ২০শে মার্চ—১৯১৫-তে বঙ্গসরকার শিল্প-প্রেমিক লর্ড কারমাইকেলের (Lord Carmichael) আশ্রমে শুভাগমনের ঘটনা বলব। তখন আমি আশ্রমে রবিদার কাছে থেকে কলাভবনের গোড়াপত্তন করছিলুম।

বঙ্গ সরকার লর্ড কারমাইকেল হঠাৎ স্থির করলেন আশ্রম দেখতে শান্তিনিকেতনে আসবেন। মাত্র দুদিন সময় ছিল, রবিদাদা অধ্যাপকদের সভা ডাকলেন এবং সংবর্ধনার যা করণীয় তা স্থির করলেন। ক্ষিতিমোহনবাবু এবং আমাকে আলাদা ডেকে বল্লেন অভ্যর্থনার স্থান নির্ণয় করতে। আমরা উভয়ে নির্বাচন করলুম আম্রকুঞ্জ। রবিদার সঙ্গে পরামর্শ করে অধ্যক্ষসচীব জগদানন্দবাবুর সহায়তায় রাজমিস্ত্রী ডাকিয়ে তাড়াতাড়ি একটি অর্দ্ধচন্দ্রাকার সিমেন্টের চন্দ্রবেদীকা বসবার জন্য তৈরী করালুম। আর তার মধ্যমনিতে লাটসাহেবের বসার স্থানের পায়ের নীচে অর্দ্ধচন্দ্রাকার কাঠের চন্দ্র পিঁড়ি সুচারুরূপে আলপনা এঁকে রচনা করলুম পা-দানী হিসাবে। আম্রকুঞ্জের প্রত্যেক গাছের আলবাল পরিষ্কার ক'রে খোয়াই থেকে বাছাই করা রঙিন পাথরের নুড়ি দিয়ে পদ্মাকার আলপনা করা হল। আর অর্দ্ধচন্দ্রাকার সিমেন্টের বেদীটার সামনের আঙ্গিনা লেপন করে শঙ্খ পদ্মাকৃতি লতাজালের বিরাট আলপনা টেনে অলংকৃত করা হল। এই কাজে সহায় হলেন আমার শিশুবিভাগের আর্টিষ্ট ছাত্ররা—ধীরেন দেববর্মা, মণি গুপ্ত, সন্তোষ মিত্র, সুশীল বন্দোপাধ্যায় এবং মুকুল দে। এঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমে স্থানটি অপূর্ব শ্রী ধারণ করল। আল্‌পনা এতকাল কেবল আনুষ্ঠানিক পূজাপাঠের অলংকার মণ্ডনেই কাজে লাগত, এইবার তার দ্বার উন্মুক্ত হ'লো সর্ব প্রকার মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের কাজের জন্য। এখন ভারত-সরকারও সর্বত্র অনুষ্ঠানাদিতে এই রীতি চালিয়েছেন।

এখন আবার রবিদার আর এক সমস্যা হলো রাজঅতিথিকে মানপত্র লিখে উপহার দেবেন তার আধার-পাত্র (casket) কোথায় পাবেন? আমার কাছে ছিল হলুদ রঙের ভূর্জপত্র একতাড়া, ক্ষিতিমোহনবাবু দিয়েছিলেন আমাকে কাশী থেকে সংগ্রহ করে। রবিদা তারই উপর চীনাকালিতে লিখলেন

মানপত্র। আধারের বিষয় ভেবেচিন্তে আমি স্থির করে ফেল্লুম তখুনি। আশ্রমের মাঝে শুখ্‌নো পুকুরের পাড়ে ছিল বেশ মোটা পল্‌কা বাঁশের ঝাড়। দুদিকের গাঁঠের মাঝখানটা করাৎ দিয়ে চিরে ফেল্লুম এবং এমনভাবে ডিবের মত তার আকৃতি করলুম যাতে মানপত্র গুটিয়ে রাখা যায়। তার ভিতর-দিকটা লাল লাক্ষা রঙে রঞ্জিত করলুম। আর সেই বাঁশের লম্বা ডিবের উপরে (scroll-এ) লোহার শলাকা তাতিয়ে এবং তাই দিয়ে পুড়িয়ে (pokering-কোরে) নক্সাকারী কাজ করলুম। আরো শ্রীমণ্ডিত করবার জন্যে নক্সার ফাঁকে ফাঁকে রঙিন লাক্ষা গরম করে ঢেলে দিলুম। রেশমের মোটা দড়িতে টাসেল্ বাঁধবার ব্যবস্থা করলুম। প্রতিমামামী তার জন্যে টাসেলটি তৈরী করে দিলেন। তখন বিজ্‌লি বাতি ছিল না—কেরোসিন লণ্ঠন জ্বালিয়ে রাত দুটো পর্যন্ত কাজ করতে হয়েছিল। রবিদা আমার কাছে বসে সমানে আমার কাজ দেখেছিলেন—আমায় উৎসাহিত করতে। লর্ড কারমাইকেলকে যথা-সমাদরে অভ্যর্থনা করার পর ছাতিমতলার বেদীতে রবিদা তাঁকে নিয়ে গেলেন। তখন উচ্চ শিক্ষিত বাঙালী যুবকদের রাজনৈতিক অপরাধে বাঙলার গভর্ণমেণ্ট নানা স্থানে বন্দী করে রেখেছিলেন। রবিদা তার প্রবল প্রতিবাদ জানিয়ে তীব্র ভাষায় লাটসাহেবকে যখন বলতে আরম্ভ করেছেন তখন প্রাইভেট সেকরেটারী মিষ্টার গুর্‌লে সাহেব ঘড়ি দেখিয়ে জানালেন লাটসাহেবকে যে তাঁর ফেরবার সময় হয়েছে। রবিদার কথার জবাব পর্যন্ত গভর্ণরকে দিতে দিলেন না প্রাইভেট সেক্রেটারী। আশ্রম থেকে যাবার সময় লাটসাহেব আলপনা দেওয়া চন্দ্রপিঁড়িটা চেয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। রবিদাদা নির্ভীকভাবে সত্য প্রচার করতেন। বৃটিশ তাঁকে কবি বলেই সম্মান দিত, তাই জেলে দেয়নি।

লর্ড কারমাইকেল কলারসিক ছিলেন এবং গগনমামা ও অবনমামার বিশেষ বন্ধু ও ভক্ত ছিলেন—রাজকীয় প্রথা লঙ্ঘন করে যখন-তখন তাঁদের বাড়ীতে আসতেন। তিনি অবসর নিয়ে বিলাতে ফেরার কালে Renaissance School-এর অবনমামার ছাত্রদের কাছ থেকে ছবি সংগ্রহ করেছিলেন। সেই উপলক্ষ্যে অবনমামা শান্তিনিকেতনে ১৯১৭-তে আমায় পত্র দেন:

"প্রিয় অসিত, তোমার একটি ছেলে মাঠে ঘুমোচ্ছে, সেই ছবিখানা লাটসাহেবকে বিচিত্রা থেকে দেওয়া গেছে। বিচিত্রার ধন্যবাদ দিচ্ছি। গোয়ালিয়রে যাবার আগে দেখা হবে তো?

আশ্রমে গভর্ণরদের শুভাগমন

[১৯১৭-তে আমি তখন যাচ্ছিলুম গোয়ালিয়ারে বাগগুহার ভিত্তিচিত্র পরিদর্শন করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্নতত্ত্ববিভাগ থেকে।]

দুঃখের বিষয় প্রথম যুদ্ধের দুর্দিনে পারস্য সমুদ্রে জার্মান ডুবুজাহাজ 'এম্‌ডেনের' টরপেডোতে লাটসাহেবের জিনিষপত্রবাহী জাহাজ ডুবে যায়। তার সঙ্গে আমার পূর্বোক্ত ছবিটিও সমুদ্রগর্ভে স্থান পায়।

এরপরে এলেন বঙ্গ সরকার লর্ড রোনালড্‌শে (Marquess of Zetland) শান্তিনিকেতনে। এঁর কথা গোড়ায় বলেছি। রবিদাদা কলাভবনে বসে রইলেন লাটসাহেব আসার সময় তাঁকে গ্রহণ করতে আর রথীমামা, এবং দিনুদার সঙ্গে আমাকে পাঠালেন দ্বার দেশ থেকে লাটসাহেবকে উপরে অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসতে। লাটসাহেব ১৯২০-তে সে সময় শিক্ষাবিভাগের তরফ থেকে প্রাচ্য শিল্পকলা পরিষদকে (Indian Society of Oriental Art-কে) বাৎসরিক ২০,০০০৲ ব্যবস্থা করেছেন। নন্দলাল বসু এবং ক্ষিতিন্দ্রনাথ মজুমদার সেই সময় সোসাইটির স্কুলের শিক্ষক।

আশ্রম দেখা শেষ হলে গভর্ণর রবিদাদাকে একান্তভাবে অনুরোধ করলেন গভর্ণমেণ্টের অর্থ-সাহায্য গ্রহণ করতে। গভর্ণমেণ্টের পৃষ্ঠপোষকতায় (বা পিঠচাপড়ানো খেয়ে) আশ্রম চালাতে রবিদা কিছুতেই সম্মত হলেন না যদিও তাঁর তখন খুবই অর্থকৃচ্ছ্রতা চল্‌ছিল ক্রমশ আশ্রমের কাজ ব্যাপক হয়ে পড়ায় —বিশেষ বিশ্বভারতীর স্থাপনার দরুণ। এবিষয় রবিদার বরাবরই ইচ্ছা ছিল যে গভর্ণমেণ্টের শিক্ষাবিভাগের গড্‌ডালিকা প্রবাহের মধ্যে আশ্রমকে ফেলে বানচাল্‌ করবেন না কিছুতেই। গভর্ণমেণ্ট শিক্ষাবিভাগের বাঁধা নিয়মের বাইরে শান্তিনিকেতনে একটি বিশেষত্ব তিনি যে বজায় রেখে চলেছিলেন, সে কথা সকলেই অবগত আছেন।

দেশ স্বাধীন হবার পর রবিদাদার অবর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে এখন বিশ্বভারতী সঁপে দেওয়া হয়েছে। ১৯২৩ থেকে আমি আশ্রমের সংস্রব ছিন্ন, তাই বলতে পারব না তার ফল এখন কিরূপ দাঁড়াচ্ছে।

গভর্ণর রোনালড্‌শে কলকাতার প্রাচ্যকলা পরিষদে প্রায় আসতেন এবং প্রত্যেক আর্টিষ্টের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তখন বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট স্বদেশী আন্দোলনের দিক থেকে কৃষ্টির দিকে মোড় ফেরাতে চেয়েছিলেন ভারতের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের। তাই তাঁরা হঠাৎ ভারত শিল্পের দরদী হয়ে

উঠেছিলেন। রোনালড্‌শের Heart of Aryavarta বইখানি পড়লে তা বেশ বোঝা যায়।

ঘরওয়াভাবে রবিদাদার সঙ্গ

গভীর কার্য পরম্পরার চাপের মধ্যেও রবিদাদা সুযোগ পেলেই আসতেন নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে আত্মীয়দের একান্ত নিকটে অবসর বিনোদনের জন্যে। নাতি নাতনিদের পেলে তো কথাই ছিলনা, সম্পর্ক হিসাবে রসালো পরিহাস করতে কৃপণতা করতেন না।

একবার শান্তিনিকেতনের নিচুবাঙলায় মধ্যাহ্ন ভোজের পর বড়মামীর নিকটে বসে সবাই মিলে তাস খেলায় মত্ত আছি আমরা। দিনুদা আর আমি একদিকে, অন্যদিকে বড়মামী (হেমলতা দেবী) আর (দিনুদার স্ত্রী) কমল বোঠান বসেছেন তাস নিয়ে খেলতে। রবিদা তাঁর নতুন বাঙলা (দোতলা কুটির) থেকে মাঠ পেরিয়ে সেখানে এসে হাজির। রবিদা তাসখেলার জায়গায় এসেই মুখ গম্ভীর করে শাসনের ভঙ্গিতে অভিনয় করে বল্লেন: "দিনু, ছাখ্‌ আমি আমার নাত্‌বৌকে যদি গোপনে কিছু বলে থাকি আর সেটা যদি ছাপা হ'য়ে বেরোয় তো তুই কি বলবি?" সবাই শুনে অবাক! দিনুদার মুখে রা নেই! বড় মামী চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। রবিদা তখনি দুষ্টু ছেলের মত মুচ্‌কি হেসে গোলাপী রঙের কাগজের মলাট দেওয়া "কমলের প্রতি রবির উক্তি" কবিতার বই সকলের সম্মুখে ফেলে দিলেন। সবাই হাঁফ্‌ ছেড়ে বাঁচলো। বইটি কেহ উপহার দিয়েছিলেন।

১৩২২—১লা বৈশাখে রবিদার সামনে ধরলুম পুরোনো autograph এর খাতাখানি আমার পিতামহের ১৮৬০ সালে বার্লিন থেকে আনা। রবিদা আশীর্বচন লিখেছিলেন সরসভাবে:

কলা বিদ্যা কুঞ্জে-কুঞ্জে পুঞ্জ পুঞ্জ ফল
ভুঞ্জ তুমি রাত্রিদিন আনন্দে চঞ্চল।
কীর্তিতে রবিরে তুমি কর সমাচ্ছন্ন
লোমশ তুলিকা তব হোক্‌ ধন্য ধন্য।
সিন্ধুপারে দ্বীপতটে উচ্চ জয়নাদে
খ্যাতি যাক্‌ এক লক্ষে বায়ুর প্রসাদে।

রবি করে আশীর্বাদ। চির-আয়ুষ্মান
রবি সুত তোমারে না দিক্ দৃষ্টিদান।

রবিদা আমাকে চিঠির শিরোনামায় সর্বদা লিখতেন 'কলাকোবিদ'। তাঁর দেওয়া সম্মানের আজও যোগ্য হইনি বলেই তাঁর দেওয়া এই টাইটেল কোনদিন ব্যবহার করতে পারিনি নিজে।

রবিদা ছবির বিষয়-বস্তু কখনো আমাকে বলে দিতেন না। আমিও চাইতুম না তাঁর কাছে। তাঁর কাব্যের illustrationও করিনি কখনো —স্বাধীনভাবে চিত্রের বিষয় বস্তু যা মনে এসেছে এঁকেছি। একবার শুধু আমাকে বলেছিলেন আশ্রমের দিগন্তপ্রসারিত মাঠ পেরোবার সময়, "দেখ্ ধরণী যেন চুল এলিয়ে রেখে দিবানিদ্রা যাচ্ছেন—তুই এমনি একটি ছবি আঁকতে পারিস?" আর একবার বলেছিলেন: শ্রীকৃষ্ণ বাঁশী বাজাচ্ছেন, নরনারী চলেছে তাঁর দিকে সমুদ্রের ঢেউয়ের মত—তাঁর সেই সুরের টানে—কিন্তু তিনি বাঁশী শুধু বাজিয়েই চলেছেন সেদিকে তাঁর লক্ষ্য নেই। এই দুটি ছবি আজও আঁকা হয়নি আমার দ্বারা।

ঘরওয়াভাবে অধ্যাপকদের স্ত্রী ও মেয়েদের নিয়ে প্রতিমামামী একটি সভা করেছিলেন আশ্রমে। সেই সভায় নানা প্রকার উৎসব অনুষ্ঠান মেয়েরা করতেন আলাদা ভাবে। জোড়-বিজোড়ের আমন্ত্রণ তাঁরা একবার করায় তাদের হয়ে রবিদা 'ক্ষ' অক্ষর দিয়ে মিলিয়ে একটি মজার নিমন্ত্রণ-পত্র লিখে দিয়েছিলেন—অবশ্য তাতে রবিদার স্বাক্ষর দেওয়া ছিল না বক্ষ্যমান কারণে। এখন নিশ্চয় প্রকাশ করলে প্রতিমামামী রাগ করবেন না।

প্রজাপতি যাঁদের সাথে
পাতিয়ে আছেন সখ্য
আর যাঁরা সব প্রজাপতির
ভবিষ্যতের লক্ষ্য
উদরায়ণ উদার ক্ষেত্রে
মিলুন উভয় পক্ষ,
রসনাতে রসিয়ে উঠুক
নানা রসের ভক্ষ্য।

সত্য যুগে দেব-দেবীদের
ডেকেছিলেন দক্ষ
অনাহুত পড়ল এসে
যত যক্ষ রক্ষ ;
আমরা সে ভুল করবনা তো
মোদের অন্ন কক্ষ
দুই 'পক্ষেই অপক্ষপাত
দেবে ক্ষুধায় মোক্ষ।
আজো যাঁরা বাঁধনছাড়া
ফুলিয়ে বেড়ান বক্ষ
বিদায়-কালে দেব তাঁদের
আশীষ লক্ষ লক্ষ—
"তাঁদের ভাগ্যে অবিলম্বে
জুটুক কারাধ্যক্ষ।"
এরপরে আর মিল মেলেনা
হ-জ-ব-র-ল ক্ষ।

মেয়েদের এই আলাপিনী সভায় একবার একটি নাটিকার আয়োজন করলেন প্রতিমামামী। কলাভবনের উপর-তলার হলে রঙ্গমঞ্চের ব্যবস্থা করা হ'ল ছাত্রদের দিয়ে তৈরী করিয়ে। দেখলুম অবরোধ-প্রথা বিসর্জন দিলেও তখনও পর্যন্ত মেয়েদের জড়তা ঘোচেনি। ফলে এই হলো—অভিনয় কালে অধ্যাপক বন্ধু সন্তোষ মজুমদার মহাশয় এসে আমাকে বল্লেন কলা-ভবনের ছাত্রদের সম্মুখে আলাপিনী সভার মেয়েরা অভিনয় করতে লজ্জা পাচ্ছেন। আমি তখন ছাত্রদের নিয়ে অন্যত্র চলে গেলুম। সে সময় রবিদা আশ্রমে ছিলেন না। পরে রবিদার সঙ্গে সেই সব মেয়েরা কলকাতার পাবলিক ষ্টেজে বর্ষামঙ্গল,'নটীর পুজা প্রভৃতি অভিনয় করেছিলেন।

একবার তাঁকে প্রশ্ন করেছিলুম, মেয়েরা বড় শিল্পী বা কবি হন না কেন? তার উত্তরে রবিদা বলেছিলেন, তাদের পূর্ণতা মাতৃত্বে।

আশ্রমে প্রথম নৃত্যকলার চর্চা সেই সময় থেকে আরম্ভ হলো। মণিপুর থেকে নৃত্যনিপুণ বুদ্ধিমন্ত এলেন অধ্যাপক হয়ে। আজ এই মুণিপুরী

নৃত্য শান্তিনিকেতনে আর আবদ্ধ নেই, সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে গেছে রবিদারই প্রথম চেষ্টায়।

নৃত্যাচার্য বুদ্ধিমন্ত নামও যেমন তাঁর বুদ্ধিও ছিল অদ্ভুৎ। একটা ভাঙা গ্রামোফোন নিয়ে তিনি নৃত্যরত পুতুল তৈরী করেছিলেন। দম দিলেই তালে, তালে পুতুলগুলি মৃদঙ্গ খঞ্জনি বাজিয়ে ঘুরে ঘুরে নৃত্য করত। তিনি যদি তখন আরো মন দিতেন তো হয়ত Walter Dizney র মতই ছবিতে চলচ্চিত্র দেখাতে পারতেন। উৎসাহী পৃষ্ঠপোষকদের অভাবে আমাদের দেশে কত প্রতিভাশালী লোক কিছুই করতে পারেন না। রবিদাদার 'চিত্রাঙ্গদা' এই মণিপুরী নাচের মধ্যে দিয়ে এত সুন্দর ফুটেচে যে একজন নৃত্যপ্রেমা আই-সি-এস বন্ধু (স্বর্গত শ্রী এস্ পি শাহ) আমায় বলেছিলেন "মরবার প্রাক্কালে যদি এই নৃত্য দেখতে দেখতে মরতে পারি ত আমার জীবন ধন্য হয়।"

রবিদার খুব ইচ্ছা ছিল আমাকে দিয়ে তাঁর গান ও গল্পের ছবি আঁকান। আমাকে এবিষয় অনেকবার নিজে বলেছিলেন। একবার আঁকার সুযোগ হল যখন বাকুড়া মিশনারী কলেজের অধ্যক্ষ এড্ওয়ার্ড টমসন্ (Edward Thomson) এলেন তাঁর নিকট। গল্পগুচ্ছের তিনি ইংরাজি তর্জমা করলেন এবং রবিদা বল্লেন তার ছবি আঁকতে। আঁকলুম কিন্তু নানা কারণে তা' আর ছাপাই হল না। সেই সময় গীতাঞ্জলির ইংরাজি সচিত্র এডিশন ম্যাকমিলান বার করচেন। অবনমামা তার ভার স্বয়ং নিলেন এবং নন্দকে দিয়েই ছবি আঁকলেন।

দেখলুম ইংরাজি সচিত্র গীতাঞ্জলি যখন বেরুলো তাতে আমার রবিদাদাকে জন্মদিনে উপহার দেওয়া একটি ছবিও বেরিয়েছে। ছবিটিতে ছিল একটি শিশু পদ্মের গোছা নিয়ে চলেছে, পিছনে সূর্য উদয় হচ্চে। আমি তখন ব্যাপার কিছুই জানি না—অবনমামাকে লিখলুম সেই ছবিটির জন্যে Royalty পাব কিনা। তার উত্তরে অবনমামা লিখলেন :

"প্রিয় অসিত, তোমার চিঠি পেয়ে আমি অবাক হলেম। রবিকাকার বইটার সমস্ত টাকা নন্দলালের এবং তারি সাহায্যের জন্যে Macmillan-দের কাছ থেকে এই order রবিকাকা বন্দোবস্ত করেছিলেন, আমার ছবির জন্যে আমি কিছুই পাইনি—পাবও না। তুমি ভুলে গেছ বোধ হয় আমি তোমার

ছবি select করিনি, মুকুলেরও নয়। তোমাদের গুলো রবিকাকা বাড়ারভাগ নিজের ইচ্ছায় America-তে বসে ছাপিয়েছেন। আমার সঙ্গে যে contract, তার ছবি নন্দলাল ও আমি পূর্ণ করে দিয়ে যা' টাকা তা' সমস্ত নন্দলালকে আমি দিয়েছি। নন্দলাল কিম্বা আমি তোমার ছবির জন্যে দায়ী নয়—টাকার জন্যেও নয়।"

এরপর আর আমি রবিদাদার কোনো বইয়ের illustration করার কথা দুঃসপ্নেও ভাবিনি।

রবিদাদার একটি ভোজন বিলাসী চাকরের কথা এখানে বলি। আশ্রমে রবিদা নতুন বাঙলায়—রথীমামা ও প্রতিমামামী গেলেন কলকাতায়, যাবার পূর্বে রবিদার জন্য কিছু খাবার তৈরী করে রেখে গেছেন। বনমালী-ভৃত্য মামীর সঙ্গে কলকাতায় গেছে। অন্য পুরাতন ভৃত্যটি (তার নাম এখন কিছুতেই মনে আসছে না) যেমন দেহ স্থূল তেমনি তার কণ্ঠও। মামীর তৈরী সব খাবার সরাবার পরামর্শ আঁটছে নীচের তলার খাবার ঘরে। উপরতলায় রবিদা আর আমি সব শুনতে পারছি। রবিদা কৌতুহল হাস্যে বল্লেন, 'শুনচিসতো আমার আজ দুপুরে কিছু জুট্‌বে না—সব সরাচ্ছে, গোপন পরামর্শ বেশ স্পষ্ট 'ওর শোনা যাচ্ছে।' রবিদা এর জন্য চাকরকে কিছুই বল্লেন না।

একবার ট্রেনে সহযাত্রী এক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত গল্প করেছিলেন তিনি 'ঘরে বাইরে' বইটি প্রকাশ হবার পর কবিবর রবীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন যে বইখানি পাঠে নৈতিক চরিত্রের অবনতির সম্ভাবনা আছে। তার উত্তরে কবি মৃদু হাস্যে বলেছিলেন দেশের উপকার হয় এরূপ কিছুই জীবনে করিনি। ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত বঙ্গদেশে কুইনাইনের দ্বারা যে উপকার হয় তার বিষয় যদি লিখতুম তো বেশ হোতো। পণ্ডিতমহাশয় কবির কৌতুক বলেই গ্রহণ করলেন, কথাটিতে যে সূক্ষ্ম তিরস্কারের ইঙ্গিত আছে তাঁর তা' বোধগম্য হল না।

রবিদাকে ঘরওয়াভাবে থাকার কালে দেখেছি তাঁর দুইটি রূপ—একটি আমার অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ দাদামশাই এবং অন্যটি কঠিন সংযমসিদ্ধ ঋদ্ধিপ্রাপ্ত তাপস কবি রবীন্দ্রনাথ।

আশ্রমের মাধ্যমে মাদ্রাজে প্রথম দেশী আর্টের প্রচার

আইরিশ কবি ডক্টর এইচ-জে-কাজিন্স (Dr. H. J. Cousins) মাদ্রাজেই জীবন অতিবাহিত করেন, অল্প বয়সে দেশ থেকে ভারতবর্ষে এসে। তিনি

সস্ত্রীক 'থিওসফিক্যাল সোসাইটির' সভ্য ছিলেন। রবিদাদা এবং অবনমামার প্রতি কাজিন সাহেবের অগাধ ভক্তি ছিল, তাঁদের গুণগ্রাহে এবং খ্যাতিতে তিনি গৌরব বোধ করতেন। প্রতি বৎসর মাদ্রাজ থেকে প্রাচ্যকলা পরিষদের (Oriental Art Societyর) প্রদর্শনী দেখতে আসতেন। তিনি কবি ছিলেন তাই তখনকার অবনমামার Renaissance স্কুলের ছাত্রদের সুপরিকল্পিত মৌলিক রসাভাস (Emotion) যুক্ত চিত্রাভাস তাঁর খুব ভাল লাগতো।

১৯২০-তে তিনি মিসেস্ বেসেণ্টকে দিয়ে লেখালেন রবিদাদাকে শান্তিনিকেতন কলাভবনের ছবির একটি প্রদর্শনী মাদ্রাজে করাতে এবং আমাকে ছবি নিয়ে সেখানে পাঠাতে। রবিদাদার অনুমতি পেয়ে কলাভবনের ছাত্রদের প্রায় একশো ছবি সংগ্রহ করে নিয়ে গেলুম মাদ্রাজে।

মাদ্রাজে আমি সেই প্রথম পদার্পণ করলুম এবং প্রথম আর্টের বিষয় সাড়া পড়ে গেল সহরে আমাদের কলাভবনের প্রদর্শনী খোলার দরুণ। মিসেস্ বেসেণ্ট সুললিত ভাষায় দেশের আর্টের Renaissanceএর বিষয় উল্লেখ করে বক্তৃতা দিলেন চিত্রপ্রদর্শনীর দ্বার উন্মোচন কালে। দেশের আর্টের নবজাগরনীর যজ্ঞের আদি পুরোহিত অবনীন্দ্রনাথের অমূল্য দান এবং হ্যাভেল কুমারস্বামীর একনিষ্ঠ ভাবে তাঁর দেশ বিদেশে বহুল প্রচারের কথা বহু জনতার মধ্যে বল্লেন মিসেস্ বেসেণ্ট। ডক্টর কাজিন তারপরে আরো বিস্তারিতভাবে অবনীন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের দেশপ্রীতি এবং দেশের আর্টে ও সাহিত্যে নব যুগ প্রবর্তনের কথা বেশ ভাল করে বুঝিয়ে বল্লেন। আমার সেই প্রথম ইংরাজীতে ভাষণ এঁদের ওজস্বী বক্তৃতার পরে দিতে বেশ সঙ্কোচ বোধ করেছিলুম। থিওসফিক্যাল সোসাইটির বহু বিদেশী মনীষী সভ্য এবং হাইকোর্টের জজ প্রভৃতি গণ্যমান্য ব্যক্তিরা আসায় প্রদর্শনী সফলতামণ্ডিত হয়েছিল—ছবিও বেশ ভালই বিক্রি হয়েছিল মাদ্রাজে।

মাদ্রাজ হাইকোর্টের জজ তিলং বহু চিত্র কিনেছিলেন এবং কাজিন সাহেবের বিশেষ বন্ধু মাদ্রাজ ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের গভর্ণর এস-ভি রামাস্বামী মুদেলিয়ার বহু ছবি কেনেন। তারপর থেকে তিনি আমাদের Renaissance School এর বিশেষ ভক্ত হন এবং পৃষ্ঠপোষকতা করেন।

তাঁর মাদ্রাজের 'রামমন্দিরম্' প্রাসাদে এক চিত্রশালা-গৃহে বহু মৌলিক চিত্র সংগৃহীত আছে। তার মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করছি। অবনীন্দ্রনাথের

'মাছ ধরা'। তিমিরাবৃত সন্ধ্যায়—সূর্যের শেষ রেখা নিভে গেছে; জলাভূমির কাশবনের মধ্যে বাঁশের মাচানে বসে মাছ ধরচে একটি লোক উদুম গায়ে কাঁধে লাল গামছা। জলে ডোবা কাশ আচ্ছন্ন জনশূন্য বিস্তারিত ঝিলটি দেখলে মনে হয় যেন তার মধ্যে থেকে ঝিঁঝিঁ ডেকে উঠ্‌চে—জলার সেঁতো ভাবটাও অনুভব করা যায়—গা শির্‌শির্ করে ওঠে! বহু বিচিত্র জলরঙের ছোপ দিয়ে (wash technique-এ) তিনি তাঁর নিজস্বভাবে যা' এঁকেচেন তার তুলনা পৃথিবীতে নেই। ছবির আসল যে দুটি বিশেষ গুণ, মৌলিক পরিকল্পনা ও ভাবাভাস চমৎকার ফুটেছে!

মুদেলিয়ারের সেই সংগ্রহে আছে গগনেন্দ্রনাথের "পাণ্ডবের লাক্ষাগৃহে বাস";—এটি একটি অদ্ভুৎ গোলোক ধাঁধা—কিউবিষ্ট ও জাপানী টেক্‌নিকে আঁকা। স্বর্গত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কৃষ্ণের জন্ম'; নন্দলাল বসুর 'পাখির ঝাঁক'; ক্ষিতিন্দ্রনাথ মজুমদারের 'তমালতলে রাধা'; এবং আমার আঁকা 'বন্দী রাজপুত্র'; 'রাই রাজা' প্রভৃতি পঞ্চাশখানি ছবি। দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী মান্দ্রাজের গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ থাকায় তাঁর বহু ছবি কেনার সুযোগ হয়েছিল রামাস্বামী মুদেলিয়ারের।

আমাকে ১৯২০ এবং ১৯২১, দুবার আশ্রম থেকে মান্দ্রাজে যেতে হয়েছিল প্রদর্শনীর জন্য। মিসেস্ বেসেণ্ট নিজের কাছে 'লেডবিটার্স চেম্বার্সে' স্থান দিয়েছিলেন সম্মানের সহিত। আমার ঘরের পাশেই ছিল তাঁর ঘর এবং অন্য পাশের ঘরে থাকতেন তাঁর ভক্ত শ্রীকৃষ্ণমূর্তি এবং তাঁর ভাই নিত্যানন্দ। মিসেস্ রুক্মিণী আরুণডেল, জিনারাজাদাসা, জর্জ তিলং, মিসেস্ আডিয়ার, ডোরথি লারচার, মাদাম মানজ্ঞিয়ারলি, মিষ্টার ক্রুশে এবং মিষ্টার স্মীথ প্রভৃতি তখনকার বহু গণ্যমান্য থিওসফিক্যাল সোসাইটির সভ্যদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলুম। প্রদর্শনীর শেষে মিসেস্ বেসেণ্ট আমাকে চীনদেশ থেকে আনা একটি প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দিরের ড্রাগন চিত্রিত ঢোলক (Drum) উপহার দিয়েছিলেন; আর শ্রীকৃষ্ণমূর্তি দিয়েছিলেন ব্রঞ্জের একটি জাপানি উদ্যান-লণ্ঠন।

পরে থিওসফিক্যাল সোসাইটির স্কুলে কলাভবনের আমার একটি ছাত্র শ্রীমান অর্দ্ধেন্দু বন্দোপাধ্যায়কে পাঠিয়েছিলুম। ডক্টর কাজিন অবনমামার কাছ থেকে অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে চিত্রকলা শিক্ষা দেবার জন্য প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়কে আনিয়েছিলেন। একজন দীন মসীজিবী সাংবাদিক

শ্রীভেঙ্কাটাচালাম এই প্রদর্শনীর বিষয় কাগজে লেখেন ডক্টর কাজিন এবং আমার সহায়তায়। পরে তিনি দক্ষিণের একমাত্র শিল্প-সমঝদার বলে গণ্য হন। মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের ইংরেজ অধ্যক্ষ মিষ্টার হ্যাডাওয়ে (Hadaway) অবসর নেবার পর আমার পরামর্শ মত এস-ভি রামাস্বামী মুদেলিয়ার দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরীকে অধ্যক্ষের স্থলাভিষিক্ত করেন। এইভাবে মাদ্রাজে আর্টের অনুপ্রবেশ ঘটল প্রথম রবিতীর্থের শিল্পীদের দ্বারা।

বৃটিশ আমোলে সরকারী কলাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের পদ ইংরাজ শিল্পীদের জন্যই নির্দিষ্ট থাকত। সেই কারণে হ্যাভেল সাহেবের পর অবনীন্দ্রনাথকে অস্থায়ী অধ্যক্ষের পদ দেওয়া হয়। পাকাপাকি এইরূপ পদে ইউ-পি-প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট প্রথমে আমাকে নিযুক্ত করেন। দেবীপ্রসাদ তারপর যখন মাদ্রাজে নিযুক্ত হলেন তখন কলকাতা আর্ট স্কুলেও মুকুল দে ঐ পদে অধিষ্ঠিত হন।

রবিদাদার আলমোড়া যাত্রা

১৩২১-এর কথা—রবিদাদা গেছেন তখন আশ্রম থেকে হিমালয়ে আলমোড়া অঞ্চলে রামগড়ে, সেখানে একটি আপেলের উদ্যানযুক্ত বাড়ীতে তিনি ছিলেন। ঠিক সেই সময় রথীমামা ও দিনুদা আশ্রমের দলবল নিয়ে গেলেন বদরিকাশ্রমে বেড়াতে। আমি গেলুম গ্রীষ্মাবকাশে রাঁচিতে মা-বাবার কাছে।

আমার গ্রহবৈগুন্য বশতঃ বাবা আশ্রমে রবিদার নিকট থাকা মোটেই পছন্দ করতেন না তখনো। বিবাহিত জীবনে আর্থিক উন্নতির পক্ষে বাঁধা বেতনের গভর্ণমেণ্টের চাকরী প্রশস্ত—পূর্বপুরুষরা আমাদের বাড়ীতে যা করে গেছেন, এইছিল তাঁর বক্তব্য। এই মর্মে বাবা রবিদাকে পত্র লিখতে বলায় আমি তাঁকে খুলে আমার দুঃখের সব কথা লিখলুম এবং আমার পাকা বেতনের ব্যবস্থা বিষয়ও জানালুম। রবিদাদা আমার পত্র আলমোড়ায় পেয়ে লিখলেন :

কল্যাণীয়েষু—অসিত, তোর চিঠি পেয়েছি, বিদ্যালয়ের খরচ বেড়ে যাচ্ছে। এইবার আরো অনেক বাড়বে। ওখানে তোর কাজ খুব লঘু, বলতে গেলে কিছুই নেই। বোলপুরে তুই বিনা ব্যাঘাতে নিজের কাজ ও মনের উন্নতি করতে পারবি—এই লক্ষ্য করেই আমি ওখানে তোকে টেনেছি। বস্তুতঃ

ওখানে তুই নিজের কাজ কর্‌ছিস, যদি তোকে মোটা মাইনে দিই তাহলে সেটা যে কেবল বিদ্যালয়ের উপর ভার চাপানো হবে তা নয় সমস্ত শিক্ষক-দেরই কাছে সেটা অসঙ্গত ঠেক্‌বে। সকলেই মনে করবে আত্মীয় বলে তোকে আমি বিদ্যালয় থেকে পালন করছি। তাদেরও দাবী যখন বাড়বে আমি তার জবাব দিতে পারবনা। তাই বলছি ওখানে যা পাচ্ছিস সেটা ঠিক কাজের বেতন মনে করিসনে—ওটা ভাতার মত। তারপর ওখানে তুই অখণ্ড অবসরে যে সব ছবি আঁকবি নিশ্চয় ক্রমশঃ তার দ্বারা তোর আর্থিক অবস্থার উন্নতি হতে পারবে।

এখানে বড় উপকার পাচ্ছি,—বদরিকাশ্রমের যাত্রীরা এখনো ফেরেনি—তারা খুব আনন্দে চলেছে খবর পেয়েছি—তারা এতদিনে নিশ্চয়ই ফেরবার পথে।

তোর ছবি এগোচ্ছে শুনে খুসি হলুম। তোর বাবা মাকে আমার আশীর্বাদ দিস—রবিদাদা।"

বাবা মাকে রবিদাদার পত্র দেখাতে তাঁরা খুব খুসি হলেন। মা বরাবর চাইতেন তাঁর রবিমামার কাছেই আমি থেকে যাই এবং জীবনের উন্নতি করি—আর্টের চর্চ্চা করি। বাবার এদিকে কোনো খেয়ালই ছিল না। ছোট কাকা (নির্মলচন্দ্র হালদার) আমাকে খুব ছোট বেলা থেকে আর্টের বিষয় উৎসাহ দিয়েছেন।* রবিদাদার তিনি একজন বিশেষ ভক্ত ছিলেন। তাঁর আমাকে ফিরোজপুর থেকে লেখা ২১শে নভেম্বার ১৯০৯ সালের পত্রটি পড়লেই বোঝা যাবে তাঁর আমার কাজের প্রতি লক্ষ্য কিরূপ ছিল।

My dear Asit,—My best congratulations to you on your 'Yashoda' which appears in this month's 'Bharati'. I like it much better than the coloured pictures in the same magazine. Your poetry too has not escaped my notice······I trust you are doing well. Your affectionate Chotokaka—Nirmal C. Haldar."

কাকা যে 'যশোদা' ছবিটির কথা লিখেছেন সেটি ডক্টর আনন্দ কুমার-স্বামী সার আর এন মুখার্জির নিকট বিক্রি করেছিলেন আমার হ'য়ে। লেডি

---

*আমার ছোটকাকা নির্মলচন্দ্র হালদারের ১৯১১-তে আমায় লেখা পত্র—৩০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।



ভারতশাস্ত্রবিদ্ উইন্টারনিজ



সার উইলিয়াম রোদেনস্টাইন

আশু মুখার্জি তাঁদের সংগ্রহে সেই ছবিখানি যত্নপূর্বক রেখেছেন। তখনকার সময় আমাদের মধ্যে যাঁরা ছবি আঁকতেন এই যশোদার ছবিটাই সব চেয়ে বড় সাইজের ছবি ছিল।

যাক্ সেকথা, এখন রবিদার আলমোড়া যাত্রার ব্যাপারে ফেরা যাক্। রবিদাদা আলমোড়া থেকে কেবল যে সুস্থ হয়ে ফিরলেন তা নয় মনে অশেষ শান্তি লাভ করে ফিরেছিলেন।

আলমোড়ার রামগড় পর্বত শীর্ষে থাকার এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কথা আমাদের তখন বলেছিলেন। বলেছিলেন, রোজ ব্রাহ্মমূহুর্তে বাড়ার নিকটে পর্বত চূড়ায় বসে পূর্বপারে হিমালয়ের হিমশিখরশ্রেণী উজ্জ্বল করে সূর্যোদয় হোতে দেখতেন এবং উপাসনা করতেন। একদিন তিনি ধ্যানস্থ হয়ে দেখলেন বিরাট জগন্মাতা পূর্বপারের তরঙ্গায়িত হিমশীর্ষের উর্দ্ধে জ্যোতির্ময়ীরূপে প্রকাশমানা। গাঢ় তিমির ভেদ করে নবারুণ-জ্যোতিতে অবগাহন করে তপস্বিনী মাতা শত সহস্র সন্তান বেষ্টিত হয়ে পদ্মাসনে বসে আছেন—দৃষ্টি তাঁর বহু দূর-দুরান্তরে আবদ্ধ—কোনো দিকেই ভ্রূক্ষেপ নেই। যেন পুঞ্জীভূত তপস্যা মায়ের মূর্তি পরিগ্রহণ করে সহসা দেখা দিয়েছে।

কবি তাঁর প্রত্যক্ষবোধের বিষয় সুললিত ভাষায় আমাদের তখন যা বর্ণনা করেছিলেন তার ভাষা আমার নেই। দুর্ভাগ্য বশতঃ অবিলম্বে লিখেও রাখিনি। তাঁর শ্রীমুখে বর্ণনা শুনে সেই জ্যোতির্ময়ী মার ছবি চোখে ভেসে উঠেছিল এবং দুর্বল হাতে তুলির টানে সেটা ফলিয়ে তুলেছিলুম, রবিদাদার কিন্তু তা ভালই লেগেছিল। এখন মনে হয় সেটা আমি ছেলেখেলাই করেছিলুম। ছবিটি রবিদাকে উপহার দিই এবং অবশেষে জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে উইপোকার উপদ্রবে বিনষ্ট হয়। প্রবাসীতে তার একটি অনুলিপি প্রকাশিত হয়েছিল।

রবিদাদা আলমোড়ায় আর একটি কথা বলেছিলেন তা আজও আমার মনে আছে। তিনি বলেছিলেন আমাদের দেশের লৌকিক আনুষ্ঠানিক পূজার মধ্যেও অনন্তরূপের উপলব্ধি আছে। শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদের (২।১৭) একটি শ্লোক প্রথমে আবৃত্তি করলেন:

ওঁ যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বম্ ভুবনামাবিবেশ।
যো ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ॥

—যে দেবতা অগ্নিতে—যিনি জলে—যিনি বিশ্বসংসারে (নিবিড় ভাবে) অনুপ্রবিষ্ট আছেন, যিনি—ওষধিতে—যিনি বনস্পতিতে, সেই দেবতাকে বার বার নমস্কার করি।

—বোলে কবি বল্লেন, "যখন দেখতুম পাহাড়ি মেয়ে এবং পুরুষেরা নানা কাজে পথে যেতে পাহাড়ের গায়ে সিঁন্দুর লেপা স্থানে হাঁটু গেড়ে প্রণাম করছে —তখন তাদের ভক্তি-উজ্জ্বল মুখ দেখে বুঝ্তুম, তাদের প্রণাম সেই সুদূরের অনন্ততেই—ভূমাতেই পৌঁছোচ্ছে ;—তিনি যে অনুপ্রবিষ্ট, সর্বত্র বিরাজ করছেন সে-বোধ আমাদের দেশে সকলেরই আছে। তাই 'চার্চ্চ' না হলেও পূজা চলে যত্র-তত্র।"

শ্রীনিকেতন

তখন কবির ৬০ বৎসর বয়স। বিশ্বভারতীর প্রচার করে এলেন য়ুরোপে, এবং সেখানে অনেক বন্ধু পেলেন। আমেরিকার একটি ধনী মহিলা তাঁকে বরাবরের জন্যে কিছু টাকা ধার্য্য করে পাঠাবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন। রবিদা তখন রায়পুরের লর্ড সিংহের নিকট সুরুলের চীপ সাহেবের (নীলকর) প্রাচীন কুঠি—বহু জমি সমেৎ খরিদ করেছিলেন।

জন কোম্পানীর সময় বীরভুম জেলার এই অঞ্চলে নীল চাষের বিরাট কেন্দ্র ছিল। যখন রবিদাদা কিনলেন তখন সেটি একেবারে জঙ্গল। রাত্রে হায়না, নেকড়ে প্রভৃতি আসতো! সেখানে আমরা পূর্ব্বে শীতকালে কখন কখন চড়ুইভাতি করবার জন্যে ছাত্রদের নিয়ে শান্তিনিকেতন থেকে যেতুম। লাল কুঁচ ফলের শিকড় (জৈষ্ঠমধু) ছিল ছেলেদের আকর্ষণ—তারা সংগ্রহ করতো সেখান থেকে। আমার আর্টিষ্ট ছাত্ররা sketch করতেন জংলা দৃশ্য—পোড়োবাড়ী ইত্যাদি।

শ্রীনিকেতন (সুরুল) থেকে আশ্রম প্রায় এক মাইলের উপর। কূর্ম-পৃষ্ঠ ঢেউ খেলানো মেঠো পথ পার হয়ে গেলে শীঘ্র পৌঁছনো যায়। সেই মাঠের এক প্রান্তে একটি শালবন এবং তার শেষের অংশে পুরোনো পুকুরের ধারে শ্মশানকালীর মন্দির—আর তার পাশেই শ্মশান।

সুরুলের চীপ সাহেবের কুঠিকে বাসোপযোগী করে নিলেন রথীমামা কিন্তু তখনো মশার উপদ্রব কমেনি। সুরুলে যেতেই রবিদাদা বল্লেন: "অসিত,

তোর (প্রতিমা) মামী এসেই গাছপালার জঙ্গল কাটিয়ে বাড়ীটাকে কেমন উজ্জ্বল করে ফেল্‌লেন দেখ্‌—আমি ভাব্‌ছিলুম কি করি—গাছ কাটাতে মায়া করছিল, জানিস্‌।"

সাহেবি বাড়ী—প্রকাণ্ড বড় বড় কাম্‌রা এবং জানলা দরজাও তেমনি দরাজ। রথীমামার স্বাভাবিক আর্টের হাত থাকায় সামান্য কিছু অদলবদল করিয়ে বাড়ীটিকে শ্রীনিকেতনেই পরিণত করেছিলেন তিনি।

আমি যে মোটেই আহার সৌখীন নই, এবং চিরকাল স্বল্পাহারী তা' রবিদা, এবং প্রতিমা মামী জানতেন। তবু আমাকে সেদিন রাত্রে আশ্রম থেকে এসে খেতে বল্লেন সুরুলে এবং জানিয়ে দিলেন আমার প্রিয় খাদ্য cheese macaroni হবে।

তাঁদের আদেশ মত সেদিন সন্ধ্যায় পদযাত্রায় মাঠ-বাট পেরিয়ে আস্‌ছি শান্তিনিকেতন থেকে শ্রীনিকেতনে সুরুলে। পথে জনমানব নেই। অস্তাচল-লগ্ন-আদিত্য—ঘোলাটে গোধুলি সময়। যেতে যেতে হঠাৎ দেখি একটি লোক সাদা কাপড় পরে যেন ক্রমাগত আমার দিকেই এগিয়ে আসছে। যেই আমি দাঁড়াচ্ছি—আর সেও অমনি দাঁড়াচ্ছে—আমি চল্লেই সে এগোচ্ছে।

শালীবন প্রান্তর প্রায় যখন পেরিয়েছি দূরে শ্মশানের ধারে দেখি একটি নারী শ্বেত বসনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মালা জপচে। আমি বার বার চিৎকার করতেও কোনো উত্তর পাচ্চি না। তখন সাহসে ভর দিয়ে এগিয়ে গিয়ে যা দেখলুম তা আর কিছুই নয়, গ্রামের দুষ্টু লোকেদের কীর্তি সেটি। কোনো বৃদ্ধার মৃত সৎকারের পর চিতা জ্বালাবার বাঁশ দুটি ক্রসের আকারে বেঁধে তার উপরে একটা কাল অয়েলক্লথ এবং নামাবলী জড়িয়ে দিয়ে বেশ একটি যেন জ্যান্ত মূর্তি খাড়া করে রেখে গেছে অন্ধকার গাছতলায়। দেখলেই চম্‌কে যেতে হয়।

প্রেতমূর্তিটিকে ধরাশায়ী করে শ্মশানকালীর মন্দির পার হয়ে একলা নির্জন পথে গিয়ে পৌঁছলুম—শ্রীনিকেতনে। রবিদার ঘড়ি ধরে খাবার নিয়ম। আমার জন্যে ২০ মিনিট টেবিলে অপেক্ষা করেছেন শুনলুম। যখন পথের প্রেতের কথা সব রবিদাকে বল্লুম এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম—ভূত আছে বলে তিনি বিশ্বাস করেন কিনা, উত্তরে বলেছিলেন "ছাখ্‌ এবিষয় বলা বড় শক্ত—প্রত্যক্ষ না দেখলে।" [শ্রীনিকেতন বিষয়ে শ্রীযুক্ত সতীশ রায় 'বিচিত্রা' পত্রিকায় (মাঘ ১৩৩৯ সংখ্যায়) বিস্তারিতভাবে বিবৃত করেছেন।]

কৃষিবিদ্যা, কুটির-শিল্প এবং আদর্শ পল্লী সংগঠন হল শ্রীনিকেতনের প্রধান কাজ। রথীমামা আমেরিকা থেকে কৃষিবিদ্যায় গ্র্যাজুয়েট হয়ে এসেছিলেন; গৌরগোপাল ঘোষ (একটি প্রাক্তন আশ্রমের ছাত্র) এবং L, K, Elmherst হলেন তাঁর সহযোগী কর্মী।

এলমহার্ষ্ট শ্রীনিকেতনকে বরাবর অর্থ সাহায্য করে আসছিলেন রবিদা জীবিত থাকা পর্যন্ত। তিনি খুব সরলভাবে বাস করতেন সুরুলে। এমন কি খেলো হুঁকোয় তামাক খেতেন, পাইপের পরিবর্তে। সুরুলে যখন লাটসাহেব গেলেন দেখতে তখন তিনি খেলো হুঁকো হাতে তাঁকে অভ্যর্থনা করেছিলেন। শার্টের উপর একটি 'পুলোভার' মাত্র ছিল। লাটসাহেব এবং এ-ডি-সি প্রভৃতি সেই অবস্থায় তাঁকে দেখে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য তিনি ইংরাজ হয়ে তাঁদের দেশের সময়োচিত পোষাক পরার অমান্য করলেন।

এলমহার্ষ্ট ভারতে প্রথম আসেন Simon Commission এর সঙ্গে Under Secretary হয়ে এবং তার draft তিনি তৈরী করেছিলেন। সরকারী ইংরেজ আমলা হয়েও রবীন্দ্রভক্ত হওয়ায় তাঁর জীবন ধন্য হয়ে গিয়েছিল। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই তিনি আশ্রমে রবিদার নিকট আত্মসমর্পণ করেন।

শেষ বয়সে কবির ছবি আঁকা

আজকাল একটা ফ্যাসান হয়েছে পণ্ডিতদের মধ্যে কবিবর রবীন্দ্রনাথকে একজন খুব বড় চিত্রশিল্পী এবং শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথকে কবি বলার। এই সংকটে আমার ব্যক্তিগত চিত্রকলা এবং কাব্যকলা সাধনার ফলে যে অভিজ্ঞতা হয়েচে তাই দিয়ে আলোচনা করব। অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলার বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করি।

গোড়ায় ভারতশিল্পের অন্তঃপ্রকৃতি কি তাই দেখা যাক্। প্রত্যেক দেশের আর্ট বৰ্দ্ধিত হয়েচে ধর্ম ও দর্শনের এক বিশেষ কৃষ্টির আবহাওয়ার পরিবেষ্টনে। হু'হাজার বছর ধরে এ দেশের আর্টের মধ্যেও তারই পরিচয় নিহিত আছে।

এদেশের ধর্ম ও দর্শনের প্রকৃতিই হল অন্তর্মুখী (introvert) এবং subjective; তাই ধ্যান পরিকল্পনার দ্বারা ছবি বা প্রতিমা তৈরী হতো। য়ুরোপের ধর্ম ও দর্শনের প্রকৃতি বহির্মুখী (Extrovert) তাই বৈজ্ঞানিক মন দিয়ে মডেল বসিয়ে প্রকৃতির হুবহু প্রতিকৃতির বাইরের অবয়বের অনুকরণ করাই

আর্টের প্রধান কাজ। মডেল সামনে বসিয়ে চিত্রবিন্যাস দ্বারা চিত্রাঙ্কন প্রথা য়ুরোপের যা বিশেষত্ব তার অভিজ্ঞতা রবিদাদার হোল লণ্ডনে রোদেনষ্টাইনের ষ্টুডিওতে গিয়ে। আশ্রমের অধ্যাপক কালীমোহন ঘোষকে নানা বেশে সাজিয়ে নানা ভঙ্গিতে দাঁড় করিয়ে এবং বসিয়ে রোদেনষ্টাইন ছবি আঁকলেন তাঁদের পার্লিয়ামেণ্টের জন্য—'মোগল দরবারে ইংরাজ দূত Sir Thomas Roe-র।" সে কথা বিলাত থেকে ফিরে রবিদা আমাদের নিকট বলেছিলেন। আমাদের দেশী রীতিতে মন থেকে আঁকার বিশেষত্বের বিষয় তারপর রবিদা ভাল করে বুঝলেন।

এইরূপ মডেল রেখে আঁকার প্রথা অবশ্য য়ুরোপে গত দুই মহাযুদ্ধের পরে ব্যতিক্রম ঘটলো—একেবারে আদিম মানুষের বা শিশুদের মত হিজিবিজি আঁকার হল প্রচলন যাকে 'সুররিয়ালিষ্ট' আর্ট বলা হয়। এই প্রকার আর্টের ভাঙনের ধারা য়ুরোপে সুরু হল ফোটোগ্রাফি আবিষ্কার হওয়ার পর থেকে। বহির্মুখী (Extrovert) পন্থায় ছবি এঁকে যা' না পারা যায় ফোটোর দ্বারা তা' সম্ভব হ'ল দেখে য়ুরোপে এইপ্রকার অভিনব পরীক্ষার প্রয়োজন হল। আধুনিক য়ুরোপ art for art's sake মেনে নেওয়ায় এখন আর জীবন বা ধর্মের সঙ্গে তার কোনো যোগ নেই। এখন তাই জনতার জন্যে হচ্চে আর্ট।

টেকনিকের বেলায় য়ুরোপে সব রঙে সাদা মিশিয়ে ঘন করে (Tempera) আঁকার সনাতনরীতি ছেড়ে প্রথমে Oil-tempera (অর্দ্ধেক তেল রঙ আর অর্দ্ধেক সাদা মেশানো জল-রঙ) এবং ক্রমশঃ তেল রঙে (oil-এ) ছবি আঁকার রীতি প্রবর্তিত হল। ক্যানভাসের উপর তেল রঙের স্থায়ীত্ব বেশী এবং নানা রঙের মিশ্রণ সহজে দেওয়া যায়।

আদি মানুষ বা শিশুদের মত আঁকা ছবির প্রচলন হল য়ুরোপের সাহিত্যিক শিল্পরসিকদের মনঃস্তত্ত্বের (psychology-র) মাপকাঠিতে বিশ্লেষণ করার দ্বারা। পূর্বের সনাতন প্রথাকে সর্বতোভাবে নিন্দা করার দ্বারা এই সব অভিনব কলারসিকরা তাঁদের মত প্রতিষ্ঠিত করলেন। এই প্রচলনের প্রধান পাণ্ডা Herbert Read, R, K, Wilenski প্রভৃতি কয়েকজন সাহিত্যিক মনঃস্তত্ত্ববিদ।

ভারতবর্ষের ধর্ম ও দর্শনের অন্তর্মুখী (মনন) বিষয় ছান্দোগ্যে (৭।১৮) আছে :

"যদৌ বৈ মনুতেহথ বিজানাতি নামত্বা
বিজানাতি মত্বৈব বিজানাতি মতিস্তেব বিজিজ্ঞাসিতব্যেতি
মতিং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি।"

—অর্থাৎ, (সনৎকুমার বল্লেন) মানুষ মনন করে তখনই সে বিশেষরূপে বিজ্ঞাত হয়—মনন না করলে জানতে পারে না। এই মননকেই বিশেষরূপে জানবার ইচ্ছা করা উচিৎ। (নারদ বল্লেন) 'আমি মননকেই বিশেষরূপে জানতে চাই'।

রবীন্দ্রনাথও 'শেষের কবিতায়' একস্থানে বলেছেন : "মন দিয়ে চেখে খাবার ধাত আমার, চোখ দিয়ে গিলে খাবার ধাত আমার নয়।"—ভারতবর্ষের এই introvert বা subjective mood না ধরতে পারলে এদেশের আর্ট বা সাহিত্যের রসাভাস বোঝা যাবে না। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে গেলে বলতে হবে—চোখ দিয়ে গিলে খাবার জিনিষ সিনেমা, পোষ্টার বা বিজ্ঞাপনী ছবি—আর অবনীন্দ্রনাথের আঁকা ছবি বা অজন্তার ছবি মন দিয়ে চেখে খাবার জিনিষ।

শিল্পকলার শাস্ত্রেও তাই আছে :

"আলিখেত্‌ কিট্টলেখন্যা সুমুহূর্তে শুভস্থলে
সুস্থচিত্তঃ সুখাসীন স্মৃত্বা স্মৃত্বা পুনঃ পুনঃ॥

—অর্থাৎ শুভমুহূর্তে, শুভস্থলে, সুস্থচিত্তে সুখাসীন হয়ে বার বার চিন্তা করতে করতে কিট্টলেখনীর দ্বারা আঁকবে। [কিট্টলেখনী অর্থে ঘাসের তৈরী তুলি এখনো তাঞ্জোরে চিত্রকররা ব্যবহার করে (বা কৃষ্ণ লেখনী?]

শ্রীমহাবজ্রভৈরবতন্ত্রে শিল্পী যে Bohemian নন তা' বেশ জানা যায়। শিল্পী ভাল লোক, নিষ্কর্মা নন, রাগ-দ্বেষহীন, নিষ্ঠাবান, দাতা, আত্মসংযমী ধার্মিক এবং পণ্ডিত হবেন এই কথা স্পষ্ট দেওয়া আছে। তাছাড়া বলা হয়েচে সাধক ব্যক্তির সামনেই তিনি ছবি আঁকবেন বৈষয়ীকরা তাঁর কাজ করার সময় উপস্থিত থাকবেন না।

শিল্প অর্থে প্রকৃতপক্ষে শীল ও প্রসাদগুণ যাতে আছে তাকেই শিল্প বলে। শিল্পই মনে সাত্ত্বিক প্রসাদগুণ আনবে।

প্রসীদন্তে মনাংস্যত্র তে প্রাসাদাপ্রসীদিতা।

—অর্থাৎ মনকে প্রসন্ন করলে তাকে প্রসাদ বলে।

শেষ বয়সে কবির ছবি আঁকা

চিত্রকলাকে 'চিত্রাভাস' বলা হোতো এবং চিত্র বলতে ভাস্কর্য ও চিত্র দুই বোঝাতো। আজকাল য়ুরোপীয় ক্রিটিকদের দেখাদেখি আমাদের দেশের তথাকথিত ক্রিটিকেরা যে করণপ্রকরণ (technique) নিয়েই নাড়াচাড়া করেন আসলে তার মধ্যে আর্ট নেই, এই কথাই ভরতশাস্ত্রে দেওয়া আছে :

"রঙে ন বিত্ততে চিত্রম্ ন ভূমৌ ন চ বাহনে।"

অর্থাৎ—চিত্র বর্ণের ভিতর পটভূমির মধ্যে বা আধারের ভিতর নেই। (আছে শুধু ভাব পরিকল্পনার ভিতর)।

১৩৫৫-তে পৌষ-মাঘ সম্মেলিত সংখ্যায় 'কালান্তরে'—"দেশের কলার দেশী নিরিখ" নামে যে প্রবন্ধ লিখেছিলুম সেটি আমার Our Heritage in Art ইংরাজি বইটিতে দেওয়া আছে। সংক্ষেপে নিচে দিলুম।

আমাদের কাব্যকলা ও চিত্রকলায় নয় প্রকারের রসের (Emotion-এর) আয়োজন আছে। যথা : শান্ত, করুণ, বাৎসল্য, শৃঙ্গার বা আদি, বীর, হাস্য, অদ্ভুত, বিভৎস, রুদ্র। এই নব রসের তিনটি গুণ-ভাগ আছে : সত্ব, রজঃ ও তমঃ। [সত্বগুণ, Impersonality বা detachment ; রজগুণ materialistic manifestation এবং তমগুণ chaos বা inertia] গীতায় সত্বগুণ সম্বন্ধে আছে :

"সর্বভূতেষু যো নৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে
অবিভক্তং বিভক্তেষু তদ্জ্ঞানং সিদ্ধিসাত্বিকং।

—অর্থাৎ ; যিনি সর্বভূতে একই অব্যয়ের বিকাশ দর্শন করেন, যিনি বহুভাবে বিভক্ত জগতে একত্বের সন্ধান পান তাঁর জ্ঞান সত্বিক গুণেই বর্দ্ধিত ও পুষ্ট। বাল্মীকি, কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথের কাব্যে তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

রজঃগুণে, লোভ প্রবৃত্তি, স্পৃহা এবং আশক্তির ফলে অশান্তি জন্মে। এই গুণ যে শিল্পীর আছে তিনি ব্যবসাদারী দৃষ্টি আকর্ষক fantastic ছবি, প্রতিকৃতি এবং দৃশ্যচিত্র আঁকেন।

তমঃগুণে, বিবেক-ভ্রংশ, অপবৃত্তি, মোহ ও প্রমাদ জন্মায়। অহম্‌ই এর প্রধান কারণ। শিল্পী ও কবির পক্ষে আসুরিক মাতালের লক্ষণ যুক্ত, অতএব পরিত্যজ্য। Carricature এবং বিলাতি আধুনিক Surrealist চিত্রকলা এর পরিচয় দেয়।

শাস্ত্রে আছে :

সত্ত্বগুণঃ স্মৃতো ব্রহ্মা
বিষ্ণু রজোগুণাত্মকঃ
তমোগুণঃ স্থিতো রুদ্রো
নির্গুণঃ পরমেশ্বরঃ ॥

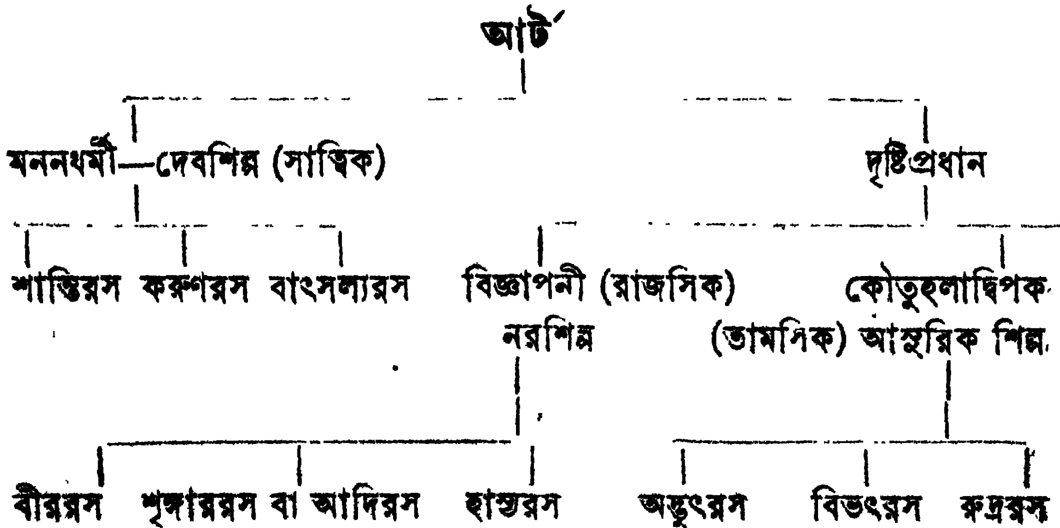
—অর্থাৎ ব্রহ্মাই সত্ত্বগুণান্বিত, বিষ্ণু রজঃগুণাত্মক, রুদ্র (শিব) তমঃগুণেই স্থিত এবং পরমেশ্বর নির্গুণ।

এই তিনগুণের তিনটি কোরে রস আছে। যথা : (১) সত্ত্বগুণে—শান্ত, করুণ, বাৎসল্য : (২) রজগুণে—বীর, শৃঙ্গার, হাস্য ; (৩) তমঃগুণে অদ্ভুত, বিভৎস আর রুদ্র। মহাকবি বাল্মীকি রামায়ণের গোড়াতেই বলেছেন : (আদি ৪।৯)

"রসৈঃ শৃঙ্গারকরুণহাস্যরৌদ্রভয়ানকৈ
বীরাদিভী রসৈযুক্তং কাব্যমেতদ্‌গায়তাম।"

অর্থাৎ, শৃঙ্গার, করুণ, হাস্য, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীর প্রভৃতি সমুদয় রস সংযুক্ত কাব্য আমি গাইছি।

যুদ্ধোত্তর য়ুরোপ তমঃগুণাত্মক অদ্ভুৎ, বীভৎস আর রুদ্ররসই তাদের আর্টে গ্রহণ করেছে। ফ্রয়েডের মনঃস্তত্ত্বের বীভৎস দিকটাই সর্বতোভাবে দেখা যাচ্ছে আর্টে। আমাদের শিল্পশাস্ত্রে সাত্ত্বিক আর্টকে 'দেবশিল্প', রাজসিক আর্টকে 'মানব শিল্প' এবং তামসিক আর্টকে 'আসুরিক শিল্প বলা হয়। এই হিসাবে নীচে একটি ছক দেওয়া গেল :





ডঃ স্টেলা ক্রামরিশ



শিল্পী মাদাম আঁদ্রে কার্পেলে

শেষ বয়সে কবির ছবি আঁকা

মননধর্মী সাত্বিক আর্টে থাকে বিষয় বস্তুর নির্বাচন এবং মৌলিক পরিকল্পনা। দৃষ্টিধর্মী আর্টে থাকে কেবল বৈচিত্র—কারণ-প্রকরণের বাহার—ভাবানুভূতির ধার ধারে না।

অবনীন্দ্রনাথ নিয়েছিলেন দেশের পূর্বোক্ত মননধর্মী অন্তর্মুখী (introvert subjective Art)। সর্বভূতে এক অব্যয়ের বিকাশ দর্শনের সাধনা তিনি মনঃ কল্পনার দ্বারা প্রকাশ করেছেন। রবীন্দ্রনাথও তাঁর কাব্যে ও গানে ঠিক এই একই পথের পথিক ছিলেন। সাত্বিক পরিকল্পনাই তার মূলে ছিল। প্রাচীন দেশের আর্টের প্রকৃতিকে তাঁরা কেহই ভোলেননি বা উপেক্ষা করেননি। রবীন্দ্রনাথ দেশের বোনিয়াদী আর্টের এই গুণ রক্ষা করে কাব্যে যা দিয়ে গেছেন তাতেই য়ুরোপ নতুন জিনিস দেখতে পেয়েছিল এবং নোবেল পুরস্কার সেই কারণেই তিনি তাদের হাতে পেয়েছিলেন।

চিত্রকলায় অবনীন্দ্রনাথ টেকনিকের বেলায় প্রত্যেক রঙে সাদা মিশিয়ে ঘন করে (tempera-তে) প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে ছবি না এঁকে বহু রঙের সংমিশ্রণে—wash technique যা এ-যুগে আবিষ্কার করলেন তার তুলনা কোনো দেশেই নেই। অনন্যসাধারণ এবং অননুকরণীয় তাঁর চিত্ররীতি, একেবারে নিজস্ব সম্পৎ। অথচ ব্যবসাদারী তথাকথিত শিল্পরসিকেরা তার বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে লাগলেন। তাঁর কাজকে 'গোবর গোলা রঙে আঁকা'—'নেশাখোরের মত ধোঁয়াটে আঁকা' ইত্যাদি—বলে উড়িয়ে দিতেও ছাড়েননা। এঁদের চোখ যেহেতু ব্যবসাদারী রঙিন চটক্‌দার ছবি বা সিনেমা ছবি দেখে তৈরী, তাই অবনীন্দ্রনাথের সাত্বিক চিত্রকলা বুঝতেই পারেন না তাঁরা। যেমন ছ'টি স্বরগ্রামের মিশ্রণে তবে বিচিত্র সুর জন্মে তেমনি সপ্তবর্ণের সংমিশ্রণেই ছবিতে রঙের সুর দেয়। এই মিশ্রণের শক্তি এবং মনঃসজ্ঞা (intuition) থাকা চাই ছবি আঁকাতে। চিত্রকর মাত্রেই জানেন যে tempera রঙের একটি সীমা নির্দেশ আছে, রঙের মিশ্রণ বেশী চলে না এবং প্রকৃতির ষড়ঋতুর সকাল, সন্ধ্যা, রাত্রি প্রভৃতি সকল কালের বর্ণাভাস দেওয়া যায় না। প্রাবৃটের দিনমুখে নবারুণ আভা বিস্তারকালে অয়স্কান্ত বারিদজাল যখন প্রভাকরকে প্রভাহীন করে এবং রজত নীল স্নিগ্ধ মণিউজ্জ্বল এক বিচিত্র বর্ণাভাস মসীকৃষ্ণ তরুরাজির শীর্ষে প্রতিভাত হয়, তার রূপ-রস Tempera রঙে কখনোই দেখানো যায় না। তা' কেবল

অবনীন্দ্রনাথই Wash technique-এর প্রথা আবিষ্কার করে দেখিয়ে গেছেন। ভারতশিল্পের নবীনতার গৌরব অবনীন্দ্রনাথের আবিষ্কৃত এই টেকনিকেই আছে —অন্যত্র নেই। Roger Frey র মত য়ুরোপের বহু ক্রিটিক তাঁর এই বিশেষ গুণ তাঁদের বহির্মুখী দৃষ্টি ভঙ্গী নিয়ে বুঝতেই পারেননি। তাই গালি দিতেও ছাড়েননি তাঁকে।

অনেকে বলেন, অবনীন্দ্রনাথ জাপানীদের কাছে wash technique শিখেছেন। নন্দলাল বসুর Album of Nandalal Bose শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সঙ্ঘ প্রকাশিত এবং অষ্টাশীতিতম অবনীন্দ্র জন্মোৎসব স্মারকপত্রিকায় (১৯ হইতে ২৩ ভাদ্র, ১৩৬৫) নন্দলাল বসু এবং মুকুলচন্দ্র দে লিখেছেন অবনীন্দ্রনাথ জাপানীদের কাছে Wash Technique শিখেছিলেন। কিন্তু জানা প্রয়োজন, যে-সময় জাপানী শিল্পীরা অবনীন্দ্রনাথের অতিথি হয়ে অবস্থান করেছিলেন সে সময় উক্ত শিল্পীরা কেহই অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। 'জোড়াসাঁকোর ধারে' পুস্তকে এবিষয়ে অবনীন্দ্রনাথ যা লিখেছেন তাই শিরোধার্য্য। তিনি তাতে লিখেছেন, "টাইকান আমায় লাইন ড্রইং শেখাতো, কি কোরে তুলি টান্‌তে হয়। ...আমার কাছে সেও শিখতো মোগোল ছবির নানা টেক্‌নিক।"

এই ধারণার কারণ এই যে ১৯০০-এর গোড়ায় ওকাকুরা অবনীন্দ্রনাথের বাড়ীতে জাপান থেকে Bijut Sen School এর তিনটি প্রধান চিত্রকরকে পাঠান। তার মধ্যে আধুনিক কালের বিখ্যাত টাইকোয়ান-সানও এসেছিলেন তাঁর কাছে। এঁরা তাঁর কাছে অতিথি থাকার কালেই অবনীন্দ্রনাথ নিজস্ব Wash techinique আরম্ভ করেন কিন্তু তাঁদের কাছে শিখে বা অনুকরণ কোরে নয়—নিজে পরীক্ষার দ্বারা নতুন পথ নিয়েছিলেন। যাঁরা জাপানী চিত্রকলার বিষয় জানেন বা দেখেছেন তাঁরাই বুঝতে পারবেন অবনীন্দ্রনাথের Wash দেবার রীতি এবং জাপানি রীতির আকাশ পাতাল তফাৎ। বরং গগনেন্দ্রনাথই জাপানীদের কিছু টেক্‌নিক আয়ত্ত করেছিলেন। "Cousin Gaganendra" প্রবন্ধে (Visva-Bharati May, 1938) রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন: Gaganendra was influenced by the Japanese technique as his early works show" গগনেন্দ্রনাথ জাপানী টেকনিকের সঙ্গে তখনকার বিলাতি আধুনিক Cubist, Impressi-

-onist আর্টের সমন্বয়ে তাঁর বিশেষ একটি পরীক্ষা করে গেছেন। অবনীন্দ্রনাথ বা তাঁর শিষ্যেরা তখন তাতে আকৃষ্ট হননি।

এইবার রবিদাদার ছবি আঁকার কথা বলি। যেমন অল্পবয়সে বাড়ীতে তাঁদের সব ভাইয়েদেরই মল্ল রেখে মল্লক্রীড়া, ওস্তাদ রেখে গান, সাঁতারু রেখে সাঁতার শেখবার ব্যবস্থা ছিল, তেমনি চিত্রকলা শেখবারও ব্যবস্থা ছিল। পূর্ব্বে আমাদের দেশে চৌষট্টি কলায় শিক্ষাপূর্ণ হোতো, তেমনি এঁদের বাড়ীতেও শিক্ষার ত্রুটি ছিল না। তাছাড়া জাতিস্মর কবির স্বতস্ফূর্ত স্বাভাবিক শক্তি থাকায় কোনো কিছু করতে হলে তাঁকে কোমর বেঁধে লাগতে হতো না। একথা তিনি নিজেও বারবার আমাদের বলে গেছেন।

বৈয়াকরণিক বা টেকনিসিয়ান হয়েই তিনি থেকে যাননি। তাঁর সত্য-আশ্রিত সকল কর্ম যেমন সাত্বিক বিবেক-প্রবুদ্ধ, বৃদ্ধ বয়সে (৭০ বৎসর বয়সে) চিত্রকলায় ও তাঁর ব্যক্তিত্বের রাজসিক ও তামসিক কৌতুহলকেই পরিবেশন করে গেলেন। কোনো আর্টই শিল্পীর ব্যক্তিগত আন্তরিকতায় উদ্বোধিত না হলে তা কখনই সফল হয় না। সকল শ্রেষ্ঠ শিল্পীর অন্তরই প্রকাশ পায় তাঁদের রচনার মধ্যে।

কবি সময় সময় অন্যমনস্ক হয়ে নিজের লেখা কাটাকুটি করার কালে কলমের খোঁচায় বিচিত্র নক্সা ফোটাতেন—তার ভিতরেও থাকত তাঁর রাজসিক অন্তঃপ্রকৃতির ব্যঙ্গকৌতুকের ছাপ। তিনি তাঁর কাব্যের মধ্যে এই রস খুবই কম দিয়েছেন। তাঁর যৌবনে রচিত 'হাস্যকৌতুক' ও 'ব্যঙ্গকৌতুকে'র মতই বৃদ্ধ বয়সে ফুট্‌লো তাঁর আঁকা ছবিতে সেই একই রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতি।

রবিদাদা স্বভাবকবি ছিলেন এবং অসুন্দরকে তাঁর রচনায় প্রশ্রয় দেননি। শুনেচি অল্প বয়সে তিনি কুৎসিৎ বস্তু বা অসুন্দর মানুষকে সহ্য করতে পারতেন না। সুন্দরের—সাত্বিক ভাবেরই পূজারী ছিলেন। 'আনন্দম্ অমৃতম্ ব্রহ্ম'—এই তাঁর মূলমন্ত্র ছিল। সৃষ্টির মধ্যে তিনি আনন্দময়কেই উপলব্ধি করেছিলেন, আর তারই প্রকাশ-বেদনা তাঁর কাব্যে সর্বদা ফুটতো। রুদ্রের দক্ষিণ মুখ (প্রসন্নমুখ) দেখার আরাধনা তিনি করেছেন প্রত্যহ। রুদ্রের ভয়ংকর তামসিক ভাবকে তিনি মনে স্থান দেননি। তিনি সুন্দরকেই নবতরভাবে সৃষ্টি করতেন, ধ্বংশ বা বিদ্রোহ উৎপাদন তাঁর প্রকৃতি ছিল না। শান্ত সাত্বিক প্রকৃতি তাঁর,

যা' হিন্দু বৌদ্ধ দর্শনের মধ্যে আমরা পাই। সেই সুন্দর শান্তরই ঘোষণা একদিন হিমালয়ের শিখরে (রামগড়ে) বসে করেছিলেন একটি গানে :

"এই লভিনু সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর
পুণ্য হল অঙ্গ মম ধন্য হল অন্তর।"

তাঁর কবিতার কাটাকুটির বিকৃতির মধ্যে যা ফুটতো তার দাম ধার্য হ'ল শেষ বয়সে (৭০ বৎসরে) তাঁর সাত্ত্বিক প্রকৃতির সব খেলা অন্তে রাজসিকভাবে ছবি আঁকার খেলা করে; কাকতালিয়বৎ সহায় হল য়ুরোপের আধুনিক চিত্রকলা (Surrealist art); তাই কবি ছবিতে ব্যঞ্জনা দিতে পারলেন অদ্ভুৎ-কিম্ভুৎ চিত্র এঁকে। তাঁর কলমের খোঁচায় রঙিন লেখার কালি দিয়ে আঁকা ছবির মত তাঁর পূর্বে এঁকে গেছেন জার্মানীর একটি চিত্রকর Kubin ১৯২০রও পূর্বে। তাঁর ছবি দেখলেই মনে হয় রবীন্দ্রনাথের আঁকা—এত মিল আছে। Kubinএর ছবির বইটি আমার কাছে আছে। তার নাম JUNG KUNST (Bandi) Max Pechstein and George Beimann প্রণীত Leipzig-এ ১৯২০-তে প্রকাশিত। কলারসিক ষ্টেলাক্রেমরিশ ও জার্মান চিত্রকর Nolda এবং Kubin শিল্পীদ্বয়ের আঁকা চিত্রকলার সৌসাদৃশ্য পেয়েচেন কবির আঁকা ছবিতে। (Hindusthan Standard ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৩ দ্রষ্টব্য)।

কবি নিজে ছবি আঁকার পূর্বে ১৯২১ সালে ২৬শে সেপ্টেম্বারের চিঠিতে তিনি যা' আমায় লিখেছিলেন তা থেকে বোঝা যায় যে তিনি দেশের সাহিত্য বা আর্টে বিদেশের গোলামী পছন্দ করতেন না। আমায় লিখেছিলেন :

"কল্যাণীয়েষু অসিত,.........আমাদের ছাত্ররা ইংলণ্ডের বিদ্যালয়ে গিয়ে ছাপ-মারা হয়ে আসে, এ আমার কিছুতেই ভাল লাগে না। তার ফলে হবে এই যে, তাদের যদি স্বকীয় প্রতিভা থাকে, সেটার উপর দাগ দিয়ে দেবে বৃটিশ সাম্রাজ্য। আমাদের আর্ট রোদেনষ্টাইনের ধামাধরা না হলে যদি প্রতিষ্ঠা না পায় তবে সে আর্ট মহাকালের ঝাঁটার তাড়নায় বৃটিশ সাম্রাজ্যের আঁস্তাকুড়েই স্থান পাবার যোগ্য। বৃটিশ ইস্কুল মাষ্টারের ছাত্রগিরি তো করেচিই...সেই স্কুলের বাইরে একটা বড়ো আঙিনা আছে যেখানে আমাদের ছুটি—সেখানেই আমাদের ভারতীর দরবার, সেখানে তিনি যার ললাটে জয়-তিলক পরিয়ে দেন

সেই হয় ধন্য। সাউথকেনসিংটন স্কুল-অফ-আর্টসের ফোঁটায় গৌরব নেই—বরং তাতে আমাদের সরস্বতীর অমর্যাদা করা হয়।

এই সব ছাত্রদের খুব সম্ভব নিজের শক্তি আছে। কিন্তু ইতিহাসে চিরদিনের মতো লেখা থাকবে যে তারা ইংরাজ গুরুমহশায়ের চেলা—এই ঘোষণায় আমাদের দেশের অগৌরব। অর্থের লোভে আর্টিষ্ট যদি নিজের দৈবী শক্তির অসম্মান করতে সম্মত হয় তাহলে তার উপরে কখনো ভারতীর প্রসন্ন আশীর্বাদ পড়বে না। তার প্রমাণ আমাদের ঘরের কাছেই আছে। —রবিদাদা।

রবিদা শেষ বয়সে যখন ছবি আঁকতে আরম্ভ করেন তখন য়ুরোপে তাঁর চিত্রকলার খুব খাতির হয়েছিল তার বিষয় জানিয়ে আমাকে লিখেছিলেন ২রা বৈশাখ, ১৩৪৫-এ।

"কল্যানীয়েষু—প্যারিসে, বার্লিনে আমার ছবির সম্বন্ধে সেখানকার প্রধান কাগজে নাম্‌জাদা চিত্র-বিচারকদের হাতে যে অকুণ্ঠিত প্রশংসা পেয়েছি তার মধ্যে পিঠ থাব্‌ড়ানো স্কুল মাষ্টারি ছিল না। Paul Valeryর নাম শুনেচিস্‌ কিনা জানিনে। তিনি বলেছিলেন 'Your pictures will be a lesson to our artists। সেখানকার আর্টিষ্টদের কাছে এমন কথাও শুনেচি "You have done what we attempted to reach and have failed……আমার শিল্প সমাদরের কথা ভাবিসনে, যাও বা পেয়েচি—এদেশের কারো কাছ থেকে ভিখ্‌ মাগবার দরকারই হবে না। —রবিদাদা।"

কবি আধুনিক য়ুরোপের চিত্র-পন্থা নেওয়ায় য়ুরোপীয় আধুনিক ক্রিটিকরা তাঁর কাজে মুগ্ধ হ'তে পেরেছিলেন কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের চিত্রকলাকে Havell, Coomaraswamy, Consins প্রভৃতি মুষ্টিমেয় লোকেই ধরতে পেরেছিলেন। আজও তাঁর কাজের সঠিক বিচার স্বদেশে-বিদেশে কোথাও হয়নি, যদিও তাঁর নাম ছড়িয়ে গেচে সর্বত্র Havell এবং Coomaraswamyর প্রচারের জন্যে! Roger Frey বা অন্যান্য য়ুরোপের ক্রিটিকেরা অবনীন্দ্রনাথের চিত্রকলাকে আমোলই দেননি।

পৃথিবীতে সব চেয়ে বড় কাব্যের ভিতর যেমন চিত্রাভাস বর্ত্তমান, তেমনি চিত্রকলার মধ্যেও কাব্যরস সঞ্চিত থাকে। কবি আঁকেন ছবি বর্ণন-ভঙ্গীতে, চিত্রী আঁকেন বর্ণিকাভঙ্গী দিয়ে, দুজনের কাজ একই কেবল প্রকাশ প্রণালীতেই বৈসম্য থাকে।

মহাকবি রবীন্দ্রনাথ যে ছবি আঁকা নিয়ে মেতে গিয়েছিলেন তা' খুবই স্বাভাবিক। তিনি ছবি আঁকাতে, চিত্রকলা যে একটা সামান্য জিনিষ নয় তা' জগতের লোক মেনে নিয়েচে আজ। একবার তাঁকে আমি প্রশ্ন করেছিলুম, "ভবিষ্যতে যুদ্ধধর্ষিত বসুন্ধরাকে বাঁচাবার জন্যে কোন্ মহাপুরুষের আবার আবির্ভাব হবে?" তিনি বলেছিলেন "পৃথিবীর দুঃখ লাঘব করতে জন্মাবেন শিল্পী। শিল্পানুরাগই মানুষকে মুক্তির পথ দেখাবে।"

অবনমামা রবিদার চিত্রকলার বিষয় কখনো কোনো আলোচনা করেননি আমাদের সঙ্গে। আমরাও এবিষয় তাঁকে কোনো কথা বলতে সংকোচ বোধ করতুম। তাঁর সঙ্গে একসঙ্গে বসে রবিদাদার ছবি দেখার একটা ঘটনা বলি।

২৬শে মে, মঙ্গলবার ১৯৩১-এর কথা। আমার ভাগ্নে জিমূত চট্টপাধ্যায় ডায়রীতে লিখে রেখেছিলেন। গরমের ছুটিতে আমি গেছি কলকাতায়, লখনউ থেকে, রবিদাদাও দার্জিলিঙে যাবার মুখে কলকাতায় এসেচেন শান্তিনিকেতন থেকে। আমার ছোট ভাই দীপ্তিময় আর জিমূত আমার সঙ্গে ছিলেন তখন জোড়াসাঁকোতে রবিদাদার কাছে। রবিদা জিমূতকে দিয়ে একটি বিরাট ছবির পুলিন্দা (Portfolio) পাশের ঘর থেকে আনালেন। পুলিন্দা খুলতেই দেখা গেল একশতের উপর তাঁর নিজের আঁকা ছবি। পূর্বে আমার সব ছবির তিনি নামকরণ করতেন এখন বল্লেন আমাকে তাঁর ছবির নামকরণ করে দিতে। ঠিক এই সংকটে আমাকে বাঁচালেন আমার গুরুদেব অবনমামা সেখানে এসে। রবিদা দীপ্তিকে বল্লেন "তুলে ধর একটা করে ছবি—দীপ্তি, তুই এনজিনিয়ার ঠিক ভাবে ধরতে পারবি।" দীপ্তি প্রথম ছবিটা ধরলেন আমাদের সামনে উল্টো কোরে—কেন না য়ুরোপের আধুনিক surrealist ছবিগুলিরই মতন—আঁকার কোনো নির্দ্দেশের বালাই নেই—বোঝা যায়না উল্টো সোজা। রবিদা দীপ্তিকে একটু বকুনি দিলেন। অবনমামা তখন কৌতুকমাখা দৃষ্টিভঙ্গীতে বল্লেন, "না রবিকা, দীপ্তি ঠিকই করেচেন,—এসব চিত্র, বিচিত্র, তাই সব দিক দিয়েই দেখতে পারা যায়।"

ছবিগুলির নামকরণের ভার অবনমামাই নিলেন এবং 'উড়ুক্কু-পড়ুক্কু'—'উঠচঞ্চুচঞ্চলাক্ষী'—'আস্থিবুড়ো'—'অরণ্যক'—'ডিণ্ডিদণ্ডনায়ক' প্রভৃতি ছবিগুলির মতই উদ্‌ভুটে নাম আবিষ্কার করতে লাগলেন। আমি কলম চালিয়ে দ্রুত নামগুলি লিখতে না-পারায় ভাগ্নে জিমূতকে দিলুম লিখতে। তারপর

রবিদার নিকট উপস্থিত হলেন শিশির ভাহুড়ি অভিনেতা এবং কবি রাধারানী দেবী। আমি আমার Colibri জার্ম্মান ছোট্ট ক্যামেরায় রবিদার একটা snap নিলুম।

এর পূর্বে একবার এই ক্যামেরায় তাঁর ছবি তুলতে গিয়ে মাথার দিকে একটু অংশ বাদ পড়েছিল কিন্তু মুখের ভাব সুন্দর উঠেছিল। সে সময় তাঁর নিকটে কবি রাধারানী দেবীও উপস্থিত ছিলেন। রবিদা ফোটো পেয়ে দার্জিলিঙ থেকে ২০শে জৈষ্ঠ ১৩৩৮-এ আমায় লিখলেন:

"কল্যাণীয়েষু—অসিত, ছবিতে দেখলুম তোর ক্যামেরা আমার মাথা খেয়েছে। এটা অন্যায় হোলো।

তোর মেয়ের নাম রাখ্ 'রোচনা'। এক ফারসি প্রতিশব্দ—'রোশেনারা' —অর্থাৎ যে মেয়ে আলো করে দেয়। ছবি দেখে মনে হোলো নামটা সার্থক হবে।

আজ ভোরের বেলায় দেখা গেল হিমালয়ের ধ্যানের উপর থেকে মেঘাবরণ সরে গেছে—আকাশ শুভ্র এবং শান্ত প্রকাশমান। কিন্তু গৃহস্থের চক্ষু তখনো খোলেনি—রবিদাদা।

এই চিঠির শেষের দিকের বর্ণনা একটি ছবি ব্যতীত আর কিছুই নয়— কবির বাণীর রঙও রেখায় সমুজ্জ্বল হয়ে ফুটে আছে চিত্র।

কবি বৃদ্ধ বয়সে ছবি আঁকার কালে যদি রাজসিক বা তামসিক গুণের আভাস দিয়ে থাকেন তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। তাই বোলে তিনি দেশের সাত্বিক ভাবের আর্টের অমর্যদা করেননি কখনো। শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথকে যথোচিতভাবে সম্মানিত করার জন্যে দেশের লোকের নিকট অনুরোধ জানিয়েছিলেন তাঁর মৃত্যু শয্যায়। (অবনীন্দ্রনাথের "ঘরোয়ার" ভূমিকা দ্রষ্টব্য)।

এই প্রসঙ্গে ভারত শিল্পের নবজাগরণ যজ্ঞের বিষয় আরো কিছু না বলে থাকতে পারচিনা। রাজা রামমোহন রায় যেমন দুর্দশাগ্রস্ত ভারতের ধর্ম্ম দর্শন, সমাজসংস্কার ও শিক্ষাবিস্তারের একজন যুগাবতার, মহাকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেমন নবীন ভারতের কৃষ্টির যুগপ্রবর্তক, মহাত্মা গান্ধীজি যেমন রাষ্ট্র-ক্ষেত্রে দেশের শৃংখল মোচনের পথ প্রদর্শক, তেমনি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর নব্য ভারতের উপেক্ষিত দু'হাজার বৎসরের শিল্পকৃষ্টির ক্রমধারার অপূর্ব নবজাগণের

আয়োজন করেছিলেন বিংশতাব্দীর প্রারম্ভে বাংলাদেশে স্বদেশী আন্দোলনের প্রাক্কালে।

কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে রাষ্ট্রক্ষেত্রে দেশ শৃংখলা মুক্ত কিন্তু শিল্পকৃষ্টির বেলায় ফরাসীদেশের আমদানী অতি আধুনিক আর্টেরই অবাধ অনুকরণ চলচে। অবনীন্দ্রনাথের অর্দ্ধশতাব্দীর প্রচেষ্টা প্রায় ধামাচাপা পড়ারযো হয়েছে। তার কারণ অনুসন্ধানের সময় এসেছে এখন বোলেই বলছি।

১। আর্টক্রিটিক নামধেয়ী ব্যক্তিরা (হ্যাভেল এবং কুমারস্বামী ছাড়া) সকলেই অবনীন্দ্রনাথের অভিপ্রায় অনুসারে তাঁর শিষ্যদের কাজের যাচাই করেছেন সর্বদা;—নিজেদের চোখে চোখে দেখেননি কারুকাজ। ফলে সকলে অবনীন্দ্রনাথের একমাত্র প্রিয়পাত্র ছাত্রেরই পরিচয় ক্রিটিকদের এবং অবনীন্দ্রনাথের লেখার মারফৎ জেনেছেন। অবনীন্দ্রনাথের মহান কাজ সংকীর্ণ হয়ে গেল এই এক বিশেষ কারণে। সহপাঠি ছাত্রদের মধ্যেও এতে স্বাস্থ্যকর উৎসাহ গেল ক'মে।

অথচ ঠিক্ এই বিষয় হ্যাভেল তাঁর Indian Sculpture and Painting গ্রন্থে (২৬৭ পৃষ্ঠায়) বলেচেন:

"The New School of Calcutta opens up a brighter prospect for the future, but as Professor Lethaby has said, no art that is only one-man deep is worth much. It should be thousand men deep."

২। কৌঁসুলী, অধ্যাপক, প্রত্নতত্ত্ববিদ এবং মসীজিবী আর্টক্রিটিকেরা সবাই আর্টের বাইরের লোক। ফলে ভারতীয় চিত্রকলার নবজাগরণের (Renaissance) ব্যাপকতা লাভ করতে পারল না 'বাঙলার শৈলী (Bengal school) বা ঠাকুর স্কুল (Tagore school) নাম প্রচার করায়। প্রাদেশিকতার গোঁড়ামীর দাগে অংকিত হওয়ায় সারা ভারতবর্ষে তা গ্রহণীয় হতে পারল না। যদিও দেখা যায় অবনীন্দ্রনাথের নিকট বাঙালী শিল্পী ছাড়াও লঙ্কা দ্বীপ থেকে নাগাহাওত্তা, মহিশুর থেকে ভেঙ্কাটাপ্পা এবং উত্তর প্রদেশ থেকে সমি-উজ্জমা এবং হাকিম মহম্মদ খাঁ এসে যোগ দিয়েছিলেন। পাটনার ঈশ্বরীবাবুও ছিলেন। তখন দুঃসপ্নেও অবনীন্দ্র গোষ্টীর শিল্পীরা বাঙলা পটের নকল ছবি এঁকে বেঙ্গল্ স্কুলের নাম রাখতে চাননি। তাঁরা সমগ্র ভারতের শিল্প শৈলীর প্রকৃতিকে প্রত্যক্ষবোধের দ্বারা জেনে ভবে



ডাকঘরে দইওয়ালা অভিনয়ে অসিতকুমার হালদার

জাতীয় শিল্পকলার পুনরুত্থানের যজ্ঞে নেমেছিলেন। তাঁদের তখন উদ্দেশ্য ছিল পুরোনো ভিত্তির উপর নতুন সৌধ তোলার, নকল করার উদ্দেশ্য ছিল না কোনো একটি বিশেষ দেশের কৃষ্টির।

৩। তৃতীয় কারণ হল অবনতির—Indian Society of Oriental Art-এর পরিচালনা ন্যস্ত হল না অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যদের হাতে। যাঁদের হাতে ভার পড়লো তাঁদের অক্ষমতার দরুণ সোসাইটি চিরকালের জন্য অচল হল। অথচ ছাত্রদের হাতে পড়লে তাঁরা তাঁদের একান্ত নিজেদের জিনিষ জেনে আপ্রাণ চেষ্টায় অনুষ্ঠানটি বাঁচিয়ে রাখতেন।

অবনীন্দ্রনাথের বন্ধু হাইকোর্টের জজ Sir John Woodroff লক্ষটাকার চেক্ অবনীন্দ্রনাথকে উপহার দিতে চেয়েছিলেন শিষ্যদের দিয়ে সোসাইটি চালনা করার জন্যে কিন্তু দুঃখের বিষয় অবনীন্দ্রনাথ তাঁর প্রস্তাব বা অর্থ গ্রহণ করতে পারলেন না।

এইসব অনিবার্যতার কারণ সোসাইটির দ্বার বন্ধ হয় এবং ভারতশিল্পের নব জাগরণীর উৎসাহ কমে যায়। আমাদের দেশে বড় প্রতিষ্ঠান এইভাবে একটি লোকেরই দ্বারা হয় এবং তাঁরই সঙ্গে সমাপ্ত হয়ে যেতে দেখা যায়। এবিষয় রবীন্দ্রনাথ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গৃহপ্রবেশ উৎসব সভায় যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তার কথা বলি। তিনি বলেছিলেন ঃ

"...সে (আমাদের দেশ) যাহা আরম্ভ করে তাহা কোনো একটি ব্যক্তি-কেই আশ্রয় করিয়া দেখা দেয় এবং সেই একটি ব্যক্তির সঙ্গেই বিলীন হইয়া যায়—তাহার সংকল্পকে বিচিত্র সার্থকতার পরম্পরার মধ্য দিয়া ভাবী পরিণামের দিকে বহন করিয়া লইয়া যাইবার কোনো উপায় নাই। ক্ষুদ্রতা, বিচ্ছিন্নতা অসমাপ্তি কেবলই দেশের ঋণের বোঝা বাড়াইয়া চলিয়াছে, কোনটাই পরিশোধ হইবার কোনো সুলক্ষণ দেখা যাইতেছে না"। ['পরিষৎ পরিচয়' (১৩০০-১৩৫৬) শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়]

রবীন্দ্রোত্তর বাঙলাদেশের কাব্যে বা অবনীন্দ্রনাথের প্রবর্তিত ভারতশিল্পে রেনেসাঁর পরম্পরাসূত্র আজ আর কোথায়? কবি একেই দেশের 'খণ্ডতা-শাপগ্রস্ত বন্ধ্যাদশা' বলেছিলেন।—এই দেশের একটি প্রগতিবিমুখ আশাহীন স্থবির অবস্থা।

রবিতীর্থ থেকে বিদায়ের পর

পূর্বেও দুবার আশ্রম থেকে অন্যত্র কাজ নিয়ে যাবার সম্ভাবনা হয়েছিল। একবার ১৯১৭-তে সার আকবর হায়দারী আমায় লিখেছিলেন হায়দ্রাবাদের সরকারী মিউজিয়ামের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করতে। তাছাড়া তিনি পরেও আবার Art Coloney পরিকল্পনা করার ভার দিয়ে হায়দ্রাবাদে থাকার জন্যে আমায় আহ্বান করেছিলেন। রবিদা নিজে থেকেই সার আকবরকে লিখেছিলেন আমাকে আশ্রম থেকে ছাড়তে পারবেন না বোলে। পরে আবার ১৯২০তেও বড়োদা মহারাজার আর্ট গ্যালারী রক্ষকের কাজে আমায় ডাকায় রবিদা তখন বড়োদা-মহারাজাকে স্বয়ং লিখে সে বিষয় নিরস্ত করে দেন।

কিন্তু অবশেষে সে এক অতি দুঃখের সময় অবাঞ্ছিত বিচ্ছেদ ঘটল রবিতীর্থের সঙ্গে আমার। ১৩২৩শে মাতৃবিয়োগ হল—আর তার ঠিক অব্যবহিত পূর্বে ভ্রাতৃপ্রতিম বন্ধু উইলি পিয়ার্সনেরও মা স্বর্গত হলেন। আমরা বিলাত যাবার স্থির করলুম। আমার পিতামহীর গচ্ছিত তহবিল (Kiron Kumari Haldar Trust Fund) থেকে বাবার মারফৎ ঋণ করে এবং ছবি বিক্রি করে অর্থ সংগ্রহ করে বিলাত রওনা হলুম।

সহযাত্রী হলেন উইলির সঙ্গে নগেন মেশো (রবিদার জামাতা নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী) এবং তাঁর পুত্র 'নিতু'। একটি ফরাসী জাহাজে (Porthos-এ) কলম্বো থেকে রওনা হলুম। তখনো পর্যন্ত ভাবিনি যে রবিতীর্থ এই সঙ্গে আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাবে। আশ্রম থেকে বিদায় কালে রবিদাদা আমাকে তাঁর বিলাতি বন্ধুদের নিকট কোনো পরিচয়পত্র দিলেন না—দিলেন আমার হাতে কেবল রুশ উর্বশী Anna Pavlowaর তাঁকে লেখা একটি পত্র। বল্লেন Parisএ তাঁর সঙ্গে এই পত্র নিয়ে দেখা করতে। তাঁর সে আজ্ঞা পালন করতে পারিনি। পরে জানতে পারলুম উদয়শংকর তাঁর কাছে গিয়েছিলেন সেই একই উদ্দেশ্যে। ফলে যে কি হয়েছিল তা সকলে অবগত আছেন। কবিকে কলকাতা, Grand Hotel থেকে ২০শে জানুয়ারী ১৯২৩-তে লেখা Pavlowaর পত্রে ছিল:

"Cher Maitre, Within a few days I shall be leaving Calcutta, and it will be a feeling of the most intense disappointment to

have to do so without having had the privilege of rendering you my personal homage. Your attitude towards life, and the world's suffering, your beautiful poetry and the adoration you are held in both amongst your countrymen and the entire Western world to have meeting you a recollection to be treasured... ... ...

I find my visit to India so full of deep interest and fascination that I am anxious to bring some tangible proof of my wonderful impression, and my idea is, to produce a new work based on some poetical legends of your country, and to add to my repertoir of Russian Art, a Indian Ballet, which would give me an opportunity of reflecting the character, and the poetry of its people, the music and dance of the nation and all the picturesqueness and splendour and of its colouring.

Would it be too presumtious on my part, Cher Maitre, to ask your advice on the matter? I would of course more than anything else—treasure the idea of utilising one of your own themes as a basis for this ballet; if I could persuede you to consent and to make a suggestion in that direction. If not, may I beg you to guide me in the way of finding a poetical and colourful legend, or perhaps a subject based on some romantic episode of the Indian people either of which would be suitable; and your literature, I know is inexhaustibly rich in both.

My departure from Calcutta takes place next Tuesday and I trust you will honour me by a reply before then—if possible and by your advice in this matter which shall be treasured more than I can say.

By your ardent admirer
Anna Pavlowa

পত্রের ভাবার্থ এইরূপ :

মাননীয় মহাশয়, কলকাতা ছাড়ার পূর্বে আপনাকে সাক্ষাতে সম্মান দেখানোর সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হওয়ায় অত্যন্ত দুঃখিত।......আপনার জীবন-দর্শন, বিশ্বের শোক-দুঃখের প্রতি সহানুভূতি, আপনার অপূর্ব কাব্য-রচনা শুধু আপনার দেশ নয় সমগ্র জগতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ।... ...ভারতবর্ষে

আসার ফলে আমার আন্তরিক ইচ্ছা জন্মেচে দেশে ফিরে গিয়ে এখানকার আশ্চর্য অনুভূতির একটা কিছু নিদর্শন নিয়ে যাবার। যদি কিছু না মনে করেন ত আপনার সহায়তায় ভারতবর্ষের পৌরাণিক বা আপনার নিজের পরিকল্পিত কোনো কাহিনী অবলম্বনে রুশ-নৃত্যকলার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করার আকাঙ্খা করি। আমি কি আপনার নিজস্ব কোনো কাব্যকে নৃত্যছন্দে রূপায়িত করব কিম্বা কোনো পৌরাণিক কাব্যময় মধুর কাহিনীকে নতুনভাবে প্রকাশ করব? আমি জানি আপনার রচনা এই দুই ভাবেই অশেষ ধনী। আমি কলকাতা থেকে মঙ্গলবারে যাচ্ছি, যাবার পূর্বে আপনার উত্তর পেলে আপনার উপদেশ আমি শিরোধার্য করব। আপনার একান্ত গুণমুগ্ধ —এনা পাভ্‌লোভা।

তারপর যখন ছ'মাসের মধ্যেই বিলাত থেকে প্রত্যাবর্তন করলুম, তখন বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষদের কাছ থেকে একটি ছাড়পত্র রাঁচিতে ফিরে পিতার কাছ থেকে পেলুম। শান্তিনিকেতনের সঙ্গে আমার সংস্রব সেই থেকে একেবারে চিরদিনের জন্যে চুকে গেল। এরপর আরো একটা দুর্দৈব ঘটল, খবর এল আমার সহযাত্রী বন্ধুবর উইলি পিয়ার্সন ইটালিতে ট্রেন-দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। আমি আশ্রম ছেড়ে জয়পুর রাজকীয় আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ হয়ে চলে যাচ্ছি দেখে রবিদাদা দুঃখ করলেন এবং বল্লেন তাঁর কাছে আশ্রমে থেকে যেতে। কিন্তু আমি বুঝলুম বিরাট দীপের নীচে যেমন অন্ধকার রবিদাদার প্রদীপ-জ্যোতির নীচে সবই অন্ধকার—আমার পক্ষে রবিতীর্থে আর স্থান নেই।

জয়পুরে যাবার পর ১০ই জানুয়ারী ১৯২৪-এ রবিদাদার পত্র পেলুম:

কল্যাণীয়েষু—কাঠিয়াড় থেকে ফিরে এসে নানা হাঙ্গামায় ব্যস্ত ছিলুম তাই তোকে চিঠি লিখতে পারিনি। ওখানে বেশ জমিয়ে বসেচিস্ শুনে খুব খুসি আছি। তোর দরবারে সশরীরে একবার হাজির হব মনে সঙ্কল্প ছিল কিন্তু ঘুরে ঘুরে হয়রান হয়ে পড়েছিলুম বলে এ যাত্রায় সে আর ঘটে উঠ্‌ল না। আর কোনো এক সময় দেখা যাবে।

কলাভবনের আদর্শ তৈরী করবার প্রস্তাব করেচিস্ সে ত ভালই ঠেক্‌চে। কিন্তু আমরা খুব বেশি ব্যয়সাধ্য ইমারৎ তৈরী করিয়ে Endowment-এর টাকা নষ্ট করতে ইচ্ছা করিনে। যে টাকাটা পাওয়া যাবে তাতে আমাদের কলাভবনকে চিরস্থায়ী করতে পারব এইটেই আনন্দের বিষয়। তার পরে

ক্রমে ক্রমে building এবং অন্যান্য আসবাব বাড়ানো যাবে। ইতিমধ্যে তোর Architect-কে দিয়ে একটা খসড়া তৈরি করিয়ে যদি পাঠাস্ ত বেশ হয়।

তোদের ওখানে crafts শেখাবার জন্যে কাউকে পাঠাবার প্রস্তাব করে দেখবো। আমার মনে হয় যারা craftsman তাদেরই ঘরের ছাত্র পাঠালে বেশি কাজ হবে। যারা artist তাদের এরকম কাজে সহজে মন বসে না।

কনকলক্ষ্মীকে* আমি বোধ হয় জানি। তাঁকে পেলে ভালই হয়। কিন্তু আমাদের আর্থিক অবস্থাত ভাল নয়। বছরে বিশ হাজার টাকার 'নাজাই' হয়—কোনো মতে ভিক্ষা প্রভৃতির দ্বারা পুরিয়ে আসচি, কিন্তু আমি ত আর পারিনে। বড় মাইনে দেওয়া কিছুতেই আমাদের সাধ্যায়ত্ত হবে না।

তোদের বোধ হয় গ্রীষ্মাবকাশ বলে পদার্থ আছে। সেই সময়টা এখানে একবার করে এসে তোদের কলা সম্মেলন করে যাস্—ক্রমে যেন দূরে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়িসনে। —রবিদাদা।"

তারপর জয়পুর রাজকীয় আর্ট স্কুল থেকে ১৯২৫-এর গোড়ায় লখনউ গভর্ণমেণ্ট আর্টস্ এণ্ড ক্রাফট্‌স্ স্কুলের অধ্যক্ষ মনোনীত হয়ে যোগ দিলুম। এই পদ এর পূর্বে ইংরাজ আর্টিষ্টদের একচেটিয়া ছিল—পাকাপাকিভাবে দেশী আর্টিষ্টকে এই প্রথম প্রশ্রয় ইংরাজরা দিয়েছিলেন। এতে অবশ্য পূজনীয় অবনীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত Renaissance School-এরই জয় হল—বিদেশী গভর্ণমেণ্টের কাছে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে। পূজনীয় রবিদাদা তখন লখনউয়ে আমায় লিখলেন :—

"কল্যাণীয়েষু—অসিত, জানতুম তোর একটা ভাল রকমের কিছু হবে। তা হ'ল। তোকে কিছুতেই চেপে রাখতে পারলে না।... ... যাই হোক্ বলে রাখচি যখন লখনউ জেলায় আম পেকে উঠ্‌বে তখন তোর এই ফললোলুপ দাদাকে স্মরণ করিস্।

তোকে একটা ছবির বিষয় দিচ্চি ; এঁকে শীঘ্র পাঠিয়ে দিস্। অন্ধকার পথ—একটি মেয়ে চলেছিল, বিপরীত দিক থেকে মশাল হাতে পুরুষ এসে তার সামনে দাঁড়িয়েচে—মেয়েটি তার অবগুণ্ঠন দুই হাতে তুলে ধরেচে—পুরুষ মশালের আলোয় তার মুখের দিকে তাকিয়ে। আকাশে ধ্রুব তারা।

---

*মহীশূরের শিক্ষা বিভাগের এই পণ্ডিতা মহিলার সঙ্গে লণ্ডনে থাকারকালে আলাপ হয়।

ভাল ক'রে এঁকে দিস্—দরকার আছে। দাম চাস, দাম দেব। ছবির নাম 'পরিচয়'। অতুলকে* আশীর্বাদ জানাস। —রবিদাদা।"

এই ছবিখানি রবিদাদা চেয়েছিলেন বন্ধুবর Mr. L. K. Elmherst-এর শুভ বিবাহ উপলক্ষ্যে। আমেরিকার ধনী মহিলা যিনি রবিদাদাকে বাৎসরিক ৫০,০০০৲ শ্রীনিকেতনের জন্যে দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন তিনিই হলেন Elmherst-এর পত্নী। আমি রবিদাকে উত্তরে লিখেছিলুম যদি খুব তাড়াতাড়ি তাঁর থাকে তাহলে হাতের কাছে শান্তিনিকেতনে সতীর্থ সুহৃদ্ নন্দলাল আছেন তাঁকে দিয়েই ছবিটা আঁকিয়ে নিতে। তার উত্তরে রবিদাদা আমায় ১১ই এপ্রিল ১৯২৫-এর পত্রে লিখলেন :

"কল্যানীয়েষু,... ... ... যদি তোর গ্রীষ্মের ছুটি থাকে আর এ অঞ্চলে আসতে পারিস তো যুগোলরূপ দেখার ইচ্ছা রইল। লখনউ পর্যন্ত ছুটে যাবার সামর্থ্য নেই। এখনো আমার চলাফেরা বন্ধ। ১লা বৈশাখ আসচে সেই উপলক্ষ্যে কাল শান্তিনিকেতনে যেতে হবে।

সেই ছবিটার আয়তন কি হবে জিজ্ঞাসা করেচিস্। ছোট হোক বড় হোক্ কিছুই আসে যায় না—কিন্তু বেশি দেরি করিসনে। তুই তো শুধু চিত্রী নোস্ তুই কবিও—সেইজন্যে তোর তুলি দিয়ে দুই রসই ঝরে, তাই কাব যখন ছবি চায় তখন তোর শরণাগত হতে হয়।

সেদিন চিঠিতে যে বর্ণনা করেছিলুম সেই অনুসারে আঁকতে পারিস্ কিম্বা পথের মধ্যে রাত্রি শেষ হয়ে যেতেই মেয়েটির পিছনে সূর্য উঠ্‌লো, আর পুরুষ পথিক তার মশালটা ফেলে দিলে, এমনও করতে পারিস—আঁকবার পক্ষে যেটা ভালো হয় সেইটেই অবলম্বন করিস—রবিদাদা।"

রবিদা ছবিটার বিষয় পুনরায় ১লা জৈষ্ঠ্য ১৩৩২র পত্রে লিখলেন :

"কল্যাণীয়েষু—তোর ছবির অপেক্ষায় ছিলুম, রচনা শেষ হয়ে গেছে শুনে ভারি খুসি হয়েচি। এ ছবি আমি তোর প্রণামী বলেই গ্রহণ করব—কিন্তু এর গতি হবে পশ্চিম মহাদেশে—সেখানে এর নিশ্চয় আদর হবে সেজন্যে চিন্তা করিসনে। কলাসরস্বতী তাঁর চরণ-রাগ-রক্তিমায় তোর সকল ভাবনা সকল কল্পনাকে চিরদিন রঞ্জিত করে রাখুন এই আমার আশীর্বাদ। ছবিটি শান্তিনিকেতনেই পাঠিয়ে দিস্।

*কবি অতুলপ্রসাদ সেন।

এখন ত তোর গ্রীষ্মের ছুটি। একবার কিছুদিন এখানে এসে কাটিয়ে যা না। আমি বোধ হয় কোথাও নড়বো না যে পর্যন্ত আমার সমুদ্রপারের লগ্ন না আসে।

জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীতে আমার ডায়রীতে চিত্রকলা সম্বন্ধে কিছু লিখেছি, পড়ে দেখিস্। —রবিদাদা।"

পরে আমার আঁকা তাঁর জন্মদিনে পাঠানো ছবিখানি পেয়ে রবিদাদা ২৫শে বৈশাখ ১৩৩৩-এ লিখেচেন :

"কল্যাণীয়েষু—তোর ছবিখানি পেয়ে খুব খুসি হয়েচি। যখন হাতে এল, তখন Cousins আমার কাছে বসেছিলেন, তাঁরও ভালো লেগেচে। তোর তুলির টানে যে একটি সৌকুমার্য আছে, এটিতেও তা' প্রকাশ পেয়েছে। য়ুরোপে এটি নিয়ে যাব।

শরীরটা কিছুকাল ভাল ছিল না—এখন একটু শুধ্‌রেচে। যাচ্চি য়ুরোপে ১৫ই মে তারিখে।

আর্ট সম্বন্ধে সেই বক্তৃতাটা অনেকখানি বাড়িয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছিলুম। তারা ওটা ওদের বুলেটিনে ছাপ্‌বে। তাই তোদের দেওয়া হল না।

যদি উৎসবে এখানে আসতে পারতিস্ খুব খুস হতুম। তোর পদ পাকা হয়েচে শুনে নিশ্চিন্ত হলুম। তোরা সকলেই আমার অন্তরের আশীর্বাদ গ্রহণ করিস্। —রবিদাদা।

সুদূর লখনউ প্রবাসে সরকারী চাকরীর জাঁতায় নিষ্পেষিত হয়েও রবিদাদার আশ্রয়ে শেখা গান নাট্যাভিনয়ের চর্চা ছাড়তে পারিনি। তখন আমার উৎসাহ-দাতা লখনউএ পেলুম কবি অতুলপ্রসাদ সেন, অধ্যাপক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত, ডক্টর রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, ডক্টর রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতিকে। তাঁদের উৎসাহে এবং রবিদাদার শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে গান ও একাঙ্কিকা নাটিকা রচনা করলুম এবং লখনউ আর্ট স্কুলের আর লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের দিয়ে একটার পর একটা অভিনয় করতে লাগলুম্। সে সময়কার 'বিচিত্রা' পত্রিকায় এবং অন্যান্য পত্রিকায় আমার একাঙ্কিকা প্রকাশিত হয়েছিল। রবিদাকে নাটিকা পাঠালুম এবং তার জবাবে তিনি লিখলেন :

*Dr. J. H. Cousins

"কল্যাণীয়েষু—অসিত, তোর নাটিকা ভাল লাগল কিন্তু সেকথা জানাবার ফুরসুৎ নেই। আমি পড়েছি নিজের "ঋতুরঙ্গ" নিয়ে—তার নাচ, গান, বেশভূষা, আয়োজন উপকরণের অন্ত নেই। এই নিয়েও ৪০ জন ছেলেমেয়ে নিয়ে এবং একমাথা ভাবনার বোঝা নিয়ে কাল চলেছি কলকাতায়। তোর কীর্তিকলাপ স্বচক্ষে দেখবার ইচ্ছা রইল—কিন্তু কে কাকে দেখে?

Bake এবার জাভা, বালি থেকে অনেক ছবি ও বিবরণ সংগ্রহ করে এনেছে। তার ইচ্ছা তাই নিয়ে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতিতে বক্তৃতা করে অর্থ উপার্জন করে। জিনিষটা খুবই interesting এবং ভারতীয় ছাত্রদের পক্ষে বিশেষভাবে উপাদেয়। তোর আর্ট বিভাগ থেকে যদি ওকে ডাকিস্ তাহলে জাভা বালির সঙ্গে প্রাচীন ভারতের শিল্পকলার যোগ সম্বন্ধে কিছু শুনিয়ে দিয়ে আসতে পারে। ভেবে দেখিস্। তোদের গভর্ণরকে জিজ্ঞাসা করে দেখিস্—তিনি Preside করে একটা ধুমধাম করতে পারেন। আর সময় নেই।
—রবিদাদা।

Bake পরে লখনউ এসেছিলেন এবং তাঁর বক্তৃতা আর্ট স্কুলে এবং লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যবস্থা করে দিয়েছিলুম তখন।

রবিদাদার জন্মদিনে লক্ষনউ-এ এসেই একটি ছবি তাঁকে পাঠানোতে তিনি (জুন, ১৯২৫) আমায় লিখেনিলেন:

"কল্যাণীয়েষু—মহাত্মাজি এখানে আছেন তাই অত্যন্ত ব্যস্ত। তোর ছোট ছবিখানি সুন্দর হয়েছে। যথাস্থানে যথাভাবে যথাসময়ে পেঁাছে দেব। নিজে লোভ সম্বরণ করলুম।—'রবিদাদা"

আমার রচিত একাঙ্কিকা নাটকাগুলিতে গোড়ায় রবিদাদার লেখা গান জুড়ে দিতুম। পরে নিজের রচিত গান তাতে দিয়েছিলুম। রবিদার গানের জন্য তাঁর নিকট অনুমতি চেয়ে লেখায় তিনি ১২ই কার্তিক, ১৩৩৪-এর পত্রে লিখেছিলেন:

"কল্যাণীয়েষু—অসিত, আমার গান চুরি করেছিস্, বেশ করেছিস্—কেউ ভুলেও মনে করবে না সে গান তোর রচনা—ফাঁকি দিয়ে নোবেল প্রাইজ পাবি, সে আশা নেই। তোর নাটিকার খবর পেয়েছি কিন্তু এখানো আমার গোচর হয়নি—মাসিক পত্রের পাত-পাড়া হলে পরিবেষণ হবে, তখন আস্বাদ করা যাবে। যদি ভাল লাগে তাহলে কবুল করব না

—আমার ব্যবসায় তুই পসার করবি এ আমার সইবে না স্পষ্ট বলে দিলুম।

ভাটখাণ্ডেকে নিশ্চয় ডাকবো—কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষক চাই—নইলে তিনি নিয়ম বেঁধে দিলেও নিয়ম চলবে না। যেমন করে পারিস্ ভাটখাণ্ডেকে বলে একজন শিক্ষক আমাকে জুটিয়ে দিস্। ক্রিষ্টমাসের ছুটিতে এখানে যদি আসতে পারিস খুসি হব। তোর রবিদাদা।”

আশ্রম ১৯১৩-তে ছেড়ে চলে আসার পরেও অন্তরের সঙ্গে আজীবন যোগযুক্তই আছি। লখনউ আর্ট স্কুলের অধ্যাপক ললিত মোহন সেনকে দিয়ে উইলি পিয়ার্সনের একটি তেল রঙে প্রতিকৃতি আঁকিয়ে পাঠিয়েছিলুম রবিদাদার নিকট। তার প্রাপ্তি সংবাদ দিয়ে রবিদাদা লিখলেন :

“কল্যাণীয়েষু—অসিত, অতি উত্তম কথা। পিয়ার্সনের ছবি হাসপাতালের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হবে।

তোরা লখনউ-এ ডাকাডাকি করছিস্—কিন্তু পাখির ডানা ভেঙে গেছে। ভ্রমণ মনে মনেই চলে। এমন অবস্থায় যাদের দেহ সচল তাদেরই উচিৎ দর্শন দিয়ে যাওয়া। আজকাল মাঝে মাঝে কলমকে কাব্য থেকে চিত্রে চালনা করছি—তাতে যা উৎপন্ন হচ্ছে তাকে বলা যেতে পারে ‘চিত্তির’—অর্থাৎ তোদের ভয়ের কোনো কারণ নেই।

অতুলকে বলিস্, আশ্রমে শরৎকাল তার শুভ্র আসন বিছিয়ে বসেছে, যদি এদিকে ছুটি যাপন করতে আসেন তবে দেবে-মানবে মিলে তাঁর অভ্যর্থনার চেষ্টা করা যাবে। —তোর রবিদাদা।

অতুলদাকে (অতুলপ্রসাদ সেন মহাশয়কে) এই চিঠি দেখানোতে খুসি হলেও তিনি খুবই চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন, কেননা তিনি অভ্যর্থনা গ্রহণের ব্যাপারে সংকোচ বোধ করতেন। তিনি নিজেকে সর্বদা গোপনে রেখে কাজ করে গেছেন, এইরূপ ছিল তাঁর প্রকৃতি।

রবিদাদা ছবি আঁকতে গিয়ে আমাকে একটা তাঁর আঁকা ক্যাবিনেটের ডিজাইন পাঠিয়েছিলেন। আমি আমার এক ছাত্র শ্রীমান চিত্রবীর ভদ্ররাওকে দিয়ে মান্দ্রাজ আর্ট স্কুলে কাঠে রবিদার পরিকল্পনা মত একটি ক্যাবিনেট তৈরী করিয়ে তাঁকে উপহার দিয়েছিলুম। আমার সহকারী একটি শিল্পী—রবিদার সঙ্গে তাঁর মধুর সম্পর্ক। কিছুতেই বিশ্বাস করবেন না যে সেই

ডিজাইন রবিদাদামহাশয়ের নিজের হাতে করা। সেইকথা রবিদাদাকে জানানোতে তিনি আমাকে ২১শে জুলাই ১৯৩১-এ লিখলেন :

"কল্যাণীয়েষু,—অসিত, শ্যালকের মনে প্রত্যয় জন্মাবার জন্যে দলিল বানাতে হবে এতই কিসের গরজ? আমাকে সোনার মেডেল প্রাইজ দেবে? এই ডিজাইনটিকে পাকা করে পাঠাতে তুই ভুলিস্‌নে।

এখানে সাঁচির কীর্তি দেখে খুবই খুসি হয়েচি। নন্দলাল আমার সঙ্গী হয়ে এসে দেখে গেল। সাঁচি দেখা হোল, তোকে দেখা হোলনা এইটে দুঃখ। ফেরবার পথেও তোদের আভাস পাওয়া যাবে না। কাল ফিরে চললুম ইটার্সি দিয়ে। এই বর্ষাকালটা পথে পথে মাটি করতে চাইনে।—
—রবিদাদা।"

লখনউ থেকে আমার রচিত একটি শিশুদের উপযোগী একাঙ্কিকা নাটিকা "রাজার সাজা" পাঠালুম রবিদাদাকে, তিনি তাঁর আঁকা 'তেরিয়া' পাঠালেন। লিখলেন :

"কল্যাণীয়েষু—অসিত, তোর রাজার নাট্যলীলা ভাল লাগল। আধ ঘুমের স্বপ্নের মত ছবি ফুটে উঠেচে। তোর লেখা কাব্যের বদলে আমার আঁকা একখানা ছবি পাঠিয়ে দিচ্ছি। ছবিটার নাম 'তেরিয়া'। চিঠির কাগজ সামনে পড়ে ছিল, আঁচড় কাট্‌তে কাট্‌তে ঐ চেহারাটাকে খুঁচিয়ে তুলেচি।

আমেরিকার একজিবিশান থেকে আমার ছবিগুলো দেশে ফিরেচে। বোম্বাইয়ের কষ্টমহৌস কাপালিকের হাতে পড়েচে। কিছু রক্ত বের করে তবে ছাড়বে। —রবিদাদা।"

অতঃপর যখন সাহিত্যিক যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত 'শিশুভারতী' ইণ্ডিয়ান প্রেস থেকে বেরুলো, তখন রবিদার তেরিয়া ছবিতে একটি ছড়া দিয়ে প্রকাশ করেছিলুম। রবিদাদার কাছে তার জন্যে অনুমতি চাওয়ায় তিনি লিখলেন :

"কল্যাণীয়েষু,—এতদিন পরে আমার সেই তেরিয়াকে ভদ্রসমাজে তোর পরিচয়পত্র দিয়ে পাঠাচ্ছিস্‌, এটাতে ভদ্রসমাজ যদি আপত্তি না করে তো আমার আপত্তির কারণ নেই। অভ্যর্থনার এরকম আয়োজন যে তার ভাগ্যে ঘটবে একথা তাঁর সৃষ্টিকর্তা কোনদিন ভাবেননি।

রবিতীর্থ থেকে বিদায়ের পর

ইতিমধ্যে আমি গিয়েছিলুম বোটে। ভালো লেগেছিল। অনেক পূর্বস্মৃতি জেগে উঠেছিল মনে। এমন সময় ধরল ইনফ্লুয়েঞ্জায়, ফিরিয়ে আনলে ডাঙায়। একটু খাড়া হয়ে উঠ্‌লেই ছুট্‌তে হবে বোম্বাই। সামনে কর্তব্য পরম্পরা গিরিশৃঙ্গের মালার মতো খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে—সেগুলো একে একে পার হয়ে কবে যে পথের শেষে আরাম করে বসতে পারব জানিনে। যথাসাধ্য কাজ সংক্ষেপে করতে চেষ্টা করি, যা উদ্বৃত্ত থাকে সেই বোঝাতেই শির দাঁড়া বেঁকে যায়।—রবিদাদা।"

একবার ভারতীয় চিত্রকলা পদ্ধতির বিষয় একটি প্রশ্ন করে রবিদাদাকে লিখেছিলুম। আমার প্রশ্নের মর্ম-কথা এই ছিল যে যখন প্রকৃতির মধ্যেই একটি বিশেষ ছন্দ (বর্ণ ও রেখায়) নিহিত আছে এবং পার্থিব ব্যাপার নিয়েই যখন চিত্রকরের কারবার, তখন চিত্রকরের পক্ষে তাঁরই ছন্দকে উপলব্ধির দ্বারা রেখা ও রঙে ফাটানোই হল কাজ। প্রাকৃতিক বস্তুর স্বাভাবিক আকারকে বিকৃতি করার তাৎপর্য কি ? আলঙ্কারিক ছাঁদ পণ্যশিল্পের (commercial art-এর) অঙ্গ—কেননা তাতে রসাভাসের (Emotion-এর) প্রয়োজন নেই—চক্ষুতৃপ্তিই তার একমাত্র কাজ। সতীর্থ সুহৃদ নন্দলাল সর্বদা আলঙ্কারিক রীতির পক্ষপাতি এবং অবনীন্দ্রনাথ বা আমার কাজে—তার ঠিক বিপরীত ভাবে রসাভাস থাকে। আকৃতির বিকৃতি আর্টের ধর্ম্ম নয়। অজন্তার চিত্রাবালী তার প্রমাণ। অতিরিক্ত আলংকারিক রীতির চর্চ্চার ফলে পরিণত অবস্থায় নন্দলালের শান্তিনিকেতনে থাকার কালের সব কাজ আর তার পূর্বেকার সব কাজ তুলনা করলে সেগুলি যে শেষের দিকে কোথায় গিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে তা স্পষ্ট বোঝা যাবে। তাছাড়া কয়দিন পূর্বে তাঁরই অধিনায়কত্বে তাঁর শান্তি-নিকেতনের চেলারা জব্বলপুর শহাদ-স্মারক মন্দিরে যে ভিত্তিচিত্র এঁকেচেন তা প্রত্যক্ষ করলে আরও আমার বক্তব্য সুস্পষ্ট হবে।

এই ব্যাপারটা নিয়ে সহপাঠীর সঙ্গে বহু আলোচনা পূর্বেও হয়েছিল পাঠ্য-অবস্থায়। রবিদাদা আমার প্রশ্নের উত্তরে লিখলেন ৩১শে ডিসেম্বর ১৯২৯-তে :

কল্যাণীয়েষু—তোর প্রশ্নের উত্তর দেবার শক্তি আমার নেই। প্রতিভার সাধনা কোন্ পথে চলে হঠাৎ বোঝা যায় না—প্রথমটা লাগে ধাঁধা, তারপরে দেখা যায় একটা কোথাও পৌঁছে সে আপনার তাৎপর্য প্রকাশ করে। ইতিহাসে বারবার এ-ঘটনা হয়েচে।

প্রতিভার পাগলামী সৃষ্টি প্রণালীর অঙ্গ। যখন মনে করেছি বাঁধা পথ পাওয়া গেছে সে পথ ছাড়া গতি নেই, তখন হঠাৎ দেখি উচ্চৈঃশ্রবা চার পা তুলে ছুটে চলেছে যেদিকে পথের চিহ্ন পড়েনি—এদিকে আমরা হৈহৈ চীৎকার করি, সহিসকে গাল পাড়ি, হাওয়ায় সাঁই সাঁই রবে চাবুক আস্ফালন করি, কিন্তু দেবতার ঘোড়া আপন চলার দ্বারা নতুন পথ বের করে, নতুন ঐশ্বর্যের পথ।

সকল প্রকার সৃষ্টিরই ইতিহাস এই অনাসৃষ্টির রাস্তা দিয়েই। তাই তাড়াতাড়ি কিছু বলতে সাহস হয় না। আমার কলম যখন প্রথম চলেছিল, হেমবাড়ুয্যের পথ ডিঙিয়ে গেল—তার পরেও ক্ষণিকায়, বলাকায় বাঁক বদলাতে লাগল, আজও কি পাকা রাস্তা ঠিক্ করতে পেরেছি? —রবিদাদা।

কবির সত্তর বৎসরের জয়ন্তী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত Golden Book of Tagore-এর জন্যে একটি লাক্ষা রঙে কাঠের উপর 'আলো আঁধার দুই পথে' ছবি এঁকে পাঠিয়েছিলুম। তাতে সেটি বেরিয়েছিল। তা ছাড়া একটি ছোট পুলিন্দায় (Portfolio-তে) কতকগুলি রঙিন রেখাঙ্কন চিত্র স্বরচিত কাব্য সম্বলিত করে উপহার পাঠিয়েছিলুম। রবিদা তার প্রাপ্তিসংবাদ দিয়ে লিখেছিলেন:

কল্যাণীয়েষু—অসিত, আর একটু হলেই তোর চিঠির অন্ত্যেষ্টি সৎকার হোতো আমাদের রান্না ঘরে। যেহেতু আজকাল আমি কাগজপত্রের মোড়ক খুলিনে, বনমালী নিয়ে যায় চুলো ধরাতে। দৈবাৎ যখন আহারের পর আরাম কেদারায় ঠেস্ দিয়ে হজমের কাজে নিযুক্ত ছিলুম এমন সময় তোর প্রেরিত মোড়কের উপর চোখ পড়ল—তাতে তোর ঠিকানাটা দেখে ঘোমটা খুলে দেখলুম তোর বাণীকে।

আমার 'বিচিত্রিতা', তোদেরই ভাল লাগবে বলেই এত যত্ন করে খরচ করে ছাপিয়েছি। বাজারে আজকাল ছবি দেওয়া বই অনেক বেরিয়েছে—শ্যালীর বিবাহ উপলক্ষ্যে লোকে সেগুলো কেনে অনেক দাম দিয়ে—পছন্দও করে। ভয় ছিল, সেই বাজারে বিচিত্রিতাকে রওনা করতে—মনোমত হবে কিনা এখনো নিশ্চিত বোঝবার সময় আসেনি। আরো একখানা বইয়ের মতো ছবি ও কবিতা জমে আছে। বিচিত্রিতার ভাগ্যের পরিচয় পেলে তারপর যদি উৎসাহ পাই তখন তাকে অন্তঃপুর থেকে বের করব—এই রকম সঙ্কল্প করেচি।

রবিতীর্থ থেকে বিদায়ের পর

তুই যে পত্র-পাখায় কাব্য-চিত্রলেখা উড়িয়ে দিয়েছিস্ দেখে খুসি হলুম। লখনউয়ের নবাব পায়রা ওড়াবার খেলা করতো তার কথা মনে পড়ল। তুমি লখনউয়ের রাজচিত্রী তোমার মগজে পায়রার খোপ থেকে একটা একটা করে চিত্রপারাবত ওড়াবে এটা সেই নবাবী কায়দার মত দেখাচ্ছে। নলরাজা উড়িয়েছিলেন হংস, সেটা পৌছল দয়মন্তীর ঘরে, এ খেলার বয়স তোমার গেছে—দয়মন্তী আছেন পাশে, দমন করবার বিদ্যে তাঁর অবিদিত নেই।

উদয়শঙ্কর আঙ্গিক নৈপুণ্য আয়ত্ত করেচে, আছে তীরে—এখনো রূপসাগরে ডুব মারেনি। কোনো দিন হয়তো সৌভাগ্য ঘটবে তখন অরূপরতন নিয়ে আসে যদি বাহাবা দেব।—'তাসের দেশ' নাটকের মহলা দিতে ব্যস্ত আছি। —রবিদাদা।

উদয়শঙ্করের নৃত্য আমি তখন প্রথম দেখেছিলুম এবং আমার চক্ষে রবিবর্মার চিত্রকলা যেমন না দেশী-না-বিলাতি তাঁর নৃত্যকলাও সেইরূপ বোধ হয়েছিল। আমি রবিদাকে আমার মনের প্রতিক্রিয়ার বিষয় লেখায় তিনি উক্তপ্রকার অভিমত দেন।

কবির জন্মদিনে সেবছর পাঠিয়েছিলুম একটি ছোট্ট কাঠের টুকরোতে লাক্ষারঙে এঁকে একটি ছবি। ১৩ই জুলাই ১৯৩৪-এ আমায় তিনি প্রাপ্তি সংবাদ দিয়ে লেখেন :

কল্যাণীয়েষু—অসিত, যথাস্থানে ফিরে এসে তোর লাক্ষারঞ্জিত চিত্রাভাস পেয়েচি। বর্তমানে সে আমার টেবিলে লেখা সামগ্রীর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। এক যবনিকা থেকে অন্য যবনিকায় চলেচে যে সমস্ত উঁকিমারার দল, মনে হচ্ছে তারা জন্ম থেকে জন্মান্তরের যাত্রী—নব নব যবনিকার ভিতর দিয়ে একটু কিছু দেখতে পায়, অনেকখানি দেখতে পায় না। —রবিদাদা

এই ছবিখানির বিষয়-বস্তু তাঁর মনে ধরেছিল খুব। অনেকদিন পরে যখন রবিদা হঠাৎ শান্তিনিকেতনে অসুস্থ হয়ে পড়েন তখন তাঁকে দেখবার জন্যে ছুটি নিয়ে লখনউ থেকে গিয়েছিলুম। 'পুনশ্চ' বাড়ীটিতে রবিদার ঘরেই আমি ছিলুম এবং দেখলুম তাঁর ছবি আঁকার সরঞ্জামের সামনের দেয়ালে টাঙানো আছে আমার আঁকা উল্লেখিত ছবিখানি।

তারপর যখন রবিদাকে রোগশয্যায় দেখবার জন্যে তাঁর ঘরে গেছি শান্তিনিকেতনে শ্রীমতি রানী মহালানবিস তাঁর পথ্য নিয়ে উপস্থিত হলেন

সেইখানে। রবিদা বল্লেন" ছাখ, এদের কিছুতেই বোঝাতে পারচিনা যে মৃত্যু তো আর কিছুই নয়—এক যবনিকা থেকে অন্য যবনিকায় যাওয়া।" বুঝলুম যে আমার ছবির প্রতি ইঙ্গিত করেই সেই কথাটা তখন আমায় বলেছিলেন।

এই লাক্ষারঞ্জিত চিত্রাভাসের প্রণালী আমার নিজস্ব আবিষ্কার। জল-রঙে (water-colour-এ) কাঠের পাটার উপর ছবি এঁকে তার উপর লাক্ষা চড়িয়ে পাকা করার রীতির নাম দিয়েছিলুম 'Lacsit' এবং এ বিষয় 'রূপলেখা' পত্রিকায় ইংরাজিতে বিবরণ লিখেছিলুম। কাঠের গাঁটের দাগ (vain) অবলম্বন করে কতকগুলি অদ্ভূত-কিম্ভুত চিত্র তখন (১৯২৯-এ) এঁকেছিলুম। রবিদাদার সঙ্গে কলকাতায় এই চিত্রের বিষয় নিয়ে আলোচনাও হয়েছিল। তাঁকে যে সব লাক্ষারঞ্জিত চিত্র উপহার দিয়েছিলুম সেগুলি শান্তিনিকেতনের উত্তরায়ণের খাবার ঘরের দেয়ালে 'প্যানেল' করে সাজিয়ে রবিদাদা রেখেছিলেন।

১৯৩১-এ টাউন হলে রবিদার সপ্ততি বৎসরের জয়ন্তী উৎসবে নিমন্ত্রিত হয়ে আর লখনউ থেকে যেতে পারিনি। একটি লাক্ষা-চিত্র এঁকে তাঁকে প্রণামী পাঠিয়েছিলুম। কবি লিখেছিলেন :

কল্যাণীয়েষু—অসিত, তোর লাক্ষাচিত্র খুব ভালো লাগল। অনভ্যস্ত চোখে যারা দেখবে তাদের ধাঁধা লাগবে। রেখার অন্তরে অন্তরে যে বেগটা যে, ঝোঁকটা আছে সেটা অনুভব করবার বোধ শক্তি এবং অভিজ্ঞতা চাই।

আমার ছবি নিশ্চয় এতদিনে পেয়েচিস্। বিশেষ কিছু নয়। আমি কোমর বেঁধে আঁকিনে। হঠাৎ ফাল্‌তো সময় এবং ফাল্‌তো কাগজ হাতে পেলে রংচং দিয়ে যা হয় একটা কিছু গড়ে তুলি।

তোর কলাবতী কন্যাকে আমার আশীর্বাদ জানাস—রবিদাদা।

এই কলাবতী কন্যাটি আমার বড় মেয়ে অতসী—ডক্টর অরবিন্দ বড়ুয়ার স্ত্রী। ইনি এখন ছবি আঁকায় বেশ নাম করেচেন।

এঁদের বিবাহে রবিদাদা লিখে পাঠিয়েছিলেন :

পূর্ণতা আসুক আজি তোমাদের তরুণ জীবনে
আনন্দ কল্যাণে প্রেমে শুভলগ্নে শুভ সম্মিলনে।

রবিতীর্থ থেকে বিদায়ের পর

আমার লাক্ষাচিত্র আঁকার বিষয় এখানে একটা কথা বল্লে অপ্রাসাঙ্গিক হবেনা। পূর্বে উল্লেখ করেচি শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে আসার উপলক্ষে রবিদাদা আমাকে দিয়ে মানপত্রের জন্য একটি কবিতা লিখিয়ে ছিলেন। আমি সেটি ১৯২৯-এ লখনউ থেকে কাঠের পাটায় লাক্ষারঞ্জিত এবং সচিত্র করে পুনরায় পাঠিয়েছিলুম। প্রাচ্য শিল্পসমিতির প্রদর্শনীতে অবনমামা সেটি দিয়েছিলেন। সে বিষয় আমাকে জানিয়ে অবনমামা লিখেছিলেন :

"প্রিয় অসিত, তোমার অভিনন্দন পাটাখানি পেয়ে খুসি হলেম। ওটা exhibition-এ দিয়েছি। কাঠের রং তুলির রং-এ মিলে জিনিষটা ভারি সুদর্শন হয়েচে। এদিকে এক মজা হয়েছে। Nicholas Sperling বোলে এক রুশ শিল্পী ঠিক্ তোমার Style-এ কাঠের উপর কাগজ মেরে Exhibit করেছে। তোমার পাটাখানা দেখে সে তো অবাক! সে ভেবেছিল তার কিছু একটা বিদ্যা লাভ হয়েছে কিন্তু তুমি তার আগেই তার সব আর্ট মেরে বসেছো। দেখে মুখে না বল্লেও মনে মনে নিশ্চয় একটু বিস্মিত হয়েছে। লোকটি Parsian Style-এ আঁকে। European miniature-ও বেশ জানে। Egypt-এর রাজা তাকে এদেশে পাঠিয়েছেন—কাগজে নাম দেখেছো বোধ হয়। আজ এখুনি আমাদের Exhibition খুলবে, চল্‌লুম। ভাল আছি। —শুভাকাঙ্খী—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

উল্লিখিত রুশ আর্টিষ্টের সঙ্গে লখনউএ আমার সাক্ষাৎ হয়। তাঁর চিত্রাঙ্কন প্রণালীর সঙ্গে আমার লাক্ষাচিত্রের সহসা দেখলেই মিল আছে মনে হয় কিন্তু ছিল অনেক প্রভেদ। তিনি কাঠের উপর কাগজ জুড়ে এঁকে তার উপর বার্ণিস চড়াতেন আর আমি কাঠের উপরেই রঙ দিয়ে এঁকে লাক্ষা লাগিয়ে পাকা করতাম ছবিটাকে। লাক্ষা চিত্র বলতে সাধারণত জাপানী চীনা, বা ব্রহ্মদেশের কাজ মনে পড়ে। কিন্তু সেগুলিতে লাক্ষার ব্যবহার নেই। রবার গাছের আটার মত একপ্রকার গাছের আটাই তার প্রধান অঙ্গ। জাপানে সেইগাছকে 'থিসি' এবং বর্মায় 'উরিসি' বলে। এই গাছ চীন, জাপান এবং বর্মা অঞ্চল ব্যতিত অন্য কোনো দেশে জন্মায় না।

আমার একবন্ধুর পত্রিকার নাম আমার কন্যা রোচনার নাম যা রবিদাদা তাকে দিয়েছিলেন আমি আরোপ করেছিলুম। এই 'রোচনা' পত্রিকায়

বাঙলা ভাষার বানান সংস্কার বিষয় আমি একটি প্রবন্ধ লিখেছিলুম। টাইপ-রাইটারের যুগে যুক্তাক্ষরবাদ দিয়ে কেবল হসন্ত লাগিয়েও বাঙলা লেখা যায় এইছিল আমার যুক্তি। রবিদাদা প্রবন্ধ পড়ে আমায় লিখেছিলেন :

কল্যাণীয়েষু,—বানান সংস্কার পড়লুম। তিন সয়ের মধ্যে মূর্ধন্যষকে রক্ষা করার অর্থ বুঝিনে। শ বাংলা উচ্চারণে ব্যবহার করা হয়, বাকি দুটো হয় না। জ-এর বদলে য ব্যবহার করাও ভ্রমাত্মক। বাংলার অন্তস্থ য-কে আমরা বর্গীয় জ-এর মতোই চচ্চারণ করি। অন্তঃস্থ য-এর উচ্চারণ বাংলায়নেই। উপসংহারে বক্তব্য এই যে বাংলা দেশে কামালপাশার আবির্ভাব যদি হয় তবেই বর্তমান প্রচলিত বানানের পরিবর্তন সম্ভব হতে পারে ; যুক্তি তর্কের দ্বারা হবে না।—রবিদাদা।

১৫ই নভেম্বর ১৯৩৫-এর পত্রে আমার চিত্রিত ওমার-খৈয়ামের পোর্ট-ফলিও (Havell-এর ভূমিকা সহ) পেয়ে রবিদাদা লিখেছিলেন :

কল্যাণীয়েষু—তোর প্রেরিত সচিত্র ওমার-খৈয়াম পেয়ে খুসি হলুম। ছবিগুলি রেখার সুনিপুণ সৌকুমার্যে ভাবের ওমার-খৈয়ামী আবহাওয়ায় মনোরম হয়েচে। বইখানি গুণী সমাজে সমাদর লাভ করবে।—রবিদাদা।

স্বরচিত গান, স্বরলিপিও চিত্রসহ (শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র ঘোষের ইংরাজি অনুবাদ সম্বলিত করে) আমার 'খেয়ালিয়া' রবিদাদাকে পাঠিয়েছিলুম। তিনি জুলাই ১৯৩৩-র পত্রে লিখলেন :

কল্যাণীয়েষু—তোর 'খেয়ালিয়া' পেয়েছিলুম। আছে আমার গ্রন্থভাণ্ডারে। তোর রেখাঙ্কন আমার ভালোই লাগে। এবারেও ভালো লেগেছিল। বয়সের জীর্ণতার সঙ্গে সঙ্গে চিঠিপত্রের ধারা এসেছে মরে, তাই প্রাপ্তিসংবাদ ইত্যাদি কর্তব্যে সর্বদা ক্রটি ঘটে, ভুলে যাই।

তোদের প্রদর্শনীতে সাহায্য করার ভার আমিত নিতে পারিনে—আমি সংসারের পারে নেই—রথীকে অনুরোধ করে দেখিস্।—রবিদাদা

রবিদাদার জন্মদিনে তাঁর য়ুরোপ থেকে প্রেরীত একটি পোষ্টকার্ড সাইজের ফোটো থেকে ব্রঞ্জের ও রৌপ্যের ফলক-চিত্র পাঠিয়েছিলুম। তার সঙ্গে কিছু আমার আঁকা ছবিও ছিল। রবিদাদা পেয়ে লিখলেন :

"কল্যাণীয়েষু,—অসিত, তোর গড়া শুভ্র পদকমূর্তি কিছুদিন হ'ল আমার হাতে এসে পৌচেছে। খুব সুন্দর হয়েচে। অন্য জিনিষটা আসবার



ডাকঘর অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ

অপেক্ষায় তোকে খবর দিইনি। কাল যথাসময়ে সেটি পেয়েছি। এও বিচিত্র হয়েচে। অর্থাৎ এটিতে নতুন ধারা দেখা দিয়েচে। খাল কাটা চলে এক দীর্ঘ সোজা রেখা ধরে কিন্তু নদী চলে বাঁক বদল করতে করতে। চিত্র-নির্ঝরিনী ধারাও ক্ষণে ক্ষণে নতুন নতুন বাঁক নিতে থাকে, নইলে বুঝতে হবে তার মধ্যে চিত্তের বেগ নেই, কেবল আছে অভ্যাস। তোর এই রেখাবর্ণ-সঙ্গমে দেখা গেল নতুনের আবির্ভাব হয়েচে। তার পথ অবারিত ও দূর প্রসারিত হোক।......

কলকাতার দিকে গরমের ছুটিতে যখন আসবি তখন দেখা হবে বলে আশা করে রইলুম।—রবিদাদা

আমার নিজের প্রতিবৎসর জন্মদিনে প্রণম্যদের পত্র দিতুম প্রণাম জানিয়ে। বাবা, অবনমামা এবং রবিদাদা এঁদের সর্বাগ্রে লিখতুম। ১লা আশ্বিন ১৩৩৮-এ আমার জন্মদিনের প্রণামী পেয়ে আমায় রবিদাদা লিখলেন :

"কল্যাণীয়েষু—অসিত, বড় অসময়ে তোর জন্ম। শ্রীকৃষ্ণ ঐ মাসে ঘোর দুর্যোগের মধ্যে জন্মেছিলেন। বাবা বোধকরি জন্মমাসের মিল দেখে তোর নাম রেখেছিলেন 'অসিত'।

তোর জন্মমাসে আমার উপর ঘোরতর আলোড়ন চলচে। কাজের আর অন্ত নেই। শরীর মন ক্লান্তির শেষ তলায় গিয়ে ঠেকেচে। তাই চিঠি লিখতে পারিনি।

আজ আমাদের অভিনয়ের চতুর্থ রাত্রি—তারপরে চারের পর পাঁচ। সেইদিনটা আমার পঞ্চত্ব প্রাপ্তির দিন। সেদিন অভিনয় নেই তাই মরবার অবকাশ পাব। কিন্তু সে সুযোগও জুটবেনা সপ্তরথী আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়েচে। পালাতে চাই পিছন থেকে টেনে ধরেচে।

ছবির কথা ভুলে গেছি। যদি সজীব দেহে শান্তিনিকেতনে ফিরতে পারি তাহলেই আর একবার তুলি নিয়ে বসব। তখন তোর কথা স্মরণ করব। এখন মাথার ঠিক নেই। তোরা লখনউ-এ যদি প্রদর্শনী করিস আর যদি দর্শনী মেলবার আশা থাকে তাহলে রইল কথা। চল্লুম রঙ্গভূমিতে—রবিদাদা।

১৯৩৫, সালে ১৩ই সেপ্টেম্বারের চিঠিতে আমার জন্মদিন উপলক্ষ্যে লিখেছিলেন :

কল্যাণীয়েষু—অসিত, তোমার পরিণত পৌঢ়তার সিংহদ্বারে আমার আশীর্বাদ। —রবিদাদা।

আমার ৪৯ বৎসরের জন্মদিনে আমার প্রণামী পত্র পেয়ে রবিদাদা লিখলেন :

কল্যাণীয়েষু—৪৯টা বেজোড় বৎসর—তোরা ৫০ বৎসরের জন্যে অপেক্ষা করিসনে কেন? আশীর্বাদ পেকে ওঠে জুবিলি বৎসরে—উপযুক্ত সময়ে ঝুড়ি নিয়ে আশীর্বাদের কল্পবৃক্ষমূলে হাজির হোস্, পরিপক্ক ফল থেকে বঞ্চিত হবিনে। —রবিদাদা।"

পরের বৎসর তাঁকে জন্মদিনে প্রণাম করতে শান্তিনিকেতনে যদি উপস্থিত হতুম তো কিছু-না-কিছু ফল পেতুম। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য যেতে পারিনি। চাকরীর নিষ্পেষণ যন্ত্রের যন্ত্রণায় অস্থির থাকতে হয়েছিল—কোথাও যাবার যো ছিল না। তিনি নিজে গুণী ছিলেন বলেই গুণগ্রাহী ছিলেন। রবি যেমন কখন ছায়া দেন না আলোই কেবল দেন, তেমনি কবি রবীন্দ্রনাথ সর্বদা সবাইকে আলোকপাতই করে গেছেন—কর্মে, বচনে ও মনে। আমি এর পূর্বে যে তাঁর মূর্তিপদকের কথা উল্লেখ করেচি, সেইটি পেয়ে একটি কবিতা লিখে অভিনন্দিত করেছিলেন আশীর্বচনে :

কল্যাণীয়েষু—

আমার মূর্তি পূর্ণ করি
    মুক্তি পেল তোমার শক্তি,
রেখায় রেখায় নিত্যশিখায়
    দীপ্তি পেল তোমার ভক্তি।
চক্ষে তোমার প্রাণের মন্ত্র
    তাইত তোমার ধ্যানের দৃষ্টি
তোমার রসে আমার রূপে
    রচিল এই নূতন সৃষ্টি।

১৯৩৮ সালে এলাহাবাদ Municipal Museumএর সঙ্গে আমার একটি ছবির সংগ্রহ নিয়ে Haldar Hall কর্তৃপক্ষরা খোলেন, শিক্ষামন্ত্রী রায় রাজেশ্বর বালি দ্বার উন্মোচন করেন ফেব্রুয়ারী মাসে সেই বৎসর। রবিদা মিউজিয়ামের পরিচালক পণ্ডিত ব্রজমোহন ব্যাসকে সেই উপলক্ষে লেখেন :... ... ...It is

indeed a great joy to me that you are now having a special hall dedicated to the art of Asit Kumar Haldar, who, as you are no doubt aware, was intimately connected with me and my institution in the formative years of his life as an artist. Wishing you continued success in your great enterprise.

I remain,
Yours sincerely
Rabindranath Tagore

এই থেকে বোঝা যাবে তাঁর আমার প্রতি ভালবাসা এবং কৃপা কতদূর ছিল।

সকল সৌন্দর্য-সৃষ্টির ভিতর কবি ও শিল্পী ভগবানের সৃষ্টির রম্যতাই উপলব্ধি করেন একথা সম্রাট আকবরও স্বীকার করেছিলেন। এই রম্যতা কি?

শনৈঃ শনৈঃ যন্নবতামমুপৈতি
তদৈব রূপম্ রমনীয়তাম্।

ধীরে ধীরে যাতে নবীনতা উপলব্ধি হয় তাকেই রমনীয়তা বলে। রবিদাদাকে বুঝতে তাই দেশের লোকের সময় লেগেছিল তাঁর সকল সৃষ্টিতে সেই শাশ্বত রম্যতা ছিল বোলে। ১৯১৩-তে নোবেল পুরস্কার পাবার পূর্বে সবাই বেশ সন্দেহের চক্ষেই দেখতেন, তাঁর কাব্যালোককে বুঝতে সহসা পারতেন না। কিন্তু আজ এখন ছেলে বুড়ো সবাই রবিদাদার ভক্ত। তাঁর নবীন কীর্তির রস এখন ধীরে ধীরে সবাই উপলব্ধি করচেন। অবনীন্দ্রনাথ এবং তাঁর আদি-শিষ্যদের গোড়ায় গালি খেতে হয়েছে দেশের লোকের কাছে। ক্রমশঃ সমঝদার কতকগুলি লোকেরা তাঁদের চিত্রকলাকে বুঝতে পেরেছিলেন হ্যাভেল ও কুমারস্বামীর প্রচারের ফলে।

এই রম্যতার উপাসক কবি ও শিল্পী ইন্দ্রিয়াসক্তির বাইরে উপলব্ধি করেন সাধনার দ্বারা। ইন্দ্রিয় সংযমের দ্বারাই সকল রম্য কর্ম সিদ্ধ হয়—রবিদাদা নিজের জীবন-ধর্মে তার আদর্শ দেখিয়ে গেছেন। তাঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে থাকারকালে সর্বদা মনে অনুভব করেছি। তাঁর মধ্যে যেন দুটি মানুষ রয়েছে। একটি ধর্মদর্শন শিক্ষা-সংস্কৃত চরিত্রবান পণ্ডিত মানুষ এবং অপরটি আত্মভোলা আধ্যাত্ম জগতে দৃষ্টিলগ্ন নরচন্দ্র—এই দ্বিত্বপুরুষ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ একাধারে মানুষ এবং দেব-কবি। তাই তাঁর কাব্যরচনার মধ্যে সাত্বিক ভাবই ফুটে আছে—

তামসিক বা রাজোসিক ভাব নেই বল্লেই হয়। [এবিষয় নিজেই তিনি একবার উপলব্ধি করেছিলেন এবং দার্শনিক পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়কে যা বলেছিলেন তা আনন্দবাজার শারদীয় ১৩৬০ সংখ্যা বেরিয়েছে।] তাঁর এমন একটি ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট ছিল যে আশ্রমের ছাত্র বা অধ্যাপকেরা তাঁর খুব নিকটে থেকেও দূরত্ব অনুভব করতেন। যদিও তিনি সাধারণ জমিদার বা রাষ্ট্রপালদের মত ব্যবধান রাখার জন্য পাহারার কখনো কোনো ব্যবস্থা করেননি।

রবিদাদা অফিসিয়ালভাব পছন্দ করতেন না। আমরা জানি তাঁর বন্ধু সার উলিয়াম রোদেনষ্টাইন লণ্ডন রয়েল কলেজ অব আর্টসের অধ্যক্ষ হবার পর তাঁকে অফিসিয়াল ভাবে পত্র লেখায় তিনি বিরক্ত হয়েছিলেন তাঁর প্রতি এবং পত্র-বিনিময় কিছুদিন বন্ধ রেখেছিলেন।

রবিদাদাকে চিঠি লিখলেই নিজের হাতে লিখে জবাব দিতেন। বহু চিঠিপত্র হারিয়ে গেছে এখন। অবশ্য ঘরওয়া ভাবে বেশীর ভাগ পত্র আমাকে লিখেছেন তাই সব প্রকাশ করাও যায় না। ১৯৩৭শের অক্টোবরে রবিদাদার হয়ে তাঁর পুত্র রথীমামা লিখলেন :

কল্যাণীয়েষু,—তোমার চিঠি আজ সকালে পেলুম। বাবার চিঠি তাঁকে দিলুম এবং যে কয়েকটি কবিতা পাঠিয়েছ তাঁকে দেখালুম। তিনি পড়ে খুসি হয়েছেন—আমাকে পরে ডেকে বল্লেন তোমাকে লিখে দিতে এগুলি কবিতা হিসাবে ভাল হয়েছে—তাঁর ভাল লেগেছে। এখন লিখতে বাবার হাত বড় কাঁপে নয় ত তোমাকে নিজেই লিখতেন। তোমার বাহাদুরী তুমি সমানে কলম ও তুলি দুই-ই চালাচ্ছ।

… … …প্রতিমা এখন বেশ সেরে উঠেছেন। বাবাও ভাল আছেন। ইতি রথীমামা।"

এরপরে রবিদাদার অশীতিতম জয়ন্তী উপলক্ষ্যে ২৫শে বৈশাখ ১৩৪১-এ 'নারীর নামে' একটি সচিত্র কবিতার বই প্রণামী স্বরূপে উপহার পাঠিয়েছিলুম রবিদাদাকে। তাঁর 'নারী' কবিতার ১৭টি নায়িকার বর্ণনা অবলম্বনে আমি নতুন কোরে লিখেছিলুম কবিতা এবং সেটিকে চিত্রিতও করেছিলুম। রবিদাদার শরীর ভেঙে যাওয়ায় শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক

সুধাকান্ত রায় চৌধুরী রবিদাদার হ'য়ে প্রাপ্তি সংবাদ দেন এবং লেখেন যে তাঁর সেটিও ভাল লেগেছে। রবিদাদার তখন জীবনমৃত অবস্থা।

সেই অশীতিপর কবি তাঁর জন্মদিনে কিরূপ তীব্রভাবে প্রবল বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ঘোষণা করেছিলেন—যার জের বৃটিশ পার্লামেণ্ট পর্যন্ত পৌঁছেছিল সে কথা সকলেই জানেন। নির্ভয়ে সত্যকথা, দুর্দান্ত প্রতাপ রাজকীয় শাসনের ফেরে পড়বার আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও তিনি বলতে পেরেছিলেন। চরিত্র মহাত্মই তার প্রধান কারণ।

শেষ অঙ্কে

শেষ অঙ্কে পূজনীয় রবিদাদা বিশ্বভারতীকে স্থায়ীভাবে দাঁড় করাবার জন্যে অর্থ সংকটে বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন। বিশ্বভারতী কবির একটি জীবন্ত কাব্য—তাঁর সকল অধ্যবসায় শেষ বয়সে আশ্রমকে বাঁচানোর কাজে নিয়োজিত করেছিলেন। এইবার তার কথা ক্রমশঃ বলব।

বিশ্বভারতী ব্যাপারে গোড়ায় যেমন ডক্টর প্রশান্ত মহালানবীশ সহায়তা করেছিলেন তার কনষ্টিটুউশন প্রভৃতি তৈরী করার জন্যে তেমনি শেষের দিকে ডক্টর অমিয় চক্রবর্তী সহায় হলেন অর্থ সংগ্রহ ব্যাপার এবং তাঁর হোয়ে চিঠি পত্রের জবাব দেওয়ার কাজে। প্রায় বম্বে মাদ্রাজ আহামেদাবাদ প্রভৃতি স্থানে তাঁকে অর্থ সংগ্রহের জন্যে যেতে হোতো। আমাকে রবিদাদার হয়ে জবাব দিয়ে ১৬ই নভেম্বার ১৯৩২-এ লিখেছিলেন ডক্টর অমিয় চক্রবর্তী :

"প্রিয়বরেষু—পূজার ছুটিতে ভ্রমণে বেরিয়েছিলাম—সম্প্রতি ফিরেচি।...... যাবার পূর্বে আপনার নাটিকা পড়ে বিশেষ আনন্দ পেয়েছিলাম, কবিকে পড়তে দিয়েছিলাম। তিনি খুবই উপভোগ করলেন এবং বল্লেন আপনাকে লিখবেন। আশাকরি যথাসময়ে তাঁর চিঠি পেয়েচেন। আপনি ছোটদের জন্যে এমনি উপাদেয় রচনা আরো কিছু লেখেন তো তারা বাঁচে—বড়রাও কৃতজ্ঞ হয়। পরে ছবি দিয়ে বই করলে শিশু সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়।... ... ...আপনাদের শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী।"

কবির ৭০ বৎসরের Golden Book of Tagore এর জন্যে কমিটি কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে একটি ইংরাজি রচনা লখনউ থেকে পাঠিয়েছিলুম। তার বিষয়

ডক্টর অমিয় চক্রবর্তী লিখেছিলেন :

"প্রিয়বরেষু—অসিতবাবু,··· ···এখনো দিন ৭।৮ সময় আছে। হাল্কা গোছের ছোট প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথের কোনো একটি বিশিষ্টতাকে দেখিয়ে আপনি সহজেই লিখে পাঠাতে পারবেন।

Golden Book-এর জন্যে আপনার ইংরাজি লেখাটি গিয়েছে। কবি দেখে দিয়েছেন—সামান্য একটু সংক্ষিপ্ত করে দিলেন। ইংরাজি চমৎকার হয়েছে, রচনাটি সব দিক থেকেই উৎকৃষ্ট হয়েছে—Golden Book-এ ভারি চমৎকার মানাবে। আমাদের প্রীতি নমস্কার জানবেন।—ভবদীয় শ্রীঅমিয় চক্রবর্তী।

আমি Golden Book-এর জন্যে কাঠের লাক্ষারঞ্জিত চিত্র পাঠিয়েছিলুম—সেটি তাতে ছাপা হয়েছিল কিন্তু আমার প্রবন্ধ ছাপা হয়নি তাতে, কেননা সারা পৃথিবী থেকে বহু গুণী ব্যক্তির লেখা এসে পড়েছিল সে কথা সম্পাদক-মণ্ডলী আমায় পরে জানিয়েছিলেন।

আশ্রমে রবিদাদার নিকট দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এলে তিনি তাঁদের আমার কাছে লখনউ-এ পাঠাতেন পরিচয় পত্র দিয়ে। তাঁদের সকলের কথা আমার এখন মনে নেই, কয়েকজনের কথা বলব।

তখন এলেন শান্তিনিকেতন থেকে Mr. Ernest Thurtle বিলাতের পারলিয়মেণ্টের একজন সদস্য (M. P.)। আমার অতিথি হয়েই ছিলেন বাড়ীতে। কাকতালিয়বৎ ঠিক সেইসময় গভর্ণমেণ্ট হাউস থেকে একটি পার্টির নিমন্ত্রণ পত্র পেলুম। Mr. Thurtle অত্যন্ত কৌতুহলী হলেন এখানকার গভর্ণরের পার্টি দেখার জন্য। আমি প্রাইভেট সেকরেটারীকে ফোন করে তাঁরও নিমন্ত্রণের ব্যবস্থা করলুম।

গভর্ণর সার আলেকজাণ্ডার মুডিম্যানের (Sir Alexandar Muddimann-এর) সঙ্গে Mr. Thurtteকে পরিচিত করাবার পর তাঁর সঙ্গে অন্যান্য ইংরেজ আমলাদের একে একে পরিচয় করিয়ে দিলুম।

গভর্ণমেণ্ট হাউস পার্টিতে ইংরেজরা গভর্ণরকে ঘিরে বসতেন আর দেশী হোমরা-চোমরারা আলাদা ভাবে বসতেন—তাতে দেশী আই-সি-এস ভদ্রলোকেরাও যোগ দিতেন। কালো সাদার পার্থক্য এইভাবে পার্টিতেও বজায় রাখার নিয়ম ছিল তখন।

দেশী ভদ্রলোকদের সঙ্গে Mr. Thurtle-এর পরিচয় করিয়ে দিলুম আমি। তাতে তখন মাননীয় মিনিষ্টার নবাব সৈয়েদ আহম্মদ ছাতারী, মাননীয় মিনিষ্টার রায় রাজেশ্বর বালি (দরিয়াবাদের রাজা), মাননীয় মিনিষ্টার কুমার রাজেন্দ্র সিং ছিলেন এবং দেশী জজেরা আর ডক্টর পান্নালাল আই-সি-এস-ভি এন মেটা, অই-সি-এস, এন-সি মেটা, আই-সি এস, এস্-পি শাহ্ আই-সি-এস, সার জগদীশ প্রসাদ আই-সি-এস, সার জালাপ্রসাদ শ্রীবাস্তব, রাজা কাসমাণ্ডা, মহারাজা বলরামপুর, রাজা তিলোই, রাজা ওয়েল, মহারাজা মাহামুদাবাদ প্রভৃতি বহুলোক ছিলেন।

বৃটিশ পার্লিয়ামেন্টের সদস্য Mr. Thurtle আমার সঙ্গে বাড়ী ফিরে এসে রাত্রভোজের সময় বল্লেন দুঃখিত হয়ে: "লাট সাহেব তাঁর ইংরেজ কর্মচারী-দের নিয়েই চা খেলেন আর এখানকার ভদ্রলোকদের দিকে কৃপা কটাক্ষ পাত মাত্র করেই র'য়ে গেলেন, এর মর্ম আমি বুঝলুম না।" তারপর তিনি এখান থেকে দেশে ফিরে যাবার পথে তাঁর এবিষয় অভিজ্ঞতা সাংবাদিক-দের নিকট প্রকাশ করায় এবং কাগজে বেরিয়ে যাওয়ায় গভর্ণমেণ্ট মহলে একটা চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়েছিল। আমি তখন গভর্ণমেণ্টের চাকরি করি—আমারও অবস্থা তখন কাহিল। মাননীয় মিনিষ্টার বন্ধু নবাব ছাতারী পরে এই বিষয়টি নিয়ে অন্তরঙ্গভাবে আমাকে গোপনে জানিয়েছিলেন বৃটিশ রাষ্ট্রপতিদের মনোভাব।

তারপরে রবিদাদার কাছ থেকে তখন এসেছিলেন Baron Von Veltheim. D. Ph. জার্মানীর একজন ধনীক ও পণ্ডিত। এঁকে আর্টস্কুলের সব কাজ দেখালুম—তিনি আমার কাজ দেখে খুব খুসি হলেন। আমার একটি সহকারী অধ্যাপক তিনি ছিলেন Edmund Dullac-এর ভক্ত এবং তাঁরই অনুকরণে ছবি আঁকতেন। মন থেকে ভেবে মৌলিক কল্পনার সাহায্যে চিত্র কখনো আঁকতে পারতেন না। কিন্তু তাঁর ছবি দেখেই জার্মান 'ব্যারন' বল্লেন: "ছবির back ground তো দেখছি Edmund Dullac-এর, গাছটা কোনো জাপানি ছবির অনুকরণে আঁকা—আপনার ছবিতে আপনাদের দেশের আর্ট কোন খানটায় আছে?" আমাদের আর্টে অনভিজ্ঞ এ দেশের পণ্ডিতদের ঠকানো যায় কিন্তু পৃথিবীর সকল মানুষকে বোকা বানানো যায় না— এইকথা তখন বুঝতে পেয়েছিলুম।

রবিদাদা লখনউ আর্টস্কুলের এই অধ্যাপককে জানতেন। তিনি আমাকে এঁর বিষয় বলেছিলেন: "সূক্ষ্মভাবে নকলি ছবি না আঁকিয়ে এঁকে দিয়ে মীনাকারী কাজ করাস্ তো ভাল হয়।" কিন্তু দুঃখের বিষয় যাঁর যে বিষয় ক্ষমতা কম তাঁর সেই দিকেই ঝোঁক হয় বেশী। তিনি আর্ট স্কুলের কারুশিল্প বিভাগের কাজে কখনই মন দেননি আমি বলা সত্ত্বেও।

এরপর লখনউ-এ এলেন রবিদাদার বহু বিদেশী ভক্তের দল। Major Sanford, A. Wilby, H. Hunter, A. F. Allen, Madam de Manziarly এবং তার দুটি কন্যা, Dr. (Miss) Porthos এবং অনাগারিক গোবিন্দ (জার্মাণ বৌদ্ধ সাধু) ছাড়াও বহু লোক এসেছেন কুড়ি বৎসরের মধ্যে আর্টস্কুলে আমার কাছে তার সব কথা এখন মনে নেই।

Dr. (Miss) Auna Selig ছিলেন রবিদাদার বিশেষ ভক্ত, রবিদাদাকে য়ুরোপে তিনি বহু গুণীসমাজে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর বন্ধু সুইজারল্যাণ্ডের তরুণী শিল্পী Miss Charlette Jones'ও এলেন লখনউয়ে আমার নিকট। Miss Jones পরে লখনউয়ে দুবৎসর আমার নিকট ছবি আঁকা শিখেছিলেন এবং গত বড় যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বেই আমেরিকায় চলে যান। এঁদের বিষয় শান্তিনিকেতন থেকে রবিদাদার সেকরেটারী ডক্টর অমীয় চক্রবর্তী আমায় লিখেছিলেন:

"প্রিয়বরেষু,—Dr. Anna Selig যাঁর কথা আপনাকে বলেছিলাম— লখনউ-এ চলেছেন। এঁকে এবং এঁর বন্ধু Miss Charlette Jones দুজনকে আপনার খুব ভাল লাগবে। Dr. Selig চমৎকার লোক—জার্মানীতে ওঁর খুব প্রতিপত্তি—কবির জন্য সব আয়োজন জার্মানীতে উনিই করেছিলেন। এঁদের যথাসাধ্য যত্ন করলে কবি খুসি হবেন।

একবার যদি নিমন্ত্রণ করেন এবং V. N. Mehta, মণ্ডীর রাণী প্রভৃতি বিশিষ্ট লোকেদের কাছে নিয়ে যান তো সুখী হই; একটু বড়দরের লোকের কাছে নিয়ে যাবেন—যাঁরা এঁদের মর্যদা বুঝবেন। এবিষয় আমার বলার কিছু নেই—আপনি সব করবেন তা' ভালই জানি। আপনি নিজে সঙ্গে এঁদের বেড়িয়ে আনলে এঁদের বিশেষ উপকার হবে। —প্রীতিনিবেদন, আপনাদের শ্রীঅমিয়।"

আমি উক্ত মহিলাদের সঙ্গে লখনউয়ের সকল বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলুম এবং তাঁরা খুবই প্রীত হয়েছিলেন।

পূর্বেই বলেছি রবিদাদা শেষ অঙ্কে বিশ্বভারতীর অর্থকৃচ্ছ্র তার উদ্বেগে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন অর্থসংগ্রহের চেষ্টায়। ১৯৩০-এর জানুয়ারীতে রবিদাদা এলেন লখনউএ অত্যন্ত পীড়িত অবস্থায়—সঙ্গে এলেন প্রাইভেট সেক্রেটারী বন্ধুবর ডক্টর অমীয় চক্রবর্তী। প্রথমেই অধ্যাপক ডক্টর নির্মল কুমার সিদ্ধান্ত, অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, অধ্যাপক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক ডক্টর রাধাকমল মুখোপাধ্যায় এবং তাঁর ভ্রাতা ডক্টর রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির সঙ্গে পরামর্শ করে আমরা লখনউ-এ একটি চাঁদার তহবিলের চেষ্টা করলুম। তারপর তখন বন্ধুবর নবাব সাহেব ছাতারীর বাড়ীতে রবিদাদা গেলেন আমার সঙ্গে এবং সেখানে একটি চেক পেলেন বন্ধু হিসাবে।

অমিয় বাবু এবং আমি অক্লান্ত পরিশ্রমে যথাসাধ্য চাঁদা তুলেছিলুম তখন। তারপর রবিদাদার কানপুরে ধনী বণিকদের কাছে চাঁদা তোলার কথা হোলো। শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর অতুলপ্রসাদ সেন মহাশয় অনুমোদন করলেন না—বিশেষ তখন কবির শারীরিক অবস্থা দেখে। অগত্যা আমি সার জ্বালাপ্রসাদ শ্রীবাস্তবকে ফোনে সকল কথা বল্লুম। তিনি এবং তাঁর পত্নী লেডি কৈলাশ উৎসাহ দিলেন কানপুরে কবিকে যথোচিত সমাদরে গ্রহণ করবেন এবং বিশ্বভারতীর জন্যে যথাসম্ভব অর্থসংগ্রহ করে দেবেন। আমি চাকুরে লোক—সঙ্গে যেতে পারলুম না রবিদাদার। কানপুর থেকে ১৬ই জানুয়ারী ১৯৩০-এ অমিয়বাবু আমায় জানালেন:

"প্রিয়বরেষু—অসিতবাবু, এখানে বেশ কিছু টাকা উঠেছে। শ্রীবাস্তব মহাশয় প্রায় দশহাজার টাকা তুলেছেন—চা'য়ে কবিকে নিমন্ত্রণ ক'রে সেই সঙ্গে ধনী বণিকদের ডেকেছিলেন। নিলাম করার মত ক'রে হাঁক ডাক করতে করতে টাকা তুলতে লাগলেন। তৎপূর্বে কবি ছোট একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। ফেরবার পথে ইংরেজ বণিকদের কাছে কবি আরও কিছু টাকা পাবেন—সরশুদ্ধ বিশ হাজার উঠবার সম্ভাবনা।

কবির শরীর মোটেই ভালো নেই। আমাদের বড়ো ভাবনা রয়েছে—কী করব ভেবে পাওয়া যায় না। ওঁর সমস্ত মন র'য়েছে লখনউ-এই ফিরে

খুব খানিক টাকা পাবার ভরসায়। এখানকার বাঙালীরা বেশ ভালো রকম তুলেছেন—ডাক্তার সুরেন সেন মহাশয় নিজে হাজার টাকা দিয়েছেন। এখানকার বাঙালীরা committee ক'রে টাকা তোলবার ভার নিয়েছেন—কবি ফেরবার মধ্যে দেবার purse তৈরী থাকবে। কমিটিতে এখানকার দেশী লোকেরাও যোগ দিয়েছেন।

লখনউ-এও এই রকম ব্যবস্থা করা দরকার। তার ভার আপনাদের উপর। আপনাদের কথায় ওখানে সহজেই কাজ হবে। কবি ২৯শে নাগাদ লখনউ পৌঁছবেন।

এখানকার টাকা আপনি শ্রীবাস্তবকে না বললে উঠ্‌তোই না। আপনার টেলিফোনের 'কলে' এত হ'ল। একথা আমরা কেউ কোনোদিন ভুলব না। কবি যে কতদূর কৃতজ্ঞ আপনার কাছে, এবং আপনার শ্রদ্ধা ও প্রীতির এই আন্তরিক ও কর্মিক নিদর্শনে কত দুব আনন্দ লাভ করেচেন তা বলা যায় না। লখনউ-এ নিরন্তর সমস্ত বিষয়ে আপনি নানা রকম কষ্ট স্বীকার করে রবীন্দ্রনাথের জন্যে যা' করেছেন তার বিষয় আর কী বলব? আপনার এই গভীর শ্রদ্ধার পরিচয় পেয়ে এবং অক্লান্ত কর্মোদ্যম দেখে আমরা মুগ্ধ হয়েছি।

ব্যক্তিগতভাবে আপনার কাছে যে স্নেহ পেয়েছি সে বিষয় কিছু বলতে বৃথা চেষ্টা করব না।

ওখানকার organization-এর জন্যে কবি আপনার উপর নির্ভর করেছেন। রাধাকুমুদবাবু এবং অতুলবাবুও নিশ্চয় বিশেষভাবেই চেষ্টা করবেন। জয়গোপাল বাবুকে* আপনি বোলবেন। পূর্ব হতেই purse ঠিক থাকা দরকার। ৩০শে নাগাদ কবি সভায় যাবেন। তার কোরে আপনাকে যথাসময় জানাব। ইতিমধ্যে যা ব্যবস্থা উপযুক্ত মনে করেন আপনি করবেন। কাল সকালে আগ্রায় আমরা চলেছি। এখন অনেক রাত্রি—ঘুমে কলম থেমে আসছে। কিন্তু আপনাকে না লিখে পারলাম না। আমার প্রীতি নমস্কার গ্রহণ করবেন। ভবদীয় অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী।"

অতঃপর ১৯৩১ সালেও কবির মনের এবং শরীরের অবস্থা ভেঙে পড়ল আশ্রমের জন্য অর্থ সংগ্রহের ব্যাপারে। তাঁর সেক্রেটারী ডক্টর অমিয় চক্রবর্তী

*ক্যাপটেন জয়গোপাল মুখোপাধ্যায় K. G. Medical College লখনউ-এর অধ্যাপক।

মহাশয় নভেম্বারের শেষে তাঁর সকল দুঃখের কথা জানিয়ে একটি confidential পত্র দেন। অবশ্য এখন সেটি প্রকাশ করতে দোষ নেই বরং এ থেকে কবির মহত্ব এবং আশ্রমের জন্যে কঠোর ত্যাগ স্বীকারেরই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। অমিয়বাবু লিখলেন :

"প্রিয়বরেষু—অসিতবাবু, আজ চলেছি কানপুরে। সেখানে কিছু অর্থ তুলতে হবে। কেবল আপনাকেই খুলে জানাতে পারি যে বিশ্বভারতীর একটা বিষম অর্থ সঙ্কট উপস্থিত—অল্প কিছুদিনের মধ্যে দশ হাজার টাকা না-পেলে আমাদের সাংঘাতিক ক্ষতি হবে। জমিদারীর আয় রবীন্দ্রনাথের তো নেইই বরঞ্চ এবারে বন্যার জন্যে খাজনা ছেড়ে দিয়েচেন এবং তদুপরি সাহায্যার্থে নিজেই তিনি এত টাকা দিয়েচেন যে তহবিল শূন্য।

বিশ্বভারতীর অর্থ তিনিই বেশীর ভাগ দেন তা তো জানেনই—এবারে তো তাঁর দেওয়ার সাধ্য নেই। এখন কোনো বাহিরের অর্থাগমের সম্ভাবনাও বন্ধ। এই সব ব্যাপারে কবি কতদূর মনের কষ্টে আছেন তা' বুঝতে পারেন। —তাঁর শরীর ভালো নেই। তার উপর সাম্‌নে জয়ন্তী। তিনি ভাঙা শরীর নিয়ে অর্থ চেষ্টায় বেরোচ্ছিলেন কিন্তু সেটা এখন মারাত্মক হতো তাঁর পক্ষে। অত্যন্ত বেদনায় তিনি শেষে আমাকে যেতে বল্‌লেন—দু-চার হাজার যা' পারা যায় তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধুজন এবং সহধর্মী কারো কাছ থেকে পাওয়া যাবে এই একান্ত আশায় তিনি ভরসা করে আছেন।··· ··· ···বাকি মুখে হবে।

জয়ন্তী উৎসবের আয়োজন খুব জমে উঠেচে—একটা সত্যিকার বড়ো ব্যাপার হবে। কবি নূতন নাট্য অভিনয়ের আয়োজন করচেন। জয়ন্তী পরিকল্পনা বিষয়ও আপনাদের সঙ্গে বিশেষ আলোচনা আছে।

সেবার লখনউ-এ আপনারা কবিকে যে রকম সাহায্য করেছিলেন তিনি কখনো ভুলতে পারেননি—ওঁর বিশেষ ভরসা যে ওখানে আপনারা কয়েকজন যা' হোক কিছু অর্থ এই রকম সঙ্কটের সময় তুলে দিয়ে তাঁকে উদ্ধার করবেন। আমার প্রীতি নমস্কার গ্রহণ করুন। —আপনাদের শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী।

অমিয়বাবু তারপর উত্তর প্রদেশ অঞ্চলে এসে অর্থ সংগ্রহকালে এলাহাবাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুশীল রুদ্র মহাশয়ের কাছে যান। তিনি এবং তাঁর পিতা রবিদাদার বিশেষ ভক্ত ও বন্ধু ছিলেন। এলাহাবাদে পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর নিকট অমিয়বাবু যান এবং তাঁর সৌজন্যের বিষয়ও আমাকে পত্রে

জানান। আজ তিনি স্বাধীন ভারতের প্রধান মন্ত্রী এবং রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীর চ্যানসেলর।

অমিয়বাবুর অক্লান্ত পরিশ্রম এবং কবির প্রতি অগাধ ভক্তির নিদর্শন তাঁর প্রত্যেক পত্রের ছত্রে ছত্রে প্রকাশ পায়। অমিয়বাবু এলাহাবাদ থেকে সেই সময় আমায় লিখেছিলেন :

"প্রিয়বরেষু,—কাল ঠিক মতো এখানে এসে পৌঁছেছি এবং বাড়ি পৌঁছেই professional beggar-এর ঝুলি নিয়ে দু-এক বাড়িতে চড়াও হয়েছি। বাঙালী যাঁদের কাছে গিয়েছি তাঁদের কথাবার্তায় বুক সাত হাত দোমে গেল—রবীন্দ্রনাথের বিষয় এক ডাক্তার সাহা* ব্যতীত কারো দরদ আছে ব'লে আশঙ্কা করবার কারণ নেই। লালগোপালবাবু† সুস্থ থাকলে আনুকূল্য সংগ্রহ কঠিন হোতো না।

জহরলালের সঙ্গে কাল রাতেই অনেকক্ষণ কথা হ'ল—তিনি খাঁটি একেবারে সোজাসুজি ভদ্রলোক। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং হৃদ্যতা, সহজাত-আভিজাত্যে তাঁর চরিত্রকে শোভমান করেছে—মুগ্ধ হ'তে হয়। তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন এবং করছেন। কেবল তাঁর ভয় যে-কোনো মুহূর্তে তাঁকে গভর্ণমেন্টের শ্রীঘরে স্থান দেবে—ভয় কথাটা ঠিক ব্যবহার হল না, কেননা ও-ভদ্রলোকের দেহে-মনে বিধাতা ভয় ব'লে কিছু রাখেন নি।

জহরলালের ইচ্ছা স্থানীয় কোনো প্রতিষ্টাবান ব্যক্তি দুচারদশজন অর্থবান এবং সচ্ছল অবস্থাপন্ন ব্যক্তিকে তাঁর বাড়িতে নিমন্ত্রণ ক'রে আনেন এবং সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। উনি নিজেই করতে রাজি, কিন্তু বললেন তাতে উল্টো ফল হবে—ভয়ে কেউ আসবেনা, এসময় তাঁর সঙ্গ প্রভুর দৃষ্টিতে মোটেই সুসঙ্গত নয়। তাছাড়া তিনি কাউকে এবিষয় বলতে গেলে পলিটিক্যাল অভিসন্ধি আবিষ্কার করবার মত উর্বর মস্তিষ্কের অভাব হবে না। তৎসত্বেও তিনি নিজে শেষ ক'দিন অনেক বাড়িতেই আমাদের কাজে গিয়েছেন। খবর পেলাম, চিঠিও অনেক লিখেছেন। যে-মানুষ দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ ক'রে সারাদিন এবং মধ্যরাত্র পর্যন্ত নিয়ত অক্লান্ত সেবা-ধর্মে নিযুক্ত, তাঁর কাছ থেকে এতটা পাওয়া পরম গৌরবের বিষয় মনে করি। তাছাড়া টাকাও তিনি যথাসাধ্য দিয়েছেন।

*ডক্টর মেঘনাদ সাহা, এফ্-আর্-এস্

†শ্রীলালগোপাল মুখোপাধ্যায় এলাহাবাদ হাইকোর্টের জজ।

জহরলাল বল্লেন এখানে সেরে পুনরায় লখনউ-এ একবার দেখ্তে।......জহরলালের কথা মতো আপনাকে লিখলাম। Art School দেখে তিনি খুব impressed হয়েছেন, অনেক লোকের সামনে তা' আমাকে কাল বল্লেন এবং আপনাকে নমস্কার জানাতে বল্লেন। আমি বলেছিলাম লখনউ-এ আপনার কাছেই ছিলাম।...প্রীতিমুগ্ধ শ্রীঅমিয় চন্দ্র চক্রবর্তী।

অমিয়বাবু তারপর লখনউ-এ এসে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে বিশ্বভারতীর জন্যে অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন সেকথা না ব'লে এই প্রসঙ্গ শেষ করতে পারলুম না। অবশেষে রবিদাদা পুনরায় নিশ্চেষ্ট না থাকতে পেরে স্বয়ং ভাঙাশরীর নিয়ে অসুস্থ অবস্থায় উপস্থিত হলেন দিল্লীতে। সেখানে তখন মহাত্মা গান্ধিজী ছিলেন। তিনি গুরুদেবের এই কষ্ট সহ্য করতে পারলেন না— কোনো ধনীক বন্ধুর কাছ থেকে ৬০,০০০ দান গ্রহণ করে রবিদাকে পুনরায় আশ্রমে ফিরে যেতে অনুরোধ করলেন—অসুস্থ শরীর নিয়ে বিশ্রামের জন্যে।

লখনউ-এ তারপর আমার কাছে প্রতিমামামী কিছুদিনের জন্যে আসেন এবং মীরামাসীও এসেছিলেন আশ্রম থেকে তারপরে। প্রতিমামামী আসার কালে তাঁর মারফৎ আশ্রমের সংগীত-নাট্য বিভাগের ছাত্র ও ছাত্রীদের আমার এখানে আনালুম এবং শিক্ষা বিভাগের মিনিষ্টার মাননীয় রায় রাজেশ্বর বালি এবং তাঁর কাকা রায় উমানাথ বালির সহায়তায় লখনউয়ের সঙ্গীত বিদ্যালয়ে 'চিত্রাঙ্গদা' অভিনয় করিয়ে কিছু অর্থ-সংগ্রহ করে পাঠিয়েছিলুম রবিদাদাকে। এই অনুষ্ঠানে বন্ধু এস-পি শাহ আই-সি-এস আমাদের বিশেষ সহায় হন। তাঁর মত কবির অনুরাগী বন্ধু বিরল।

পরিশেষে' কবির গুণের কথাই শুধু মনে আসে। যুগ-পুরুষের গুণ অতুলনীয়। তাঁর তুলনা তিনি নিজেই। তবে যদি একান্তই তুলনা দিতে হয় তো মহাকবি বাল্মীকি শ্রীরামচন্দ্রের গুণের বিষয় যা' বলেছেন তা' সম্পূর্ণরূপে খাটে :

প্রজা হিতে রত সদা, সত্যবাদী, ধীর
শুচি, জ্ঞানী, ধার্মিক প্রধান,
জীবলোক কর্তব্য পালক
বেদবেদাঙ্গেতে দক্ষ
সর্বশাস্ত্র-তত্ত্বজ্ঞানী,
প্রতিভা সম্পন্ন, বহু বাণী-স্মৃতিধর ;

সর্বলোক-প্রিয়, বন্ধু অতি সদাশয়,
সাধু তিনি, ভেদ তাঁর নাহি আত্ম-পর।
সিন্ধু যথা মহা-সিন্ধু রহে অনুগত
ঘেরি রণ সতত সজ্জন।
সর্বগুণে গুণান্বিত
গাম্ভীর্যে সাগর হেন,
ধৈর্যে-হিমাচল,
বীর্যে বিষ্ণু
শশি হেন সৌম্য সুদর্শন।
ক্ষমাতে ধরণী,
দানেতে কুবের
ধর্ম-তুল্য সত্যের নিষ্ঠায়।*

তরুণ বয়সে দ্বাদশ বৎসর রবিতীর্থ-পতির চরণপূত আশ্রমে তাঁর চরণ প্রান্তে বাস করে সকল প্রকার শিক্ষালাভের সুযোগ যা পেয়েছি সেইটেকেই জীবনের মহৈশ্বর্য বোলে আজ মনে করি। উরুবেলায় বোধিপ্রাপ্তির পর থেকে সর্বদা মোহরূপী 'মার' বুদ্ধের সংযম চ্যুতির প্রবল চেষ্টা করেছিল। একবার তাঁকে তাঁর কানে এসে বলেছিল "গৌতম তুমি এখন সংসারে ফিরে যাও—তুমি ঋদ্ধি পেয়েছ, যদি ইচ্ছা কর ত পর্বত ও সোনা হয়ে যাবে।" উত্তরে বুদ্ধ বলেছিলেন :

"বরং বেরং সুপাণাং সদ্‌পুরুষাণাম্
পাদপাংশু রজো ন সৌবর্ণাপর্ব্বতঃ

অর্থাৎ—বরং সদ্‌পুরুষের পদরজ ভাল তথাপি স্বর্ণময় পর্বত কাম্য নয়। যা কাম্য সেই নরচন্দ্র মহাকবি রবীন্দ্রনাথের পদরজ প্রতিদিন গ্রহণ করে ধন্য হতে পেরেছি রবিতীর্থে থাকার কালে সেই কথাই শেষে বলবার ছিল।

তিরোধান

আমার পূজনীয় মাতুল সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাতা কে-পি সেন তখন লখনউ-এর ডেপুটি পোষ্টমাষ্টার জেনারেল। মহাকবির তিরোধানের ২০ মিনিট পরেই কলকাতা থেকে 'ট্রাঙ্ককলে' নিদারুণ সংবাদ পেয়েই তখুনি আমার কাছে এসে জানালেন।

* লেখকের অনূদিত অপ্রকাশিত বাল্মীকি রামায়ণ (রামায়না) থেকে।

তিরোধান

আমার পরম হিতৈষী দাদামহাশয়কে তো হারালুম তার উপর দেশের অতিবড় দুঃসংবাদে শোক সন্তপ্ত ও মুহ্যমান হলুম বজ্রাহতের মত। তখন অশ্রু-আপ্লুত শোকাবেগে যে শ্লোকাভাস আমার কলমে বেরিয়েছিল সেইটি নিবেদন করে রবিতীর্থের গুরুদেবকে এবং জগতের উজ্জল ভাস্বর কবিকে মনে মনে প্রণাম করছি :

বঙ্গবানীর স্তব্ধ বীণা
অনন্তে আজ হ'ল লীন
ঝঙ্কারে যার বিশ্ব মুখর
রুদ্র-মধুর আলোক বীণ।
খস্‌ল দেখি হিম শিখরের
শীর্ষ আজি, দৈবে কোন্‌
রবীন্দ্র নাই ইন্দ্র সভায়
গেছেন, তোরা শোন্‌ রে শোন্‌?
ফুল রয়েছে ভ্রমর যে নাই
ভরবে মধু মৌচাকে
রং রয়েছে, পটুয়া নাই—
মোহন ছবি কে আঁকে?
মেঘ রয়েছে, আছে ভুবন
গাইবে কে আর তাদের গান?
দখিন হাওয়ার, আলো ছায়ার
রূপ লিখে কে ভরবে প্রাণ?
রবির আলোয় বসুন্ধরা
যে সুর ঢালে তার সুরে
সুর মিলিয়ে দেখালো সে,
—রস-গন্ধে দেয় পুরে।
সকল রসের আবাস খানি
রাখলে ধ'রে কাব্যে তাই—
এখন দেখি শেষ পরিবেশ
পরিবেশক হেথায় নাই!

রবিতীর্থে

দিনেক আসা, দিনেক যাওয়া
তার তরে তার দুঃখ কোথা ?
জাতিস্মরের জাত যে কবি
জানতো সবি সেও তা'।
দুঃখ সুখের হার পরালো
গানের সুরের মালার পর
দিনেক দুয়ের আবাস ছাড়ি
গেল রবি আলোর ঘর।
অমর কবি মৃত্যু-জয়ী
ভুমার কিরীট তার মাথে,
আজকে কে হায় বিদায় বেলায়
পরায় রাখি তার হাতে ?
এক রবি সে দিল আলো
বাণীর কুঞ্জে জগৎময়
অস্তে গেল রশ্মি রেখায়
মানব হৃদয় করলে জয়।
মহাপ্রাণ সে প্রাণের পারে
আছে যেথায় প্রাণ ভরি
গেছে সেথায় অরূপ-লোকে
অপরূপ কি রূপ ধরি !
শোক মোরা কি করব বল
দিলাম রেখে শেষ প্রণাম
দেবতা তিনি গেছেন ফিরে
আপন পুন অমরধাম !

—:0:—